ভারত কি সভ্য ?

শ্রীশ্রীমদ্ সার জন উড্রফের

"Is India Civilized ?" গ্রন্থের

মর্ম্মানুবাদ



প্রকাশক—

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

জ্যোতি কার্য্যালয়, চট্টগ্রাম

১৩৪০

১৬ নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্, "বাণী প্রেস" হইতে
শ্রীললিতমোহন মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান :—
জ্যোতি কার্য্যালয়, চট্টগ্রাম এবং কলিকাতা ঢাকা ও
চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

মূল্য ২৲ দুই টাকা

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মনীষী

শ্রীশ্রীমদ্ সার জন উড্রফ মহোদয়

করকমলে

তাঁহারই গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ

"ভারত কি সভ্য ?"

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত

উৎসর্গ

করিলাম।

শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

প্রবন্ধ-সূচী

সার জন উড্রফের পত্র

Boar's Hill, Oxford
24th June, 1930.

Dear Sir,

I have just received your letter of the 3rd June, and am about to leave England. I have no doubt from what I hear of you that you are a good-stylist and are well able to render my 'Is India Civilized ?' into Bengali. I can have no objection to your adding an introduction of your own. I am sending......the note of Sj. Atalbehari Ghose which so highly and I have no doubt worthily speaks of your work.

With all good wishes I remain

yours truly
John Woodroff

To

Sj. Kalishankar Chakravarti
Chittagong.

অনুবাদকের নিবেদন

জগদ্বিখ্যাত মনীষী সার জন উড্রফের গ্রন্থ "Is India Civilized ?" [ভারত কি সভ্য ?] ১৯১৮ ইংরেজীর নবেম্বর মাসে প্রথম প্রচারিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায় ১৯১৯ সনের মে মাসে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ; অতঃপর তৃতীয় সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ ইহা সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করিতেছে।

উইলিয়ম আর্চ্চার নামক ইংলণ্ডের জনৈক নাট্য-সাহিত্য সমালোচক "India and the Future" [ভারত ও ভবিষ্যৎ] শীর্ষক এক পুস্তক লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে ভারতবাসী জনসাধারণ এখনও ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, শিল্প, সঙ্গীত ও কলাবিদ্যা—প্রভৃতি সভ্যতার যাবতীয় বিষয়ে মানবসমাজের অতি নিম্ন স্তরে—বর্ব্বরের অবস্থায় রহিয়াছে। কেবল তিনি নহেন, বৈদেশিকেরা যেসময় হইতে ভারতে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছে, তখন হইতেই তাহাদের মিশনারীরা ও রাষ্ট্রনৈতিক পণ্ডিতেরা ভারতের এইরূপ কুৎসা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। অন্যেরা এক একটা দিক্ ধরিয়া আক্রমণ করিয়াছেন, আর্চ্চার করিয়াছেন সকল দিক্ হইতে। এই উপায়ে তাঁহারা ভারতের বহু অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। অবিলম্বে তেমন কুৎসা প্রচারে বাধা দান "Is India Civilezed ?" গ্রন্থ প্রচারের প্রথম উদ্দেশ্য। হিন্দুজাতি সর্ব্বনাশের কবল হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে, কিরূপে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক সর্ব্ববিধ বাধা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্থ ও আত্মনির্ভর হইবে, তৎসমস্ত বিশদ-ভাবে প্রদর্শন করা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

আর্চার প্রমুখ লেখকেরা যে নীতি অবলম্বন করত ভারতের কুৎসা প্রচার করিতেন সার জন তাহার ভিত্তি চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইউরোপের বিশিষ্ট লোকেরা বলেন তেমন বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবার উপায় আর নাই। সম্ভবতঃ সেই দিকের দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় মিস্ মেওর মত 'মলনালা-পরিদর্শিকার' আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তদ্বিরুদ্ধে যে কিছু প্রতিবাদ হইতেছে তাহারও পথপ্রদর্শক সার জনের এই গ্রন্থ। ভারতের বিরুদ্ধে অনবরত বৈদেশিকদের ঐরূপ কুৎসা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত সভ্যতা কি, ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও সভ্যতা কোন্ স্তরের, তাহাদের কি কি দোষে তাহারা পরের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইত্যাদি ভারতবাসীর একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের নিগূঢ় আলোচনা ইহাতে আছে। সার জন উড্রফ ভারতের প্রতি অকৃত্রিম হিতৈষণা দেখাইতে গিয়া যে অসাধারণ মনস্বিতা, গভীর দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

এই গ্রন্থের কথা উত্থাপিত হইলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'উড্রফ কে?'—এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমি লজ্জিত হইয়াছি, কারণ হিন্দুর এমন পরম হিতৈষী ব্যক্তিকেও শিক্ষিত হিন্দুদেরই অনেকে জানেন না বলিলে আমাদের যে কলঙ্কের সীমা থাকে না। পক্ষান্তরে তিনিও জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রচার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই গ্রন্থের অনুবাদের সহিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও একখানি ফটো প্রকাশের অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি দৃঢ়তাসহকারে নিষেধ করিয়াছেন। এমনই লোকচক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জগতের কল্যাণ-সাধনে তিনি ব্রতী!

উকীলেরা ও হাকিমেরা একজন উড্রফকে জানেন যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ফেলো এবং ঠাকুর ল-লেকচারার ছিলেন, গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ছিলেন, যিনি কয়েকটি বড় বড় আইনগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া সেই বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, ১৯০৪ হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে [কিছুকাল একটিং চিফ্ জষ্টিসও ছিলেন] নিরপেক্ষ বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া আপামর সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতেন, কিন্তু তিনিই যে আবার বেদান্তবিহিত হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুসভ্যতার ও ভারতমাতার একনিষ্ঠ ভক্ত, বেদান্ত উপনিষদ্ ও আগমশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত, তিনিই যে তন্ত্রসম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ প্রচার দ্বারা ভারতের ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে ও পাশ্চাত্যরাজ্যে তন্ত্রের প্রতি যে নানা কারণে ঘোর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। তাঁহার Principles of Tantra ('তন্ত্রতত্ত্ব') মূল্য ২০৲ টাকা, ("শক্তি ও শাক্ত") মূল্য ১২৲ টাকা, "ভারতশক্তি" মূল্য ২॥০, The Tantra of the great liberation ("মহানির্ব্বাণতন্ত্র) মূল্য ২০৲, The Serpent, power ("কুণ্ডলিনী শক্তি") মূল্য ২০৲, Garland of letters (বর্ণমালা) মূল্য ৭॥০, Power as life (প্রাণশক্তি) মূল্য ২৲, Power as mind ("মানসীশক্তি") মূল্য ২॥০, "Power as matter" ("ভূত-শক্তি") মূল্য ২॥০, "Power as consciousness" (মহামায়া—"চিৎ-শক্তি")—মূল্য ৫৲ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারের ফলে জগতের সর্ব্বত্র সুশিক্ষিত জ্ঞানানুসন্ধিৎসু লোকেরা হিন্দুর ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে যে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে হিন্দুজাতির মহোপকার সাধিত হইতেছে তাহাও অনেকে জানেন না। ইহাতেও কি তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলা হইল? সংস্কৃতভাষায় তিনি কিরূপ ব্যুৎপন্ন, তন্ত্র ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ অধিকার এবং যোগমার্গে তিনি

কতদূর অগ্রসর তাহা দেখাইতে না পারিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিবার অধিকার তিনি আমাদের দেন নাই। এইমাত্র বলিতে পারি, ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন "বঙ্গবাসীর" সম্পাদক বৃদ্ধ বিহারীলাল সরকার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন— উড্রফ শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, তাঁহার সহিত অন্য কাহারো তুলনা হয় না"।

"Is India Civilized ?" গ্রন্থ সর্ব্বত্র কিরূপ উচ্চ প্রশংসালাভ করিয়াছে এই পুস্তকের শেষভাগে উদ্ধৃত কয়েকটি অভিমত পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাহা অবগত হইবেন। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রায় এক বৎসর পরে (মে, ১৯২০) মালদহের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে জেমিসন ইহার এক বিস্তৃত সমালোচনা "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে প্রকাশ করেন। তাঁহার সে প্রবন্ধ ও তৎসম্বন্ধে সার জন উড্রফের অভিমত ইহার পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই দুইটি পাঠ করিলে পাঠকগণ দুইটি দিক্ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন। এক দিকে মহাত্মা উড্রফের যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র ও ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্তসমূহ, অন্যদিকে কতিপয় ইংরেজ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও তদ্বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির জন্য বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে কিরূপ পটু তাহার দৃষ্টান্ত। মিঃ জেমিসন লিখিয়াছেন 'তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি লোক শ্রদ্ধাবান নহে', 'তন্ত্রশাস্ত্র বেদবিহিত কি না তাহাও সন্দেহজনক', 'বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার নেতৃগণ ক্রমাগত তন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন', ইত্যাদি। তিনি যখন বাঙ্গালাদেশে মাজিষ্টরী করিতেন তখন সার জন হাইকোর্টের বিচারমঞ্চে সমাসীন ছিলেন। বেদের সহিত তন্ত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, সেই সন্দেহ দূরীকরণের জন্য মিঃ জেমিসন অনায়াসে সার জনের সহিত আলাপ

করিতে পারিতেন, অথবা বাঙ্গালার বিখ্যাত কোন তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতন। তাহা তিনি করেন নাই। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, আনন্দগিরি, মধুসূদন সরস্বতী, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যাকারগণের কাহারো কোন গ্রন্থ তিনি দেখেন নাই। তাঁহার একমাত্র অবলম্বন সেদিনকার পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের ৺দয়ানন্দ স্বামী। অথচ 'বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার নেতৃগণ তন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন'—বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে কোনরূপে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রচার ছাড়া এইরূপ অপ্রচারণের উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে?

মিঃ আর্চ্চারপ্রমুখ ছদ্মবেশী ভারতহিতৈষীদের সমালোচনা শাঁকের করাতের মত দুই দিকেই হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে। এক দিকে ব্রিটনবাসী শাসকসম্প্রদায়ের ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের অন্তরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি, অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানদিগকে বিভ্রান্ত করা। শেষোক্ত ব্যাপার কত সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে, হিন্দু-সন্তানেরা ঘরে ঘরে কিরূপ ছিন্নমস্তার অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেই তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন। হিন্দুরা সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি হইতে অধম, এইরূপ একটা ভাব হিন্দুসাধারণের অন্তরে নিবদ্ধ করিয়া দিতে পারিলে তাহাদের আত্মাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যখনই কোন মানুষ মনে করে যে, সে অন্য হইতে হীন তখনই সে ঐ অন্যের নিকট নত হইয়া পড়ে, মাথা খাঁড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ হীন ভাবাপন্ন অন্তর লইয়া কোন জাতি প্রবল জাতিসমূহের সহিত সংঘর্ষে টিকিতে পারে না। এই মহা বিপদ্ হইতে হিন্দু জাতিকে বাঁচাইবার জন্য মহাত্মা উড্রফের প্রাণ যে কত ব্যাকুল এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পনর বৎসর পূর্ব্বে তিনি হিন্দুজাতির যে সর্ব্বধ্বংসকর আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন আজ যেন তাহা আমাদের মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই ঐকান্তিক প্রার্থনা, প্রত্যেক হিন্দু এই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রত্যেক সাবধান বাণী একবার মনোযোগপূর্ব্বক শুনুন, শুনিয়া কিরূপে নিজকে ও নিজ জাতিকে রক্ষা করিবেন তাহার সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করুন।

শ্রীমদরবিন্দ ঘোষ মহাশয় গত বৎসর ইহার এক সমালোচনা গ্রন্থকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ঐ দুইটিরও নাম দেওয়া হইয়াছে,—"Is India Civilized ?" এবং "ভারত কি সভ্য ?"

সার জন উড্রফ প্রাণের প্রবল আবেগের সহিত হিন্দু জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন,—'আপনারা আত্মস্থ হউন, আপনাদের সম্মুখে ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন, সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভর হইয়া জগদ্বাসীকে আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষিত করুন।' অরবিন্দ বাবু তাহাই অংশতঃ বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন :—

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের পক্ষে সার জন উড্রফের এই বইখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য'; এমন কি যাঁহারা মানবজাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সংস্কৃতিবিষয়ক (cultural) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসুক তাঁহাদের পক্ষেও এই বইটী আলোচনা করার বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিতে পারা যায়। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক জোরের সহিত অতি সুস্পষ্টভাবে এখানে এমন একটি প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সংগঠনে যত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে সে সকলের মধ্যে সেই প্রশ্নটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে ;...... সেটি হইতেছে বিভিন্ন কাল্চারের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও

এসিয়াটিক কাল্‌চারের সংঘর্ষ; অপেক্ষাকৃত বাহিরের জিনিষ বৈষয়িক দ্বন্দ্ব হইতেই এই কাল্‌চারের দ্বন্দ্ব উত্থিত হইয়াছে; বিশেষ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট মর্ম্ম কি এবং সেই সভ্যতা যে আজ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন, তাহাই তিনি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই সভ্যতা বিষম সঙ্কটাপন্ন, তিনি স্পষ্ট করিয়াই তাঁহার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে বিক্ষেপের ঘূর্ণাবর্ত্ত জগতে পরিবর্ত্তনের যে প্রচণ্ড বন্যা আনিতেছে তাহাতে হয়ত ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ভাসিয়া যাইবে; একদিকে ইউরোপের আধুনিকতার সুতীব্র আক্রমণ, অন্যদিকে তাহার সন্তানগণের নিদারুণ অবহেলা, ইহার ফলে ভারতের সভ্যতা, এবং জাতির যে আত্মা এই সভ্যতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, উভয়ে একই সঙ্গে চিরদিনের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই বইখানি আমাদিগকে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছে, আমাদের উপর যে পবিত্র গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে আমরা যেন আরো ভাল করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করি এবং ইহার আসন্ন বিপদ্ সম্বন্ধে আরো সজাগ হইয়া উঠি, এই বিষম পরীক্ষার সন্ধিক্ষণে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত দণ্ডায়মান হইতে পারি। গ্রন্থকার অতিশয় দক্ষতা ও অনেকখানি শান্ত গভীরতার সহিত তাঁহার মতটি পরিস্ফুট করিয়াছেন, এবং প্রবন্ধগুলিতে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরিষ্কার প্রকাশ ভঙ্গীর এত নিদর্শন আছে যে, কেবলই সেইগুলি তুলিয়া দিতে লোভ হয়।......সার জন উড্রফ তাঁহার বিচারকোচিত বুদ্ধি লইয়া বিষয়টিকে যেরূপ পূর্ণতার সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন, সকল দিক্ হইতে দেখিয়াছেন, নানা প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক কথার উত্থাপন করিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার পক্ষে সেসব তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে।"

ইহাঁতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক শিক্ষিত

ব্যক্তির বিশেষতঃ যুবকদের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। মূল গ্রন্থের প্রথম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় তাহার অনুবাদও প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। মিস্ মেও নাম্নী মার্কিন মহিলার কুৎসাপূর্ণ 'মাদার ইণ্ডিয়া'র প্রচারের পর 'Is India Civilized ?' গ্রন্থের ও তাহার অনুবাদের বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন। তখনই আমরা সার জন উড্রফের নিকট ইহার অনুবাদ করিবার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখি। যদিও তিনি যথাসময়ে অনুমতি দিয়াছিলেন, নানা কারণে ইহার প্রচারে বিলম্ব হইল।

সহৃদয় পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা, আমার ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া মহাত্মা উড্রফ এই ভীষণ সন্ধিক্ষণে ভারতবাসীকে আত্মকর্ত্তব্যে অবহিত হওয়ার জন্য যে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিয়াছেন তাঁহারা সেই দিকেই বিশেষ মনোযোগ দান করিবেন। তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

এই অনুবাদ প্রকাশের জন্য আমাকে যাঁহারা নানারূপে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই নাম প্রকাশে আপত্তি করেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নামোল্লেখপূর্ব্বক ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না। তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

চট্টগ্রাম,
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪০ } শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

ভারত কি সভ্য ?

'বর্ব্বর', 'বর্ব্বরতা', 'বর্ব্বরোচিত' এই শব্দগুলি বারম্বার ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু উপায় কি? এই শব্দগুলিই যে ভারতের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞাপক। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বহু সহস্র লোক বর্ব্বরতা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, কিন্তু ভারতবাসী জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে সরল সত্য কথা এই যে তাহারা সভ্য নহে। কেবল দরিদ্র লোকদের সম্বন্ধে নহে, সকলেরই সম্বন্ধে এই কথা।"

উইলিয়ম আর্চ্চার লিখিত "ভারত ও ভবিষ্যৎ"
(India and the Future).

সভ্যতা ও তাহার প্রসার

(১)

সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ মানব দেখিতেছে যে বিপুল মানব-স্রোত পৃথিবীর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতীত যুগ-যুগান্ত হইতে এক জাতির সহিত অন্য জাতির দ্বন্দ্ব লাগিতেছে। আজ যে জাতি অন্য জাতিকে পরাস্ত করে সেইই পরদিন আর এক জাতির নিকট পরাস্ত হয়। এক জাতি অন্য জাতিকে ধ্বংস করে অথবা নিজের মধ্যে সমীকৃত করিয়া লয়; আজ হয়ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, দু'দিন পরে আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইল। সংগ্রাম করিতে করিতে কখনো উদ্দীপ্ত কখনো অবসন্ন, তারপর

শান্ত সংযত হয়,—এই ভাবেই মানবাত্মা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সংগ্রাম অবিরত চলিতেছে। এই কথাগুলি আমি যখন প্রথম লিখি (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) তখন সংগ্রাম ভয়ঙ্কর আকারই ধারণ করিয়াছিল।

প্রথমতঃ মানুষ তরবারির সাহায্যে বলাবল নির্ণয় করিত, পরে তাহার সহিত অর্থনৈতিক অভিযান যুক্ত হয়, তারপর সূক্ষ্মতর সাধনার * দ্বন্দ্ব। সাধনার বিজয়ে পরের দেহ এবং আত্মা উভয়ই যুগপৎ বিজিত হয়। সুদীর্ঘ কালের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া মানুষ বর্ব্বরতা, অসভ্যতা ও সভ্যতার বহু স্তর সৃষ্টি করিতে করিতে সমাজে অগ্রসর হইতেছে। সাধনা ক্রমে অধ্যাত্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছে। অদ্যাবধি এই ক্রমবিকাশ ব্যক্তি বা জাতি হিসাবে একে অন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াই চলিতেছে। লতাগুল্মাদি ভূমিরস শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, গো-মহিষ-ছাগাদি সেইসব লতাগুল্ম খাইয়া পরিপুষ্ট হয়, মানুষ লতাগুল্ম ছাগাদি জন্তু ভক্ষণ এবং অন্য মানুষের অর্থাদি আহরণ করিয়া নিজকে পরিপুষ্ট করে। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, এক জাতি অন্য জাতিকে আক্রমণ করে। বর্ত্তমান যুগে এক মানুষ অন্য মানুষের মাংস খায় না বটে, অন্যরূপে তাহাকে শোষণ করিয়াই আত্মপুষ্টি করে, তাহার অর্থ ও ভূমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া তাহাকে হত্যা করে, সেই বিত্তাদি লইয়া আত্মোন্নতির অন্তরায়সমূহ দূর

* ইংরেজী culture শব্দের বাংলা প্রতিবাদ কেহ করিতেছেন সভ্যতা, কেহ সংস্কার, কেহ সংস্কৃতি, কেহ কৃষ্টি কেহ বা সাধনা। কিন্তু কোন একটাতেই 'কাল্‌চার' শব্দের সম্যক্ ভাব ব্যক্ত হয় না। 'সাধনা' শব্দেই উহার ভাব অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যক্ত হয় বলিয়া আমরা তাহাই ব্যবহার করিতেছি। তৃতীয় প্রবন্ধে ('সাধনার স্বরূপ কি ?) স্যর জন উড্রফের ব্যাখ্যা দেখুন। (অনুবাদক)

করে। নিজকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবার জন্য অন্যের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে আর্থিক দ্বন্দ্ব লাগাইয়া দেয়। একে অন্যের অধ্যাত্মজ্ঞানকে সুবিধা বোধ করিলে নিজে আত্মসাৎ করে, বিরুদ্ধ মনে করিলে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। এইরূপ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের তাৎপর্য্য কি? জীবন সংগ্রাম ("Struggle for existence") কথাটা বাহ্যতঃ যে সংঘর্ষ দেখা যায় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। কিন্তু আদৌ এই সংঘর্ষ আসিল কেন, ইহার উদ্দেশ্য কি এবং পরিণাম কি? দেখা যাক্, এতৎসম্বন্ধে ভারতের উত্তর কি।

চিৎ—শাশ্বতী মহাশক্তি। তাহার কখনো ব্যতিক্রম ঘটে না। তাহা হইতে মায়াশক্তির বিকাশ। শ্রুতিবাক্যে দেখা যায়,—একোঽহম্ বহুস্যাম্—পরমাত্মার (মহাশক্তির) এই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টির সূচনা। পরমাত্মা নিজের অবিকৃত নিরাকার অবিজ্ঞেয় এবং অনধিগম্য অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, আবার অন্যদিকে জীবাত্মারূপে অসংখ্য দেহের ভিতর দিয়া তাহাদের কর্ম্মফলরূপে বহু জন্মজন্মান্তর ও জরামরণের সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এই ইচ্ছা অব্যবস্থিত নহে। ইহা পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল এবং অতীত বিশ্বের বীজকে ফলপ্রসবের সুযোগ দেওয়ার জন্যই ব্যবস্থিত।

মন যেই মুহূর্ত্তে রূপগ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ব্যক্তিসত্তা অতীত বিশ্বের স্মৃতি অনুসারে বিভিন্ন আকারে বিকাশ পাইতে থাকে। বিশ্বের বিকাশ যখন পূর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ বিষয় গ্রহণের প্রক্রিয়া [অনুবর্ত্তন] যখন শেষ হয়, তখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া মুক্তির পথে চলিতে [বিবর্ত্তন] আরম্ভ করে। তখন তাহার লক্ষ্য হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পবিত্রতম পথে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মহাশক্তিকে পাওয়া।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণভেদে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে। মহাশক্তির

অংশরূপা প্রাণশক্তি সকল বস্তুতেই বিদ্যমান। গুণভেদে এক এক রূপে বিকাশ পাইতেছে। জড় বস্তু দেখিতে যদিও নিষ্ক্রিয় বলিয়া বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে কিছুই নিষ্ক্রিয় নয়, সকল বস্তুর ভিতরেই অবিরাম কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে। সমস্ত বিশ্ব অবিরাম গতিতে চলিতেছে, এজন্য তাহার নাম জগৎ [গমনশীল]। জড়পদার্থসমূহের সত্ত্ববৃত্তি তমোগুণের দ্বারা আবৃত, এজন্য তাহা বিকাশ পায় না। তদপেক্ষা উদ্ভিজ্জ-সমূহে সত্ত্বগুণ অধিকতর পরিমাণে আছে, তজ্জন্য তাহার অনুভূতি প্রকাশমান। উদ্ভিদ্-জগতে ও প্রাণীজগতে প্রাণশক্তি ও অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিছু ভিন্ন নহে, কেবল স্তরভেদ মাত্র।

খৃশ্চান শাস্ত্রের মত তাহা নহে। খৃশ্চান শাস্ত্রানুসারে মানুষের দেহ ও আত্মা অন্যান্য জীবের মত নহে। অন্যান্য জীবের দেহ ও আত্মা মাটী হইতেই সৃষ্ট, মানুষের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে মাটী হইতে, এবং তাহার আত্মা আসিয়াছে বাহির হইতে, অর্থাৎ মানুষের প্রাণ বা আত্মা ভগবানই তাহার মধ্যে দিয়াছেন। খৃশ্চানী মতে ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে কোথাও ইহার মূল ছিল না। ইহাই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি। ইতর জন্তু ও উদ্ভিজ্জাদি মানুষের উপভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষের বুকের একটা হাড় হইতেই নারীর সৃষ্টি। ইহাতে ঈশ্বর দেখাইয়াছেন যে প্রধানতঃ বংশবৃদ্ধির জন্য মানুষের সৃষ্টি নহে ; এবং যৌন সম্বন্ধটা অতি হেয়।

এইরূপ অভিমত হিন্দুর এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সৃষ্টি বিবর্ত্তন দ্বারা প্রাণ ও চিদ্‌শক্তির উদ্ভব হয় নাই। প্রাণ ও চিদের প্রভাবই ইহাতে বিকাশ পাইতেছে। যে জীব পশুরূপে দৃষ্ট হয় তাহা তমঃপ্রধান হইলেও জড় ও উদ্ভিজ্জ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সত্ত্বগুণের অধিকতর প্রভাব ও চিদ্‌শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহার ভাবাভাব বোধ

আছে। পশুর মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট স্তর আছে। শ্রেষ্ঠস্তরে ক্রমোন্নতি দেখা যায়। জীবের মনুষ্য-দেহ-প্রাপ্তি সর্ব্বোচ্চ স্তর। শাস্ত্রানুসারে মনুষ্যজন্মলাভ অতি দুর্লভ। মনুষ্যজন্ম লাভের পর যে তাহা সার্থক করে না, সে আত্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়। অন্য সমস্ত পশু হইতে মানুষের মধ্যেই সত্ত্বগুণ বেশী পরিমাণে প্রকাশমান। মানুষের জ্ঞান তাহার নিজের সীমা এবং বাহ্য জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে। চিদ্‌শক্তির আশ্রয়ে চিন্তারাজ্য ও নৈতিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত। ধর্ম্মই বিশ্বের মূল—স্বলক্ষণধারণাদ্ধর্ম্ম, সুতরাং জগতের যাহা কিছু দৃশ্যমান, ধর্ম্মই তাহাদেরে ধারণ ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

সত্ত্বগুণের সাহায্যেই মানুষ মন ও বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করে, জ্ঞানীরা চিত্তমধ্যে ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট ভাবে আত্মাকে সন্দর্শন করেন এবং তাহারই ফলে যিনি যোগসিদ্ধি লাভ করেন তাঁহার ভৌতিক পদার্থে আসক্তি রহিত হইয়া যায়, তখন তিনি বিদেহমুক্তিলাভ করেন, ও পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভে সচ্চিদানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হন। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সহযোগ সর্ব্বদাই হইতেছে, কিন্তু বিদেহমুক্তিলাভের পূর্ব্বে তাহা উপলব্ধি করা যায় না। ভৌতিক পদার্থের ক্রমবিকাশের পরিণামেই আত্মার পূর্ণবিকাশ উপলব্ধি হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—যাহারা তমোগুণ-প্রধান তাহারা পশু, যাঁহারা রজোগুণ প্রধান তাহারা বীর এবং যাহারা সত্ত্বগুণ-প্রধান তাহারা দিব্য। বিবর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মার বন্ধন মুক্তি। ভৌতিক পদার্থের সহিত জড়িত আত্মা ভৌতিক পদার্থকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম স্তরে উন্নীত করিতে করিতে অবশেষে তাহার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়।

যে অবস্থায় প্রাণ পূর্ণরূপে আত্মার বাহন হইতে অর্থাৎ আত্মায় যুক্ত

থাকিতে ব্যগ্র হয় তাহাই চরম উন্নতির প্রেরণা। এই প্রেরণাই ভৌতিক পদার্থসমূহকে ক্রমোন্নত স্তরসমূহে বিন্যস্ত করে, মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নতি হইলে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশ আরম্ভ হয়। এই ভাবের ক্রমোন্নতি যাহার লক্ষ্য তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। ইহা বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাইতে পারে, যোগাইয়াও থাকে, কিন্তু তাহাই চরম নহে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দ্বারা মানব যাহাতে পশুজীবন হইতে মুক্ত হয় তেমন ভাবে ঐ সমস্ত বৈষয়িক উপকরণ উপভোগ করিলেই তাহার সদ্ব্যবহার করা হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহাই প্রকৃত সভ্যতা যাহা ভগবানকেই সৃষ্টির আদি ও অন্ত বলিয়া গ্রহণ করে এবং মানবসমূহকে সমাজে এমনভাবে বিন্যস্ত রাখে যাহাতে তাহাদের বৈষয়িক ও মানসিক প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সত্যিকার নীতি ও ধর্ম্মের ভাব ফুটিয়া উঠে। তদ্দ্বারা মানুষ প্রথমতঃ স্বীয় মূল আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করে, তৎপর জাগতিক ব্যাপারের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে এবং স্বীয় অধ্যাত্ম-জীবন কোন্ উপায়ে উন্নত হয় তাহাও জ্ঞাত হয়। একই মঙ্গলময় শিব দ্বৈতভাবে পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপে বিরাজমান। পরমাত্মা অবিকারী আনন্দময় বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনিই আবার বিশ্বরূপে প্রকাশমান। পরমাত্মারূপে পরমানন্দময়, এবং জীবাত্মারূপে অপূর্ণ সংসারের সুখদুঃখ ভোগে নিরত। প্রকৃতপক্ষে দ্বিত্ব নাই। একই শিব ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে বিদ্যমান। অনন্ত অসীম শক্তি হইতেই সসীম ক্ষুদ্র জীবাত্মার অবয়ব গ্রহণ। ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হইতেছে ঐ অবয়ব হইতে মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ। ঐ সাযুজ্য প্রথমতঃ স্থূলভাবে, তৎপর সূক্ষ্ম অর্থাৎ দিব্যভাবে হয়। আমরা প্রত্যেকেই আত্মার বন্ধনমুক্তির অবিরাম চেষ্টার যন্ত্রস্বরূপ। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। এই বিশ্বের কর্ম্মধারা যদি

মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে তবেই জানিতে পারিবে এইরূপ সংগ্রাম কেন। জানিয়া যদি তদনুযায়ী তাহার কর্ম্মসমূহকে সুব্যবস্থিত করে তবে তাহার জীবনে কোন আশঙ্কা থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ভয়ের সম্মুখেও অবিচলিত থাকিতে পারে।

প্রথম স্তরে প্রাণীসমূহ পরস্পরে সংগ্রাম করে, একে অন্যকে গ্রাস করে—ইহাও আত্মার উদ্গমন প্রক্রিয়ারই অনুকূল চেষ্টা। তাহারা সকলেই অজ্ঞাতসারে পরমাত্মার চরণে আত্মোৎসর্গ করে। জীবের আত্ম-বিকাশের প্রথমাবস্থায় অন্য কোন উপায় জানা থাকে না। পশুর অবস্থায় একে অন্যকে গ্রাস করিয়াই নিজের প্রাধান্য খ্যাপন করিতে চাহে। এক বর্ণ অন্য বর্ণকে, এক জাতি অন্য জাতিকে, এক সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে বিনষ্ট করিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহে তাহারও মূল সেই মহাশক্তির বিরাট প্রেরণা। স্থূলদর্শী আমরা মনে করি কেবল জগতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্যই এই সংগ্রাম। নিঃশেষ পরিণাম পর্য্যন্ত পঁহুছিবার পূর্ব্বে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, তন্নিম্নে যে কোন স্তরে কিছু না কিছু দুঃখভোগ আছেই, পূর্ণতাকে পাওয়া পর্য্যন্ত অপূর্ণ চেষ্টারত থাকিবেই। পরন্তু মানব প্রায়ই অগ্রসর হইতে হইতে মধ্যপথেই বিশ্রাম আরম্ভ করে, এবং লক্ষ্য ভুলিয়া যায়।

তৎপর সাধনা লইয়া যে আত্মিক দ্বন্দ্ব তাহাও সেই আত্মারই উদ্গমনের উচ্চতর প্রচেষ্টা। নৈতিক উন্নতির ফলে সেই সংঘর্ষ তেমন ঘৃণিত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহারা একে অন্যকে বিনষ্ট করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। যাহা অপকৃষ্ট তাহা উৎকৃষ্টের দ্বারা অপসারিত হইবে। যেখানে অধর্ম্ম সেখানে সংগ্রাম চলিবে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। এই ভাবের সংগ্রামে এক এক প্রকারের উন্নতি এবং তাহাতে পরমাত্মার বিশিষ্টরূপে বিকাশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। তাহা না

হইলে এই জাগতিক ব্যাপার অর্থহীন ভয়াবহ কাটাকাটি মারামারিতেই পর্য্যবসিত হইত। অবশ্য জ্ঞানের অভাববশতঃ প্রত্যেকটি ব্যাপারের উপযোগিতা আমরা সপ্রমাণ করিতে পারি না। শুধু মানুষ এবং পশু যে একে অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছে এমন নহে, বায়ুমণ্ডলের ঝটিকা, ভূগর্ভের অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প এবং ব্যাধিসমূহ মানুষ ও পশু উভয়কেই বিধ্বস্ত করে। হিন্দুর ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি বিশ্বরাজ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকা হেতু মানুষ যখন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, তখনই ভৌতিক জগতে এই সমস্ত উৎপাত দেখা দেয়। বর্ত্তমান জগতে যাহা ঘটিতেছে, তাহার কারণ অতীত জগৎ হইতেও আসিতে পারে। ইহাও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, জগতের ও প্রাণিমণ্ডলীর কার্য্যপ্রণালী কোন্ কোন্ নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অপূর্ণ, তথাপি প্রত্যেকটা ব্যাপারের কারণ বিশ্লেষণ করা যায় না বলিয়া ভগবদ্বিশ্বাসী কেহ কি বিশ্বপ্রকৃতির আত্মপ্রকাশ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন ? তাই বলি, একে অন্যের প্রতি ইতর জনোচিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরিহার-পূর্ব্বক যে যে অবস্থায় আছ সে সেইখানে থাকিয়াই নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাও, ভারত এই মহোচ্চ তত্ত্বজ্ঞানই শিক্ষা দিয়াছেন—"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

এই কথাগুলি লিখিবার সময় অদ্যকার (১৯১৭ সনের কথা) দৈনিক সংবাদপত্রে পড়িলাম, জনৈক মার্কিণদেশীয় পাদ্রীসাহেব নিউইয়র্ক দুর্গের সাবমেরিণ তরীসমূহের কর্ম্মচারীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন—"শত্রু ঘোর নরকেই যাবে, তারা সেখানে পচ্‌বে, ক্রমিকীটের আহার্য্য হবে, তাদের অনুকূলে যারা কথা বল্‌বে তাদের মুখ মুগুরের আঘাতে চূর্ণ করে ফেল্‌বে।" ·········শুধু ইহা নহে, তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান দেখুন,—"আমি চাই, সর্ব্বশক্তি-মান ঈশ্বরের বিচারাসনের কাছে গিয়ে যখন দাঁড়াব, তখন যেন তাঁর

মুখোমুখি হয়ে বল্‌তে পারি যে সংসার গুটিয়ে আস্‌বার আগে জার্ম্মাণদিগকে খুব এক ঘুষি দিয়ে এসেছি।”—ইহাতে কি ভগবদ্ভক্তির লেশমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায়? উপরে ভারতের যে তত্ত্বোপদেশের কথা বলিলাম ইহা তাহার ঠিক বিপরীত। তথাপি এই ধর্ম্মোপদেষ্টা—‘ডাক্তার অব্‌ ডিভিনিটি’—মহাশয় অবশ্যই মনে করেন যে তিনিও ভারতকে ধর্ম্মশিক্ষাদান করিতে পারেন!

মানুষ সকল কর্ম্মই করিবে, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধও করিবে, ব্যক্তিগত হিংসাবিদ্বেষের বশীভূত হইয়া নহে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যও নহে, নিজকে ভগবানের বিরাট সমরবাহিনীর একজন ক্ষুদ্র সৈনিক মনে করিয়া এবং সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাতেই অর্পণ করিয়া। এইভাবে যদি সকলেই চলে তবে একে অন্যের উপর অনুচিত আক্রমণ করিতে পারে না। অথবা শাক্তমতানুসারে মানুষ তাহার সকল কর্ম্মে যদি নিজকে ‘শিবোঽহম্‌’ ভাবে এবং তাহার কর্ম্মশক্তিকে জগন্মাতা মনে করে ও বিশ্বের কর্ম্মরচনার সহিত নিজের সাযুজ্য অনুভব করে তবে কাহারো প্রতি ঘৃণা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিতেই পারে না। সে ভাবিবে বিশ্বমাঝে শিবরূপে তাঁহারই কার্য্য করিয়া যাইতেছে। যিনি তেমনভাবে নিজকে জানেন তিনি বিপুল বিশ্বের শান্তিপূর্ণ স্থিরভাবের প্রতীকস্বরূপ। সেই পরম শান্তি ও স্থিরভাবের প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষ একে অন্যের সহিত বিরোধ করিবে না, পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে। যে আত্মোৎকর্ষসাধনের জন্য অতীতে বিরোধ ও সংগ্রাম চলিয়াছে, অতঃপর আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে অহিংসা ও সমন্বয়ের দ্বারাই তাহা হইবে।

মিঃ অর্চ্চার তাঁহার “ভারত ও ভবিষ্যৎ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—‘এদেশের লোকেরা অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে উন্নতিকে ঘৃণা করে, তাহার নামই শুনিতে পারে না।’ উন্নতি ও সভ্যতা বলিতে তিনি কি বুঝেন আমাদের

তাহা জানা আবশ্যক, কিন্তু কোথাও তিনি তাহা খুলিয়া বলেন নাই! এই সমস্ত পাশ্চাত্য গুরুদের ভারতীয় শিষ্যও অনেকেই আছেন, তাঁহারাও প্রায় ঐরূপই মনে করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ নিজেদিগকে 'স্বাধীনতাকামী' উন্নতিশীল হিন্দু বলেন। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে পূর্ব্বে তাঁহাদের জাতির উন্নতি বা স্বাধীনতা বলিয়া কোন বস্তুই ছিল না। ভারতীয়দের উন্নতিতে বিশ্বাস নাই, এমন হইতে পারে কি? অবশ্য জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা স্বতন্ত্র।

জনৈক মুসলমান নব্যশিক্ষিত যুবক আমাকে বলেন,—"যেই সময় হইতে ইউরোপ 'উন্নতি-প্রয়াসী' হইয়াছে সেইসময় হইতেই তাহার সমৃদ্ধির ও সম্প্রসারণের সূচনা।" এই হিসাবে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি, ভৌতিক শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া তাহাকে মানুষের সেবায় নিয়োগ, অধিকতর স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদিই উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। এই দৃষ্টিতেই ইদানীং পার্থিব ভোগবিলাস বৃদ্ধির ভাব প্রবল হইয়াছে। নৈতিক উন্নতির দিকে যে দৃষ্টি তাহারও লক্ষ্য শিল্প বাণিজ্যাদি যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত চলে। কিন্তু ইউরোপীয় মহাসমর ঐরূপ কল্পনার মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপ বা অন্যান্যরূপ উন্নতির প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? মানুষের প্রকৃতিতেই তাহা বদ্ধমূল রহিয়াছে। কিন্তু অনেকেই তাহার মর্ম্ম এবং লক্ষ্য বুঝিতে ভুল করে। মহাশক্তির আত্মবিকাশের যে মূল প্রেরণা তাহাকে শুধু বিষয়বুদ্ধিতে গ্রহণ করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উন্নতিসম্বন্ধে ধারণাও অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে যখন সকলেই সমভাবে উন্নতিলাভ করিবে তখনই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ হইবে। অথচ উন্নতির একটা তাড়না সর্ব্বত্র আছেই, এবং দিকে দিকে একটা হইতে অন্যটা অগ্রসরও হইতেছে। এই উন্নতি ও সভ্যতা কথাটা যাঁহারা

সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, তাহার প্রকৃত সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাঁহারা উত্তরই দিতে পারিবেন না। এতৎসম্বন্ধে ভারতের অভিমত সুব্যক্তই আছে। আমি তদবলম্বনেই লিখিতেছি। উন্নতি অর্থে যদি বুঝিতে হয় যে সর্ব্বসাকল্যে অতীতে লোক যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিত এখন তদপেক্ষা বেশী করিতেছে তবে প্রশ্ন, এই ভাবের উন্নতির একটা স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি? দেহ মন ও আত্মার সমন্বয়েই প্রকৃত সুখ। অতীত কাল হইতে বর্ত্তমানে কি তাহার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে? ইহা নিশ্চিত যে বর্ত্তমানে অন্তর ও বাহিরে সামঞ্জস্য নাই। পার্থিব ব্যাপারেও তথাকথিত উন্নতির প্রমাণ নাই। বাহ্যতঃ এই যুগে কোন কোন বিষয়ে বেশী সুখ সুবিধা এবং অন্য যুগে অপর কতকগুলি বিষয়ে বেশী সুখ সুবিধা দেখা যায়। যেমন, বর্ত্তমানে ঔষধ ও অস্ত্রোপচার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের লোকেরা এমন স্বাস্থ্যবান থাকিতেন যে এইসব ঔষধ ও অস্ত্রাদির প্রয়োজন তাঁহাদের হইত না। পূর্ব্বে লোকের দেহ ও মন সবল ছিল, অস্ত্রোপচারাদি সহ্য করিতে পারিত; এইক্ষণ সবই দুর্ব্বল, কাজেই অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে সংজ্ঞাহীন করিবার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। সুতরাং প্রশ্ন, সুস্থ সবল দেহ ও মন চাই, না ভাল ঔষধ চাই? ভাল দাঁত চাই, না ভাল দন্ত-চিকিৎসক চাই? যদি উন্নতি অর্থে জীবাত্মাকে নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম মানবীয় স্তরে উন্নত করা হয় তবে তেমন উন্নতির ব্যবস্থা ভারতে আছে। লামার্ক ও ডারউইনের বহুকাল পূর্ব্বে ভারতের লোকেরা অবগত ছিলেন যে জীবাত্মা লতাগুল্ম, কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী ইত্যাদির ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানব-জন্ম লাভ করিয়াছে। ভারত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নাই, মহর্ষিরা অসাধারণ প্রত্যক্ষ আত্মানুভূতির দ্বারাই এই তত্ত্ব অবগত

হইয়াছিলেন। হয়ত কার্য্যকারণের তত্ত্বানুসন্ধানও তাঁহারা করিয়াছিলেন। ভারতীয় সিদ্ধান্তানুসারে আত্মার বাহন এই দেহ ও মনকে ক্রমশঃ পূর্ণ করিয়া তোলা এবং তদ্দ্বারা আত্মার অধিকতর অভিব্যক্তিই প্রকৃত উন্নতি। সাধনাবলে দেহ ও মন উভয়ই ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে দৈবপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রমোন্নতির দ্বারা মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব তথা দেবত্ব লাভ করে। দেবত্বই জাগতিক সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ স্তর। এই বাস্তব উন্নতির পথে যে অবস্থায় মানব নির্ব্বিরোধে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

প্রত্যেক মানুষের মনের অবস্থা ও কর্ম্মশক্তি একরূপ নহে; সুতরাং অবস্থানুসারে আত্মপ্রকাশ করিবার অধিকারও স্বতন্ত্র। কিন্তু সকলেই যদি যথেচ্ছ চলিতে থাকে তবে অরাজকতা অনিবার্য্য, এজন্য প্রত্যেক সমাজের জনসাধারণ কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া চলে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের স্বাধীনতার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে। এক দেশে হয়ত রাষ্ট্রীয় বিষয়ে স্বাধীনতা বেশী দেখা যায়, অন্যদেশে বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে বেশী। ইউরোপে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দ্বার একেবারেই রুদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রুষরাজ্যে যখন স্বৈরাচরী শাসন প্রচলিত ছিল তখন তথায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু তথায় সামাজিক স্বাধীনতা ইংলণ্ড অপেক্ষা বেশী ছিল। সাধনা ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার গুরুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ভারতে তাহা যথেষ্ট আছে। ইহার প্রমাণ ভারতের বহু ধর্ম্মমত ও দার্শনিক মত, যুক্তিবাদ, একেশ্বরবাদ ও অনীশ্বরবাদ এবং বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়। সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম না ঘটাইলে যাহার যেমন রুচি সে তেমনভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারে। ইউরোপের ইতিহাস এতৎসম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা ও অমানুষিক নির্য্যাতনের কাহিনীতেই পূর্ণ। ভারতে এখনো যে কেহ

সমাজ ও তাহার নিয়মানুষ্ঠানাদি ত্যাগ করত তাহার ইচ্ছামত সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপে বিশেষতঃ তাহার পশ্চিমপ্রান্তে রাজকীয় ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থা এতই অধিক যে তৎসমস্তের হাত এড়াইবার উপায় নাই। যাঁহাদের ধর্ম্মমত অহিংসামূলক তাঁহাদের কথাই দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন। আত্মবিবেকানুসারে তথায় যুদ্ধবিরোধী হইয়া থাকিবার উপায় নাই। যিনি তেমন করিতে যাইবেন তিনিই সাধারণের ঘৃণা ও নির্য্যাতন ভোগ করিবেন। কার্য্যতঃ তাঁহাদেরে বলা হয় যে তাঁহাদের স্বতন্ত্র অভিমত থাকিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের দণ্ডভোগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডের বাহিরে ইউরোপীয় মহাদেশে এইটুকুও নাই। সেখানে ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রীদেরও বাধ্য হইয়া সংগ্রামে নরহত্যার ব্যাপারে যোগ দিতে হয়। নিজেদের জ্ঞান বিবেক অনুসারে চলিতে গিয়া ডাকোভোর্শেরা রুষরাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ভারতের ব্যবস্থা কি? যে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যকর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহ তিনিও যদি কাহারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহেন অনায়াসে সেই পথে চলিতে পারেন। পাশ্চাত্যরাজ্যে মানুষের দৈনন্দিন ব্যাপারে অসংখ্য অন্তরায় রহিয়াছে, নিত্য আরো কত নূতন সৃষ্ট হইতেছে। জনৈক মার্কিণ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'মানুষের স্বাধীনতাবিকাশের পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপকেরা কি পরিমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন তথাকার ব্যবস্থাপক সভাসমূহের রিপোর্টই তাহার সুন্দর প্রমাণ। ১৯০৭ সনে যেই দশ বৎসর শেষ হইয়াছে সেই ১০বৎসরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকেরা তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য ২৫০০০ নূতন আইনের সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রধান সহায় বলিয়া যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গর্ব্ব করে ১৯০৭সনের পর হইতে এযাবৎ সেইই আরো অসংখ্য আইন

পাশ করিয়াছে। মানুষ প্রথমতঃ ধর্ম্মযাজকদের ও ভূস্বামীদের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে ; তারপর দেখা যায় নূতন যুগের নূতন স্বাধীনতাও নূতন প্রভুত্ব না হইলে চলিতে পারে না, এবং এই নূতন প্রভুদের জন্য নূতন নূতন আইন চাই। বিধিব্যবস্থার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু এত অধিক অসহনীয়। এখন কেবল সংঘটনের কথাই চলিতেছে। তাহাতে স্বাধীনতা কোথায় ? প্রত্যেক ৫ পাঁচ বৎসর বা কয়েক বৎসর অন্তর পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোটদানের অধিকার লাভ করায় স্বাধীনতার অংশ কতটুকু ? স্বাধীনতা-প্রেমিক পাশ্চাত্যজাতিরা এখনও জ্ঞানচর্চ্চায় ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায় ভারতের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাও সভ্যতার একটা লক্ষণ। তজ্জন্য পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করিতে হয়। কিন্তু রাজকীয় ব্যবস্থা কাহারো ধর্ম্মে বাধা দিতে পারে না, বা বাধ্য করিয়া অধর্ম্ম কার্য্য করাইতে পারে না। সাম্রাজ্যের স্বার্থ হইতে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ ; সাম্রাজ্যবাসী প্রজার ন্যায় তাহার রাজশক্তিও ধর্ম্মের নিয়মাধীন থাকাই আবশ্যক, ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করা কাহারো কর্ত্তব্য নহে।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য

(২)

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষ একটি অতি পুরাতন সমস্যা। লোক-সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, যাতায়াতের সুবিধা বিস্তার, বিভিন্ন জাতীয় সাধনার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব, জ্ঞানের উন্নতি, আর্থিক সমস্যা, এসিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা এবং আরো বহু কারণে সেই পুরাতন সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হইতেছে। জাতিসমূহের যে বিবর্ত্তন চলিতেছে তাহাতে উহাকে পরবর্ত্তী উচ্চ স্তরে লইয়া যাইবার জন্য সমগ্র পৃথিবীই উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানের তুলনায় অতীতে প্রাচ্য প্রতীচ্যে অধিকতর সাম্যভাব ছিল। শ্বেত জাতিরা সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই সাম্যভাবের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে; এইক্ষণ ইংরেজ জাতি সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রাধান্য করিতেছে। এক সময়ে এসিয়া অন্যান্য দেশের উপর প্রাধান্য খ্যাপন করিত। এসিয়াই ইউরোপকে ঝাঁকৃড়াইয়া শক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তৎপূর্ব্বে গ্রীক ও রোমানেরা প্রাচ্যদেশে প্রভুত্ব খ্যাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। তৎপর হুনেরা তরবারি ও কামানের সাহায্যে ইউরোপে প্রবেশ করে। আরবেরা স্পেন অধিকারের পর পিরেনিজ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সে আধিপত্য বিস্তার করে, পরে তথা হইতে বিতাড়িত হইলেও সুদীর্ঘকাল স্পেন তাহাদের অধিকারে ছিল এবং সেইখান হইতেই ইউরোপের সর্ব্বত্র তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তাতারেরা ইউরোপের নানা স্থান আক্রমণ করে, অবশেষে অটোম্যান তুর্কীদের অধিকার বায়জেণ্টাইন

সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হয়। দানিয়ুব নদীর তীর পর্য্যন্ত অধিকারের পরেই তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়। এইরূপে খৃশ্চীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এসিয়াবাসীরা ইউরোপের উপর অনবরত আক্রমণ করিতে করিতে ইউরোপীয় জাতিকে সুদৃঢ় করিয়া তোলে, তুরস্কের শেষ অভিযান প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে নব্য ইউরোপের জন্ম হয় এবং তৎপরেই প্রাচী প্রতীচীর সম্বন্ধ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ইউরোপ সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করায় তাহার সম্মুখে সমগ্র পৃথিবীর আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে, ইউরোপীয়েরা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতেছে, নবাবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্র ও কলকৌশলের সাহায্যে বিজয় লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষ যদি আবার শক্তিশালী হইয়া উঠে তবে আজ যাহারা তাহাকে 'অসভ্য' বলিয়া হেয় করিতেছে অন্ততঃ তেমন করিতে সাহসী হইবে না। এই যে পরের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকিলেই 'সভ্য' উপাধি পাওয়া যায় তাহা আসুরিক ভাবাপন্ন হইলেও তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে মানব হিসাবে সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়।

খৃশ্চীয় মধ্যযুগের অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও তাহার আদর্শ সুন্দর ছিল,—সমাজের মধ্যে পরস্পরে একতা ছিল, বৈষয়িক ব্যাপারে আধ্যাত্মিক প্রভাব সংমিশ্রিত ছিল। আমেরিকা ও প্রাচ্য রাজ্যের আবিষ্কার এবং খৃশ্চীয় ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হওয়ার ফলে ইউরোপীয়েরা চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও পররাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একতার ভাব চলিয়া গিয়াছে, হীন পরস্বাপহরণের যুগই আসিয়াছে। ভূমি অপেক্ষা টাকার মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। 'কলুষিত জাতীয়তার' উদ্ভব হইয়াছে। 'কলের যুগে' কলকৌশলের দ্বারা শিল্পপ্রসারের সুবিধা হওয়া অবধি পরের উপর আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়াছে; এইক্ষণ প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হইয়াছে। পর্ত্তগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ

জাতি বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের জন্য বলপূর্ব্বক এসিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু মহামনা ল্যাস্ ক্যাসাস্ আমেরিকার স্পেনীয় বিজেতাদিগকে 'ইণ্ডিয়ান বিনাশক' আখ্যা দিয়াছিলেন। পৃথিবীর যে যে দেশে ইউরোপীয়েরা গিয়াছে সেই সেই দেশেই ঐ ভাবের ব্যাপার চলিয়াছে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে তাসমেনিয়ার দৃষ্টান্ত দেখুন না কেন?—কাপ্তান ষ্টোনী লিখিয়াছেন, 'আদিম অধিবাসীরা অনেক ক্ষতি করিত, তাই ১৮৩০ সনে ফরেষ্টিয়ার্স উপদ্বীপ হইতে বিরাট বেড়াজালের মত সৈন্যসমাবেশ করত উহাদিগকে হত্যা করিতে করিতে তাড়াইয়া নেওয়া হয়। তাহাতেও উহারা নিঃশেষিত হইয়াছিল না, অন্যান্য উপায় অবলম্বনে তাহাদিগকে ফ্লিণ্ডার্স দ্বীপে আনিয়া আবদ্ধ করার পর সেইখানেই তাহারা নির্ম্মূল হয়। 'উনবিংশ' শতাব্দীতে অষ্ট্রেলিয়ার উন্নতি' নামক গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন,—সেই শান্তশিষ্ট অসভ্য জাতির শেষ জীবিত ব্যক্তি টার্গানিনিকে তদানীন্তন ঔপনিবেশিকেরা যে হৃদয়বিদারক উপায়ে নিঃশেষ করিয়াছিল তাহা তাহাদের মহা কলঙ্কস্বরূপ। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয়দের হাতে ভারতের পরাভব আরম্ভ; বরাবরই পশুবলের পূজা চলিয়াছে; পর্ত্তুগীজ, স্পেনিয়ার্ডস্, এবং ওলন্দাজেরা একে একে কিছু-কাল প্রাধান্য করিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়ে; তারপর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পালা। ইউরোপে নেপোলিয়নের পতনের পর ইংরেজেরাই প্রাধান্য লাভ করে। মেকলে লিখিয়াছেন, ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বে (১৭৫০ খৃষ্টাব্দে) ইংরেজেরা ভারতে ফেরিওয়ালা বলিয়াই অবজ্ঞাত ছিল, এবং ফরাসীরা বিজয়ী বীর বলিয়া শ্রদ্ধা পাইত। যেই মুহূর্ত্তে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে পরাস্ত করিল সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার ইতিহাস ও তাহার ভূমি জগতে গৌরবান্বিত স্থান অধি-কার করিয়াছে। ইউরোপীয় বর্ত্তমান সভ্যতার অভ্যুদয় খৃশ্চীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা সময়ে সময়ে পররাজ্য

আক্রমণ করিতে গিয়া কেবল আত্মশক্তি ক্ষয় করিত, ক্ষণিক প্রাধান্য খ্যাপন করতঃ সরিয়া পড়িত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিষ্কারের পর হইতে সেই পুরাতন ক্ষণিক প্রাধান্যকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রভুত্ব খ্যাপনের পরিবর্ত্তে একেবারে মালিক হইয়া বসিতেছে। তারপর সেই শক্তিমত্তাকে সুন্দর কাহিনীর দ্বারা সাজাইয়া লোকচক্ষে মনোরম দেখাইবার চেষ্টা। এই সমস্ত যে ছল চাতুরী বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। কালের স্রোত অন্যান্য মিথ্যা প্রবঞ্চনার ন্যায় এইগুলিকেও ভাসাইয়া নিয়া নিভৃত অন্তরালেই নিক্ষেপ করিবে।

"এসিয়ায় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে দোলকের গতি যে ফিরিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যেও সূচনা হইয়াছে। ইজিপ্ট, মরক্কো, আল্‌জিরিয়া এবং ফরাসী সুদানেও চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। জাপানের বিখ্যাত গ্রন্থকার ডাক্তার ইউজিরোমিয়াকা এই কথাগুলি ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ার চারি বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে তখন ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড রুষিয়া এবং ইংলণ্ডের নিম্নে স্থান পাইত। আর এইক্ষণ রুষিয়া অন্তর্দ্রোহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইংলণ্ডই তাহার উপর প্রাধান্য খ্যাপন করিতেছে, এবং সমগ্র এসিয়ার চাবি ইংলণ্ডেরই হাতে বলিয়া বোধ হইতেছে।" উক্ত গ্রন্থকার ১৯১৮ সনে "এসিয়ার ভবিষ্যৎ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,— 'এযাবৎ এসিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের অদৃষ্ট স্বীয় স্বীয় শক্তি ও ভাবানুসারে স্বতন্ত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, কিন্তু এইক্ষণ এশিয়ার সর্ব্বত্র সমানভাবে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে! অতীতের তুলনায় ইহা অতি বিরাট সুগভীর ও বহুদূরবিসারী।"

ইউরোপীয় মহাসমরের ফল ইহাকে বিশেষভাবে অগ্রসর করিতেছে। এই মহাযুদ্ধের ফলাফল নিবিড়ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা

যাইবে যে তদ্দ্বারা এইখানেই ইউরোপীয় সভ্যতার একটি স্তরের অবসান হইয়াছে। খুব সম্ভব ইউরোপীয় ভূস্বামিত্বের প্রথা ও শিল্পনীতি অন্তর্হিত হইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারকে এখনই (১৯১৮ সনে) পুরাতন পৃথিবীর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই যুগের অবসান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্বন্ধ বদ্‌লাইবারও কারণ হইবে। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'এসিয়ার ৮৫,০০,০০,০০০ পঁচাশী কোটী অধিবাসী যেদিন সংজ্ঞালাভ করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত গণশক্তির উদ্বোধন আরম্ভ করিবে সেদিন যে তুমুল ঝটিকার উদ্ভব হইবে তাহাতে সমগ্র পৃথিবীই আলোড়িত হওয়ার সম্ভাবনা। এসিয়ার ঘূর্ণীবায়ু একবার পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসিয়াছে, দ্বিতীয় বার আরম্ভ হইলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বেগবান ও বিপুলতর প্রভাবশালী হইবে। সেই মহাশক্তির উদ্বোধন এসিয়াতে আরম্ভ হইয়াছে।'

যাঁহারা এসিয়ার আরব্ধ আন্দোলনের পরিণাম কি দাঁড়াইবে জানিতে উৎসুক তাঁহারাই ইহার গভীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কেহ কেহ বলেন, জাপানই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। সেই জাপানের একজন লিখিয়াছেন—"বিগত যুদ্ধের পর হইতে খৃশ্চান মিশনারীরা অধিকতর শ্রম ও ত্যাগের সহিত প্রাচ্য দেশে খৃশ্চানধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও আচারপদ্ধতিসমূহের দোষত্রুটি প্রদর্শন ও পাশ্চাত্য ভাবের প্রতি প্রলোভন দ্বারা খৃশ্চান মিশনারীরা তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা এদেশে বিস্তার করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিবেন। কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহকে পাশ্চাত্যভাবে ভূষিত করিতে পারিলেই যে প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যের ভয় নিরাকৃত হইবে। প্রাচ্য জাতিসমূহ যতক্ষণ তাহাদের জাতীয় ধারা ও আচারানুষ্ঠান পালন করিবে ততদিন যে তাহারা ইউরোপের

পদানত হইবে না। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা যে প্রাচ্য সভ্যতাকে আক্রমণ করিতেছে, তাহা শুধু পাশ্চাত্যের আত্মরক্ষার জন্য। পাশ্চাত্যেরা যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার বিরোধী কিছু দেখিলেই তাহারা উহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে, তজ্জন্য তাহাদেরে দোষ দেওয়া যায় না, যদি তাহারা সত্য ও সরলতার সহিত তেমন চেষ্টা করে। স্বীয় সম্পদ্ রক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। সেইরূপ ভারতও পুরুষানুক্রমে যে সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে বাহিরের সমস্ত আক্রমণকে সর্ব্বপ্রযত্নে ব্যর্থ করিয়া তাহা সংরক্ষণ করাই তাহার ধর্ম্ম। ইংরেজী ভাষা, ইংরেজের প্রভাব ও তাহার রীতিনীতি যেভাবে ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে এতদিনে যদি তাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিত তবে ইংরেজদিগকে রাক্ষস বলিতে পারিতাম না। তাহাতে ভারতের লোকেরা ইংরেজের কবলগ্রস্ত হওয়ার মতন পদার্থ বলিয়াই প্রমাণিত হইত। অতঃপর তাহারা ইংরেজের ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিণত হইবে কি না তাহারাই বলিতে পারে। এতদিন সামরিক শক্তি ইউরোপের হাতেই ছিল, বিগত মহাসমরে বহুল পরিমাণে সেই শক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদের সমস্ত শক্তি আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থার জন্যই নিয়োগ করিতে হইবে, সম্ভবতঃ তজ্জন্য সমাজবিপ্লবেরও প্রয়োজন হইবে। অধিকন্তু পাশ্চাত্য রাজ্যেও পাশব বলের প্রতি আনুগত্যের ভাব চলিয়া যাইতেছে। অবশ্য একেবারে নিঃশেষ হইতে কিছু বিলম্ব আছে। "জাপান ম্যাগেজিনের" জাপানী লেখক লিখিয়াছেন,—"যে দেশে কন্‌ফুইসাস্, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের জন্ম (আমি তৎসঙ্গে যোগ করিতে চাহি, যে দেশে অবিনশ্বর উপনিষদের জন্ম) সে দেশে সামরিক শক্তি অপেক্ষা এমন প্রবলতর শক্তি আছে যাহার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তাহাদের অর্থসম্পদ্ বেশী না থাকিতে পারে, পার্থিব

সম্পদের উপাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত অন্য কোন সম্বলও না থাকিতে পারে, কিন্তু এসিয়ার অসংখ্য অধিবাসীদের ভিতর এমন বহুসংখ্যক লোক আছে যাহাদের মধ্যে প্রকৃত মানবতার পরিচায়ক বুদ্ধিশক্তি ও আত্মজ্ঞান আছে যাহা পাশ্চাত্য সমস্ত বৈভব অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান।" এই উক্তির সহিত আমি যোগ করিতে চাহি, ইহাও ক্ষণস্থায়ী স্তরমাত্র, ইহার মূলে মহোচ্চ উপাদানপূর্ণ অবিনশ্বর সাধনা রহিয়াছে।

উপরে অধ্যাত্ম শক্তির কথাই বলা হইল, অপর সমস্ত শক্তির মূল উৎস অধ্যাত্ম শক্তি। একজন ভারতীয় লেখক লিখিয়াছেন,—"আধ্যাত্মিকতা ভারতের একচেটিয়া নহে। কিন্তু বিভিন্ন সভ্যতা বিভিন্ন ভাবে ইহার প্রতি ব্যবহার করে। যেমন বর্তমান ইউরোপের সভ্যতা পার্থিব ব্যাপারকে, গ্রীক ও রোমের সভ্যতা বুদ্ধিবৃত্তিকে এবং ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিকতাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করে। যদিও মিঃ আর্চার ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তথাপি ভারত যাহাকে আধ্যাত্মিকতা বলে তদনুসারেই যে ইহার সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'ধর্ম্ম সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে বহু ধর্ম্মমতের জন্মভূমি ভারতেই যাইতে হইবে।"

ভারতের ধ্যানকেন্দ্র হইতেছেন সনাতন ব্রহ্ম; জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে ব্রহ্মই বিদ্যমান—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মকে লাভ করাই ভারতের ধর্ম্ম। তাহার সমগ্র ধর্ম্ম বা বিধি-ব্যবস্থা এই অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাহার দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, কলাবিদ্যা সমস্তেরই লক্ষ্য সেই উপরের দিকে। তাহার উন্নতি বুঝিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি, এবং মহোচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্বের উপর তাহার জীবনের ভিত্তি; ব্রহ্মকে

লাভ করার প্রেরণাই ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা। তাহার নিষ্ঠা ও তাহার আদর্শ, মানব-সমাজে তাহাকে এক বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যত্র অন্য ভাবের প্রাধান্যে অন্যরূপ সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য কোনটাই অধ্যাত্মজ্ঞান হইতে একেবারে বর্জ্জিত নহে ; কেন না, অধ্যাত্ম জ্ঞান যে মানবতার অংশ। পার্থক্য কেবল সেই খানেই যেখানে কেহ ইহাকে সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব দান করে, অন্তরে বাহিরে ইহার প্রেরণায় চলে, আর অন্যে ইহাকে স্বতন্ত্র স্থান দান করে, সর্ব্ববিষয়ে ইহার প্রাধান্য স্বীকার করে না। আমরা ইহাকে সাধনার একটা উচ্চ স্তর মনে করি। বহু প্রাচীন সভ্যতার ধারা প্রথমোক্তরূপ ছিল। সেই আদর্শ হইতে এইক্ষণ অনেকেই চ্যুত হইয়াছে, এবং আধুনিক অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিতেছে। (এই কথাটা রোমান ক্যাথলিক্‌দের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে)। লেখক বলেন,—একমাত্র ভারতই তাঁহার অধ্যাত্ম ভাবের প্রতি একনিষ্ঠ রহিয়াছে। মিঃ আর্চ্চার যদিও ক্রোধবশতঃ বলিয়াছেন যে বিজাতীয় ভাবের প্রতি ভারতীয়েরা ভয়ানক বিদ্বেষী, বস্তুতঃ একমাত্র ভারতবর্ষই এখন যাবৎ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও ব্যবসাবুদ্ধির নিকট তাহার জানু অবনত করে নাই, পাশ্চাত্যের হাতে তাহার দেবতাকে সমর্পণ করে নাই। এতদবস্থায় দুইটি দিক্ আমরা দেখিতে পাই :—হয় ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের অনুকরণে যুক্তিবাদী ও ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে, অথবা তাহার উচ্চ আদর্শ ও সভ্যতার দ্বারা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভাবকে অনুপ্রাণিত করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর করিবে। তারপর গভীর প্রশ্ন :—ভারতের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অনুসারে ইউরোপ চলিবে, না ইউরোপের যুক্তি ও ব্যবসায়নীতি ভারতীয় সভ্যতাকে উন্মূলিত করিবে ? অতঃপর মানবজাতি কি ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণ করিবে, না পাশ্চাত্য জড়বাদের অনুসরণ করিবে ? যুক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া

কিম্বা ধর্ম্মের নামমাত্র সংশ্রব রাখিয়া দেহেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি অনুসারে আত্মা ও মনকে পরিচালিত করা হইবে, না আধ্যাত্মিকতাকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়া মন ও দেহের প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করত উচ্চতম স্তরের সাম্যভাব লাভের চেষ্টা করা হইবে? একজন চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন,—সংঘর্ষ যে ভাবেই চলুক না কেন, তাহা পাশ্চাত্ত্যে উন্নত প্রণালীর চিন্তাশীলতার সর্ব্বোত্তম ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্যই করিতেছে এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরের সাম্যভাব আনয়ন দ্বারা যাহাতে সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে তাহাই করিবে। ভাল কথা। আমি বলিতে চাহি, যুক্তিযুক্ত পুরাতন প্রথা সংরক্ষণও একান্ত আবশ্যক। মানব অন্তরের চিন্তা সামাজিক এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথাসমূহেই মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয়। যদি সেই সমস্ত অকালে বিলুপ্ত হইয়া যায় তবে প্রাগুক্ত চিন্তাধারা বিদেশীয়েরা কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিলেও তাহার মৌলিক শক্তি এবং প্রেরণা থাকিবে না। এজন্য ভারতের সামাজিক গঠনপ্রণালী ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের রীতিনীতি সাময়িক অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইলেও মূলতঃ অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত আবশ্যক। ভারতীয় সভ্যতাকে ভারতের মনীষীরা যেমনভাবে অধ্যাত্মসাধনা ও জ্ঞানগবেষণার দ্বারা প্রবুদ্ধ এবং নানা সামাজিক প্রথা ও শিল্পকলার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, ভারতের লোকেরাই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম। এইক্ষণ তাঁহারাই যদি ভারতীয় সভ্যতাকে যথাযথ রক্ষা করেন এবং আলস্য ঔদাস্য ত্যাগ করতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন তবে তাঁহারাই তাহার সম্যক্ প্রভাব পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে পারিবেন এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

সাধনার স্বরূপ কি ?

(৩)

যদ্দ্বারা আত্মার বা সূক্ষ্ম শরীরের অভিব্যক্তি হয় তাহাই সাধনা। এই অভিব্যক্তি দুই প্রকারের। একপ্রকার—আধ্যাত্মিক, তাহা আভ্যন্তরীণ সত্যকে প্রকাশ করে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দ্বিতীয়—যাহার সম্বন্ধ বাহ্য জগতের সহিত ; কর্ম্মে ইচ্ছাশক্তি, জীবনযাত্রায় বুদ্ধি-বিচক্ষণতা ও প্রাকৃতিক্ সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা ইত্যাদিতেই তাহার বিকাশ। যুক্তিবাদী লেখক মিঃ আর্চ্চার সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় যাঁহারা সমস্ত পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মের সুনির্দ্দিষ্ট অবলম্বনকে অগ্রাহ্য করিয়া চলেন তাঁহারা অবশ্যই সভ্যতার উপাদান কি এবং তাহার পরিণতিই বা কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে বেগ পাইবেন। সাধনার সহিত যখন জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের—জাগতিক বুদ্ধিবিবেক বিষয়ক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে তখন শুধু একদিক্ ধরিয়া বিচার করিলে চলিবে না। মন ও দেহকে অবলম্বন করিয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা অগ্রসর হয়, এবং সকল দিকেই যাহাতে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাই সভ্যতার লক্ষ্য। ভারত চিরকাল ইহাই শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। যদিও তাঁহার এই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মমত সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই তথাপি বলা যাইতে পারে ইহাই তাঁহার সভ্যতার উপাদান। শুধু বিষয় বা বুদ্ধির খেলা যেখানে সেখানে এমন ব্যাধির বীজ নিহিত থাকে যাহা মানুষকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সভ্যতার লক্ষ্য মর্ত্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করা। ভারতবর্ষ মনে করেন,—'রাজ'

ভগবানেরই এবং পূতচরিত্র মানবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য,—এই জন্যই ভারতের শাস্ত্র বলেন,—দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যে তাহা সার্থক করে না, সে আত্মঘাতী।

ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতির আত্মা সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীরের সমবায়ে গঠিত। আত্মা সর্ব্বত্রই এক। জাতীয় সাধারণ আত্মারই স্বরূপ প্রকাশের জন্য ব্যক্তি তদুপযোগী সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর ধারণ করে। অতীত জন্মের সংস্কার লইয়াই এক একটা জাতির উদ্ভব হয়। প্রত্যেক জাতি বিশ্বজননী মহাশক্তির এক একটা অভিব্যক্তি বিশেষ। এইরূপে হিন্দুর চক্ষে ভারতবর্ষ পূজ্য, স্বয়ং মহামায়াই ভারতরূপে পরিদৃশ্যমানা। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে বিশুদ্ধরূপে ভারতের সেবাই মহামায়ার সেবা। মিঃ আর্চ্চার লিখিয়াছেন,—'রাজনৈতিক "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের বিষয়কেও ভারতীয়েরা ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করে।' ঐ বাক্যের এবং ধর্ম্মের অর্থ বুঝিতেই মিঃ আর্চ্চার ভুল করিয়াছেন। ভারতবর্ষ বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা ভূপৃষ্ঠের এমন একটা অংশ যেখানে কেবল জড়পদার্থ মানুষেরই বসতি। যদি এক জনের বিশ্বাস না থাকে যে এই দেশ ও জনপুঞ্জ ভগবচ্ছক্তিরই বিরাট অভিব্যক্তি, ভগবানই একমাত্র উপাস্য, জাতির পুনরুত্থান ও উন্নতির তিনিই একমাত্র বিধাতা তবে কি সে এই সমস্তের উপাসনা করিতে পারে? যাহা জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা ধর্ম্ম, দার্শনিক জ্ঞান, কলাবিদ্যা, সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থা প্রভৃতিকে বিশিষ্ট আকার প্রদান করে তাহাই জাতীয় সভ্যতা। যেমন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর দৈহিক সংঘর্ষে রত, তেমনই তাহাদের সূক্ষ্মশরীর এবং সভ্যতাও একে অন্যের উপর প্রাধান্যস্থাপন ও প্রভাব বিস্তার করিতে, অথবা একে অন্যকে গ্রাস করিতে ব্যগ্র। এইরূপ সংঘর্ষ কিছু অর্থহীন নহে। বিশ্বের কোন কার্য্যই নিরর্থক নহে। বাস্তবিক ইহা বিশ্বাত্মারই স্বপ্রকাশের উদ্যম। অবশ্য যাহারা

সংগ্রামে রত তাহারা যে এ তত্ত্ব অবগত আছে, বা এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই সংগ্রাম করিতেছে এমন নহে। দু'একজন ত্যাগী মহাপুরুষ তেমনভাবে চলিলেও অধিকাংশ অন্য ভাবেই চলে।

ইতিহাসের দিকে তাকাইলে দেখি লোকেরা এযাবৎ জাতি ও সম্প্রদায় হিসাবে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া ঐরূপ সংগ্রামে রত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেকে নিজের স্বার্থকে নানা কপট আবরণে সুরঞ্জিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেও আসল বিষয় ঢাকা থাকে না। যেমন বর্ত্তমানে মানুষের দৈহিক লজ্জাবোধ জন্মিয়াছে বলিয়া তাহার উলঙ্গ দেহকে বস্ত্রাবৃত করে, তেমনই তাহার নৈতিক লজ্জাবোধ তাহার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থকে নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণার আবরণে ঢাকিয়া দেখাইতে চাহে। সত্যনিষ্ঠ লোকের নিকট এইরূপ কপটতার মত ঘৃণিত ব্যাপার আর নাই, এবং মানুষে মানুষে অবিশ্বাস সৃষ্টির কারণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতাস্থাপনের শত্রুও ইহার মত আর কিছুই নাই। তথাপি দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ—এই সমস্ত কপটতার যুগের অবসানেই হয়ত এমন শুভসময় আসিবে যখন মানুষ সততারই শ্রদ্ধা করিবে, এবং সততার সহিত চলা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায় কর্ত্তব্য মনে করিবে। দ্বিতীয়,—হয়ত তখন মানুষ ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথে সকলের সহিত সততা রক্ষা করিয়া চলাকেই লাভজনক দেখিতে পাইবে! ভগবানের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে বিষম বিরুদ্ধ উপাদানসমূহও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ধর্ম্মকে যে বিনাশ করিতে চায় ধর্ম্ম তাহাকেই বিনাশ করেন, বহু আঘাত সহিয়াও ধর্ম্ম বাঁচিয়া থাকেন।

বহুদিন যাবৎ এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছে তাহা এক বিরাট ব্যাপার। উহাতে একটা এসিয়া এবং অপরটা ইউরোপীয় আত্মানুভূতির দিক্ প্রকটিত হইতেছে। ইহাদের যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া

অসম্ভব। ইউরোপের কয়েকটা জাতি এসিয়াতেই উদ্ভূত এবং স্বভাবেও এসিয়াবাসীর মত চলিতেছে। অপরদিকে প্রাচ্য দেশীয়দের কতিপয় লোক ইউরোপীয় প্রভাবানুসারে তদনুরূপ হইয়া যাইতেছে। প্রাচ্যবাসীর ইউরোপীয় অনুকরণসম্বন্ধে পাশ্চাত্য কেহ কেহ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞান ও রীতিনীতি দেখামাত্রই প্রাচ্য-বাসী কেহ কেহ হুবহু অনুকরণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের ভিতরটা বদ্‌লাইতেছে না। বাহিরে যতই পরিবর্ত্তন করুক না কেন তাহাদের কতকগুলি স্বভাব ও আন্তরিক বৃত্তি একিবারে অপরিবর্ত্তনীয়। পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ার গুণে ত বটেই, আমি বলিব, তাহাদের বহু পুরুষপরম্পরাগত সংস্কারগুণেও সেগুলি গভীররূপে বদ্ধমূল। প্রাচ্যে প্রতীচ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য বরাবরই আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে অনেক বিষয়ে সাম্যও ছিল, আধুনিক শিল্প বাণিজ্যনীতির প্রসারফলে পার্থক্যটা উৎকটভাব ধারণ করিয়াছে। এখনও নব্যতন্ত্রের খৃশ্চান ও আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয়দের তুলনায়, প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিক খৃশ্চানদের সহিত হিন্দুদের পার্থক্য অনেক কম।

পুরাকালে ভারতবর্ষ যে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশের সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সশস্ত্র আক্রমণদ্বারা নহে, জ্ঞানের দ্বারাই। কেবলমাত্র এসিয়ার আরবদেশই অস্ত্রবলে ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছিল। অন্যপক্ষে তখন ইউরোপীয় কোন জাতির ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়া এদেশে আধিপত্য বিস্তারের বা এদেশের সভ্যতা পরিবর্ত্তনের শক্তিও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। এদেশের অর্থ পাইয়াই তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইত। ভারতের মুসলমান সম্রাটেরাও রাজত্ব করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, প্রজাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ও চিরন্তন প্রথায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। অপিচ, রাজা ও প্রজা উভয়েই

এসিয়াবাসী ছিলেন। সেইরূপ ইংরেজেরাও প্রথমে বাণিজ্য লইয়া, তারপর রাজ্যাধিকার লইয়া ব্যস্ত ছিল, ভারতীয়দের ধর্ম্মবিশ্বাস বা রীতিনীতি যাহা তাহাদের স্বার্থে আঘাত দিত না তাহা লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইত না। তাহাদের অধিকার ও ব্যবসায়কে সুদৃঢ় করিবার জন্যই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিত। পলাশী যুদ্ধের পরে ক্রমশঃ ভিত্তি শক্ত করিয়া বসিবার পর হইতেই এদেশে ইংরেজী সাধনার প্রভাব বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহারা এদিকে তেমন মনোযোগ দেয় নাই। সেই সনে সার টমাস ষ্ট্র্যাঞ্জ তাঁহার 'হিন্দু আইন' প্রণয়নের সময় লিখিয়াছিলেন,—আমাদের নিজের স্বার্থ ছাড়া ভারতের জন্য কি করা উচিত সে সম্বন্ধে আমরা আদৌ চিন্তাই করি না।" তাহার পর হইতে এদিকে বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে ইংরেজদের মধ্যে এদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে দুইটি দল হয়। একদল বলেন,—এদেশের ভাষাতেই এদেশীয়দিগকে সুশিক্ষিত করা উচিত, অন্য দল ইংরেজীভাষা চালাইবার জন্যই বদ্ধপরিকর হন এবং তাঁহারাই জয়লাভ করেন। ইহার ফলে ইংরেজের ভাব এবং আদর্শ ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভারতের কেহ কেহ নিজেদের ভাব ও আদর্শ ত্যাগ করিয়া উহাই গ্রহণ করিয়াছে। ১৮৩৪ সনে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময় প্রস্তাব হইল,—ভারতবাসীদের মধ্যে 'ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিস্তার করার জন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক, এবং শিক্ষার জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তাহা কেবল ইংরেজী-শিক্ষা বিস্তারের জন্যই দিতে হইবে।'—এই নির্দ্ধারণের সময় ইংরেজ মেম্বরদের মধ্যে যাঁহারা দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন তাঁহাদিগকে কাহারো কাহারো ব্যক্তিগত অভিমত ও উদ্দেশ্য যাহাই হউক স্বার্থই যে ঐরূপ সিদ্ধান্তের প্রবল কারণ

তাহা নিঃসন্দেহ। অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপার ঐ ভিত্তির উপরই চলিতেছে। ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ভারতীয়দের সংখ্যা অফিসের চাকরীর পরিমাণ হইতে বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হইয়া আসিতেছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস্ উড ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে ব্যবস্থা করেন তাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সূচনা হয়। ঐ সময় হইতেই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের কার্য্য গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বে-সরকারী স্কুলগুলিকেও সরকারী ইনস্পেক্টরদের পর্য্যবেক্ষণাধীন করত সরকারী স্কুলের আদর্শানুযায়ী করা হইয়াছে। ১৮৮২ সনে গবর্ণমেণ্টের শাসন কিছু শিথিল করা হইয়াছিল, ১৯০২ সনে আবার তাহা বৃদ্ধি পায়। বর্ণনাবাহুল্য না করিয়া বলা যাইতে পারে যে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা কার্য্যতঃ শিক্ষার, তথা জ্ঞানানুশীলনের সমস্ত পরিচালন কার্য্য গবর্ণমেণ্টেরই হাতে রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি ব্যতীত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নানা সংঘর্ষে পড়িয়া এদেশের প্রাচীন সাধনার ধারা রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা যদি সার্ব্বজনীন হইত, এবং বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা যদি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিত, এবং ইতিমধ্যে যদি হিন্দুদের ভিতর জাতীয় জাগরণ না আসিত তবে এতদিনে সমগ্র হিন্দুস্থান এংলিস্থানে পরিণত হইত। ক্ষমতাশালী জাতি দুর্ব্বল জাতিকে প্রথমতঃ অস্ত্রবলে আয়ত্ত করিয়া তারপর যখন ইচ্ছামত তাহার সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে তখন তদ্দ্বারাই তাহাকে গ্রাস করে। বর্ত্তমানে ভারতে সেই নীতিই চলিতেছে। এইরূপ গ্রাস করিবার পথে বাধা জন্মিলেই

সমাজ ও সভ্যতার সংঘর্ষ উপস্থিত করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই। এই সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই ভগবান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। সুতরাং যে কোন প্রকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা ইংরেজেরা যদি ভারতের ভাবধারাকে পরাভূত করিয়া তদুপরি তাহাদের সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করে, বিশেষতঃ ভারতের অনেকেই যখন তাহা চাহে এবং নিজেদের সভ্যতাকে অবজ্ঞা করে তখন ইংরেজদিগকে তজ্জন্য দোষ দেওয়া যায় না। তাহাদের যাহা আছে তাহা ব্যতীত তাহারা আর কি দিতে পারে? তেমনই ভারতীয়দের উচিত তাহাদের নিজ সভ্যতার বিশেষতঃ ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধন করা। ভারতের লোকেরা তেমনভাবে প্রতিবাধা জন্মাইতেছে বলিয়া, মিঃ উইলিয়ম আর্চ্চার 'হিন্দুত্বের আক্রমণের' উক্তি করিয়াছেন। মিঃ আর্চ্চারের এই উক্তি শুনিয়া মেষের বিরুদ্ধে ব্যাঘ্রের অভিযোগের গল্পই মনে পড়ে। ফ্রান্সে একটা বিদ্রূপাত্মক উক্তি আছে,—"এই জন্তুটা বড় দুষ্ট, মারিতে গেলেই সিং নাড়ে।"

আক্রমণে কোন দোষ নাই, যদি ন্যায়ানুসারে তাহা করা হয়। কারণ অনেকের মতে তাহাই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। বস্তুতঃ ভারতের সভ্যতা ও ভাবধারার বিস্তার করিতে গিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আক্রমণ করা অন্য সমস্ত আক্রমণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ্। ভারতীয় সভ্যতার প্রধান গুণ হইতেছে পরমতসহিষ্ণুতা, এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ মহিমা হইতেছে আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের প্রধান উপাদান স্থির করা। অন্যপক্ষে ভারতের উদার উচ্চ অধ্যাত্মবাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইলে জগতের পক্ষে কল্যাণ হইবে। অন্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া নিজের অসহিষ্ণু ধর্ম্মমত প্রচার করিতে গেলেই বিপরীত ফল দাঁড়ায়। ক্রমাগত তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও নিন্দাচর্চ্চার সহিত এদেশের ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিতে করিতে এদেশবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এমন যে হইয়াছে তাহাই মঙ্গলের কথা। ব্লিষ্টার লাগাইলে রোগী চীৎকার আরম্ভ করে, তজ্জন্য আমাদের দুঃখ হয় না, আমরা বলি যে ঔষধ ধরিয়াছে।। যদি বিদেশীয়দের আক্রমণে ভারতবাসীর চৈতন্যলাভ হয়, তাহাদের সাধনার ধারা রক্ষার্থ প্রস্তুত হয়, তবে ঐ আক্রমণ অনুচিত হইলেও তাহার ফল ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে।।

অনেকে যোগশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ করিয়া থাকেন। নির্ব্বিরোধ আত্মত্যাগ হিন্দু ও খৃশ্চান সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যাহারা আত্মসম্মান ও সৎসাহস ব্যতীত আর কিছুই ত্যাগ করে না। যিনি খাঁটি আত্মত্যাগী তাঁহার অন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে সংসারে বাস করে, তাহাকে আত্মরক্ষার কার্য্য করিতেই হইবে। যাহারা পূর্ব্বপুরুষদের ধারা হইতে অধঃপতিত হয় তাহারা উৎসন্নই যাইবে। বাঁচিতে হইলে তাহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত যাহা কিছু মূল্যবান তাহা সযত্নে রক্ষা করা। তাই ইদানীং নবজাগ্রত উৎসাহ এবং পাশ্চাত্য ভাবের ও সাহসের মূর্ত্তিস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনকে জগজ্জয়ী করিবেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। যাহারা ক্রমাগত সুদীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের সভ্যতা, ধর্ম্মমত ও আচরণের বাহাদুরী দেখাইয়া পরকে আক্রমণ করে তাহাদের মুখে বিবেকানন্দ প্রভৃতির ঐরূপ প্রচারের দোষ প্রদর্শন শোভা পায় না। পাশ্চাত্যবাসী যেমন অত্যাচারের আশ্রয় লয় ভারতবাসী কখনো তেমন লইবে না। ভারতের বক্তব্য এই যে,—তোমরা একবার তাহার ধর্ম্মমত শুন। তাহার বিশ্বাস, সে সত্য ধর্ম্মেরই সেবক, এবং আত্মশক্তি বলেই সত্য প্রতিষ্ঠ হইবে। যে কোনরূপ সত্যই হোক্ মানবের হৃদয় ও মন অধিকার করিতে তাহার অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে ভারতের ভাবধারা আবার জগতের অপর সকলকে

প্রভাবান্বিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অথচ খৃশ্চান মিশনের ন্যায় ইহার প্রচারের জন্য তেমন কোন অর্থবল নাই। যাহারা এতদিন সজোরে তাহাকে বিধ্বস্ত করিতেছিল, তাহারাই এইক্ষণ তাহার নিকট মাথা নোওাইতেছে। একজন খৃশ্চান মিশনারী প্রায় ২৫শ বৎসর কাল এদেশে বাস করিবার পর গত বৎসর (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) যে একটা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন,—

"অনেকদিন পরে ইংলণ্ডে আসিয়া পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতি অবগত হইবার চেষ্টা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে জার্ম্মেণির, আমেরিকার এমন কি ইংলণ্ডেরও ধর্ম্মজগতে হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মারাত্মকতা যে কত দূরব্যাপী তাহা বুঝাইয়া দিতে হইলে আমা অপেক্ষা বহুগুণ বুদ্ধিনিপুণ ও বিচক্ষণ লেখকের প্রয়োজন। ইহার প্রভাব বর্ত্তমানে না হইলেও পরবর্ত্তী যুগে খৃশ্চান ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবে। অতএব তাহার প্রতিবিধান অবিলম্বে আবশ্যক।"
—এইরূপ আশঙ্কা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। কারণ, কোন ধর্ম্মমতের বা সভ্যতার প্রাধান্য স্থাপন আমার লক্ষ্য নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্মমত গ্রহণ করিবে। হিন্দুত্ব কাহারো উপর জবরদস্তি করিয়া নিজকে গ্রহণ করাইতে চাহে না। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে একের অপেক্ষা অন্যের দাবী আমার উপর বেশী, তথাপি আমি মনে করি সকলেই ভগবানের কাজ করিতেছেন, এবং সত্যস্বরূপ ভগবানই বিজয়ী হইবেন। বেদান্তের উপাসকগণ অবশ্যই খৃশ্চান মিশনারীর ঐ উক্তি হইতে বুঝিতে পারিবেন, ভারতীয় সভ্যতা যুগ যুগান্ত ধরিয়া কেন অমর হইয়াছে, এবং কেনই বা বেদান্তের জ্ঞান ভারতকে জগদ্‌গুরুর পদে সমাসীন করিয়াছে। এইক্ষণ যিনি যাহা সত্য বলিয়া সরলভাবে বিশ্বাস করেন তাহার সংরক্ষণ এবং উৎকর্ষসাধন করুন। 'সরলভাবে' বলিবার

তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মই সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা কোন কোন ধর্ম্মমতকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে তাহার সমর্থন করে। যে মহান্ জ্যোতিঃ জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করিতেছেন তদ্বিরুদ্ধে ঐরূপ মিথ্যা আচরণ মহাপাপ! মিঃ আর্চ্চার ও তন্মতাবলম্বী পাশ্চাত্য লোকেরা অস্বীকার করিলেও ভারতের সভ্যতা যে উচ্চ স্তরের তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা এখনও অসভ্যতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহারা কেন বলেন, তাহাই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মিঃ আর্চ্চার তাঁহার 'ভারতের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"যুক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব কি না ভারতের ভবিষ্যতের উপরই তাহা নির্ভর করে। কারণ, বিভিন্ন জাতির উন্নতিতে আকাশ পাতাল পার্থক্যই পৃথিবীর সকল মানবের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার ভয়ানক অন্তরায়। ভারতসম্বন্ধে পার্থক্য সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে; তাহা যদি দূর করা যায় এবং মানবজাতির পঞ্চমাংশ এই ভারতবাসীরা যে সেই মধ্যযুগের ভাব লইয়া চলিতেছে তাহা হইতে তাহারা শ দু'শ বৎসরের মধ্যে মুক্ত হয় এবং যাঁহারা ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গে সমীকৃত হওয়ার যোগ্যতা তাহারা লাভ করে তাহা হইলেই ঐ সমস্যার সমাধান নিকটবর্ত্তী হইবে। লেখকের অন্যান্য উক্তির ন্যায় ইহাও প্রমাণ করে যে তাঁহার সভ্যতাকে তিনি সর্ব্বোপরি মনে করেন। এযাবৎ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যে নীতি অনুসারে চলিতেছে তদুপরি ভিত্তি করিলে সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিবে, এমন নিশ্চয়তা কিছু আছে কি? যে পর্য্যন্ত মানুষের অন্তরে পরম শান্তির প্রভাব অর্থাৎ ভগবদ্‌প্রেমের প্রতিষ্ঠা না হইবে, সেই পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বের বিরাম হইবে না। হয়ত বর্ত্তমানে অথবা ভবিষ্যতে পার্থক্য

দূরীকরণ দ্বারাই পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হইবে। এইক্ষণ প্রশ্ন, কোন্ পক্ষ হইতে পার্থক্য দূর আবশ্যক, এবং সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃতি কিরূপ হইবে? স্বভাবতঃ পাশ্চাত্যেরা চাহিবে যদি সমীকরণ করিতে হয় তবে প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করুক। ইহা সম্ভব কি না তাহা নির্ভর করিবে প্রাচ্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের স্ব স্ব সাধনার আপেক্ষিক গুরুত্বের, এবং তাহাদের সাধনার ধারা সংরক্ষণের আপেক্ষিক শক্তির উপর। যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয়, এক পক্ষের প্রভাব সর্ব্বোপরি প্রবল হওয়া অসম্ভব। এমন কি বিজয়ী জাতির উপরও পরাজিত জাতির প্রভাব পড়ে। কিছুই একেবারে বিনষ্ট হয় না, সকলই পরিবর্ত্তিত আকার গ্রহণ করে—সর্ব্বশেষ মঙ্গলের জন্য।

অবশেষে আমি বলিতে চাহি, বর্ত্তমানে এসিয়ায় এমন কোন জাতি নাই যাহা ইউরোপীয় বা মার্কিন কোন না কোন শক্তির অধীন নহে। চীন এবং জাপানকেও আমি বাদ দিই না। সকলেরই উপর পাশ্চাত্য সাধনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। চীন গৃহবিবাদে ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের শাসনাধীন হইতেছে। জাপানের শক্তিও পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পারস্পরিক ঈর্ষাবশতঃ কেহ কেহ জাপানকে সাহায্য করিত। ইউরোপীয় মহাসমরের পর জাপান আর তেমন সাহায্য পায় না, হয়ত তাহাকে ইউরোপ ও মার্কিণের প্রচণ্ড যুক্তশক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু শারীরিক বলই সর্ব্বস্ব নহে। বস্তুতঃ শারীরিক বল যদি সত্যের সেবায় নিয়োজিত না হয় তবে তাহার মূল্য কি? সত্যের ভাব প্রাচ্যে, বিশেষতঃ ভারতে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতের সভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইলে জগতের অপরাপর শক্তিশালী জাতিসমূহ যেন তাহা গ্রহণ করিতে পারে ভারতকে তেমন ভাবেই উদ্যোগ করিতে হইবে। সৈন্যবলে রোম গ্রীসকে জয় করিয়াছিল, কিন্তু

সাধনার হিসাবে গ্রীসই রোমকে জয় করে। ভারতেরও ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য তাহার পাশব বলে কোন শক্তিকে দূর করার উপর নির্ভর করে না। পরন্তু সেইরূপ পাশব শক্তি যে তাহার আয়ত্ত হইবে তেমন কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক বলে সে তাহার শত্রুকে বা যাহারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র তাহাদিগকে তাহার বন্ধু করিয়া লইতে পারিবে, এবং উহারা তাহারই জ্ঞানগবেষণার সাধক হইবে। এই ভাবের বিজয়ে সে স্বীয় সভ্যতার মৌলিক তত্ত্বসমূহ রক্ষা করিতে এবং তাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা আদায় করিতে সমর্থ হইবে। সে যদি তাহার স্বীয় নীতি ত্যাগ করে তবে তাহার সভ্যতাকেই বিসর্জ্জন দিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই ইহা চিন্তা করেন না। যাঁহারা কল্পিত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আশায় স্বীয় পরম্পরাগত সাধনাকে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত তাঁহারা এইভাবে বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

সাধনাসমূহের দ্বন্দ্ব

(৪)

এক জাতির সহিত অন্য জাতির যেমন দৈহিক বলাবল লইয়া সংঘর্ষ লাগে, তেমনই একের সহিত অন্যের সাধনার উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া বিরোধ ঘটে। দৈহিক বলের উপর বিজয় লাভ অপেক্ষা আত্মার উপর বিজয় লাভই গুরুতব। সামরিক এবং শাসনসংক্রান্ত আধিপত্য মানুষের দেহের উপর ক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু একের সাধনা অন্যের সাধনার উপর বিজয়ী হওয়ার অর্থ—বিজিত জাতির আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করা, বা ধ্বংস করিয়া ফেলা। ফলে পরাজিত জাতি একেবারে বিজয়ী জাতির স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ভাষার দ্বারাই ঐরূপ বিজয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যে জাতি নিজের ভাষা ত্যাগ করে, বা করিতে বাধ্য হয় সে নিজকে হারাইয়া ফেলে। ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাধনার ধারা বিশ্লেষণ করা যায়, এবং পরবর্ত্তী বংশধরেরা তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে। এমন কতকগুলি চিন্তা ও ভাবধারা আছে যাহা ভাষা বিশেষ দ্বারাই প্রকাশ করা যায়। যেমন লাটিন ভাষায় মনোবিজ্ঞান স্পষ্টরূপে বিবৃত করা যায় না, গ্রীক এবং সংস্কৃত ভাষাই তজ্জন্য বিশেষ উপযোগী। সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি বাক্য আছে যাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করা যায় না। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে জাতীয় ভাষাই তাহার আত্মার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে সমর্থ। যাহারা বৈদেশিক ভাষায় কথা কহে তাহারা বৈদেশিকের ভাবেই চিন্তা করে; যাহারা বিজাতীয়ভাবে চিন্তা করে তাহাদের লক্ষ্যও বিজাতীয় হয়, তাহারা বিজাতীয় আচারপ্রথা

অবলম্বন করে। এই জন্যই বিজয়ী জাতিরা তাহাদের বিজয়কে সম্পূর্ণ ফলবান করিবার উদ্দেশ্যে বিজিত প্রজাবর্গকে নিজের ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকে।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ড-প্রবাসী ইংরেজদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্পেন্সার লিখিয়াছিলেন :—যে সকল ইংরেজ আইরিষ ভাষায় কথা কহে তাহারা ইংরেজী ভাষার অবমাননা করে। স্বীয় ভাষা অপেক্ষা অন্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অস্বাভাবিক, অসুবিধাজনক, পরন্তু দোষাবহ। নীতি-শাস্ত্রের বিধান এই যে, বিজয়ী জাতি সর্ব্বদা পরাজিত জাতিকে ঘৃণা করিবে এবং তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া নিজের ভাষা শিক্ষা দিবে। বাক্য মনের মূর্ত্তিস্বরূপ। আইরিষ ভাষায় কথা বলিতে বলিতে তোমাদের মনও আইরিষ হইয়া যাইবে। কারণ, অন্তর ভাবে পূর্ণ হইলেই জিহ্বা তাহাকে প্রকাশ করে।"

ইদানীং জ্ঞানী ও দেশপ্রেমিক লোকেরা নিজের ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিবার পর অন্য ভাষা শিক্ষা করেন। প্রবল জার্ম্মণ জাতি পোলদেরে জার্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ওলন্দাজদের ভাষা এবং কানাডার ইংলিশ প্রদেশে ফরাসী ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ। ভারতে কাহাকেও বাধ্য করিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু সরকারী চাকরী এবং ওকালতি প্রভৃতি ব্যবসায়ে উপযুক্ত করার ব্যপদেশে স্কুল কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির মধ্য দিয়া বাধ্যতা চলিতেছে।

'অবিনাশী জাতি' (ইন্‌ডেষ্ট্রাক্টিবল্ নেশন) শিরোনাম দিয়া মিঃ হেগার্টী আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, "ইংরেজেরা প্রথমতঃ একে একে অস্ত্রবল, ষড়যন্ত্র, বাগান করার ব্যপদেশে বসতি বিস্তার, ভাষা এবং সামাজিক আচারপ্রণালী সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন

ইত্যাদির দ্বারা এবং অন্যান্য যাবতীয় সাধ্যায়ত্ত উপায়ে আইরিষদের অন্তর জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু সফলকাম হয় নাই। কারণ আইরিষেরা সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা মহোচ্চ ভাবসম্পন্ন, তাহারা বংশপরম্পরা-প্রাপ্ত ভাবধারা ও সাধনার গৌরবে স্পর্দ্ধিত।")

অবস্থানুসারে ঐরূপে বিজিত জাতির উপর বিজয়ী জাতির সাধনামূলক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা স্বাভাবিক। বিজয়ীরা বিজিতদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই। তজ্জন্য বিজয়ী জাতিকে দোষ দিয়া কোন লাভ নাই, তৎপরিবর্ত্তে আত্মরক্ষাই শ্রেয়ঃ, তাহাতে অপারগ হওয়াই প্রাণতত্ত্বানুসারে মহা পাপ। যে বস্তু রক্ষার্থ উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না তাহা রক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন কি ? যাহা রক্ষার যোগ্য তাহা সম্যক্‌রূপে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইতে পারে না। যে স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ তাহার গুরুত্ব যে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহাতে থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ধন সম্পদ্ লুণ্ঠনের বা সুন্দরী রমণীর প্রলোভনে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিত। বর্ত্তমানে রাজনীতি ধর্ম্ম ও জাতীয় স্বার্থ লইয়াই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ও ধর্ম্ম মুখ্য কারণ, জাতীয় ব্যাপার গৌণ কারণ। একের জাতিবুদ্ধি যখন অন্যের সহিত মিশিয়া যাইতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জন্মায় তখনই তাহার শক্তি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় স্বার্থরক্ষার ভাব ধর্ম্ম ও রাজনীতির সহিত যুক্ত হইলেই তাহার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। মানবগণ শ্রেণী হিসাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে একে অন্য হইতে স্বতন্ত্র; এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ; আবার এক বর্ণের মানুষেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়েও বিভক্ত। পরন্তু সকলেই এক বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতির অভিব্যক্তি। এক হইতে এই বিভিন্নতা জন্মিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে।

সময়ে সময়ে কোন কোন ভিন্ন ভাব বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতি সেই বিভিন্নতা রক্ষা করিতেই সর্ব্বদা তৎপর। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে বিভিন্নতা কিছুতেই দূরীভূত হয় না। এক জাতির প্রতি অন্য জাতির বিরোধ-বুদ্ধিই সেই ভিন্ন ভাব রক্ষা করিতেছে। যাহারা বিরোধ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বস্তুর তত্ত্ব অবগত নহে তাহারা বিরোধের ভিতর মন্দ কিছুই দেখিতে পায় না। বিরোধ স্বাভাবিক : প্রকৃতিই বিরুদ্ধভাব, অবিশ্বাস, এমন কি ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, প্রেমের দ্বারা নহে। এই জন্যই শক্তিশালী পাশ্চাত্যেরা এসিয়া কিম্বা আফ্রিকাবাসীদের সহিত মিলে না। যে যত বেশী শক্তিশালী তাহারই ভিতর বিরোধের ভাব তত বেশী। যাহার মধ্যে বিরোধের ভাব যত বেশী অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত বা অন্যের কবলে কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা তাহার তত কম। ইহা পশু-প্রকৃতির ধর্ম্ম। যে পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করা না যায় সেই পর্য্যন্ত মানুষ মানুষের শত্রুই থাকিবে। সমুচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রথমতঃ পশু-প্রকৃতিকে শান্ত করে তৎপর মানবমাত্রেই একই মহাশক্তি হইতে উদ্ভূত, এই জ্ঞান সেই পশু-প্রকৃতিকে একেবারে বিদূরিত করে।

ইদানীং প্রাচ্যরাজ্যে জাতিবিদ্বেষ তত মারাত্মক নহে। অবশ্য ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ লাগিলেই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। বিরোধের ভাব যে আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 'কন্‌ফ্লিক্ট অব্ কলার' (বর্ণসংঘর্ষ) নামক গ্রন্থের লেখকের ন্যায় আমিও মনে করি যে এসিয়াবাসীরা পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ জাতিকে শ্বেতাঙ্গ বলিয়াই ঘৃণা ও বিদ্বেষ করে না। শ্বেতাঙ্গেরা যখন এসিয়াবাসীর উপর প্রভুত্ব দেখায় এবং বলপূর্ব্বক তাহাদের দেশে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধনসম্পদ্ জ্ঞানগৌরব ও সাধনা বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহারা শ্বেতাঙ্গ-

দিগকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ করে। প্রথম প্রথম ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা এসিয়ার সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়াছে, তিব্বতেও হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতবাসীরা যখনই জানিতে পারিল যে পাশ্চাত্যেরা যে দেশে প্রবেশ করে সেই দেশই দখল করিয়া বসে, তখনই তাহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি তাহাদের মনে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ-ভাব জাগাইয়া তুলিল, তখনই তাহারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তিব্বতের প্রবেশদ্বার রোধ করিয়া দিল।

শ্বেতাঙ্গেরা যে কৃষ্ণাঙ্গদিগকে ঘৃণা করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহার কারণও আছে। শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই অভিমান লইয়াই তাহারা চলে, অপরদিকে কৃষ্ণাঙ্গেরা নিজকে শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা হীন মনে করে। বৈষয়িক ব্যাপারে ভারতীয়েরা যে দুই শত বৎসর যাবৎ শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া চলিতেছে ইহাতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রাচ্য পীতবর্ণের এক জাতি যখন সমরক্ষেত্রে প্রতীচ্য শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইল, তখন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বা তাহার সহিত বন্ধুতা স্থাপনে তাহার পীতবর্ণ শ্বেতাঙ্গদের নিকট বাধা উপস্থিত করিল না। রাজনৈতিক স্বার্থের নিকট জাতি-বিদ্বেষ তুচ্ছ। সাধনার দিক্ হইতে দেখা যায় জাতি-বিদ্বেষ অন্যের উপর প্রাধান্য স্থাপন অপেক্ষা অন্যের সহিত মিশিয়া যাইবার পথেই বেশী বাধা জন্মায়। এক প্রকারের হীনতর জাতীয় বিদ্বেষবুদ্ধি জাতীয় ঈর্ষারূপেই দেখা দেয়। প্রাচ্য দেশের অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য পাশ্চাত্যের এমন একদল নিম্নস্তরের লোক আসে তাহারা ভারতের যাহা কিছু তাহাকেই তুচ্ছ করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রুষদেশীয় একজন ভ্রমণকারী বলিয়াছিলেন—ঐরূপ যত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সহিত ভারতে ও অন্যত্র তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহারা সকলেই ভারতবর্ষ

ও তাহার যাবতীয় রীতি নীতিকে ঘৃণা করে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ধর্ম্ম ও রাজনীতির কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাহারা ঐরূপ করে কেন, বলিতে পারেন কি?' তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,— 'ভিন্ন জাতির প্রতি ঈর্ষাই ইহার মূল।'

পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিরোধই যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান কারণ হইত। যেমন খৃশ্চানদের 'ক্রুসেড', মোছলমানদের 'জেহাদ'। বর্ত্তমান যুগেও ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ ঘটে। এখনো খৃশ্চান ও অখৃশ্চানে, খৃশ্চানে খৃশ্চানে, যথা—আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টে। এদিকে ভারতের হিন্দু ও মোছলমানে। সাধনার মুখ্য উপাদান ধর্ম্ম। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অথবা রাজনৈতিক স্বার্থের দিক্ হইতে তৎসম্বন্ধে অনুধাবন করা আবশ্যক। খৃশ্চানধর্ম্ম যখন সরল ভাবাপন্ন ছিল তখন যাহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই প্রচার করা হইত, এখনও যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ তাঁহারা তাহাই করেন। কিন্তু খৃশ্চান মিশনারীরা এখনও হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। রেভারেণ্ড এ এইচ বাওম্যান "খৃশ্চানী ভাব ও হিন্দুদর্শন" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"অন্য কত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুর বিরাট দর্শনশাস্ত্র অমর অক্ষয়, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের অটল স্তম্ভ, তাহাই ভারতে খৃশ্চানধর্ম্ম প্রচারের অন্তরায়।"—বস্তুতঃ বহু শতাব্দীব্যাপী বহু উপায়ে বহু যত্নে এবং বিপুল অর্থব্যয়েও এখন যাবৎ ভারতের ৪০ লক্ষের অধিক লোককে খৃশ্চান করা সম্ভবপর হয় নাই, এখনও ৩১ কোটী ১০ লক্ষ ভারতবাসী পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনই আছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ইদানীং ভারতের অনেকেই খৃশ্চানী প্রভাবে আত্মহারা। যীশুখৃষ্টের সুউচ্চ ব্যক্তিত্বে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শে ভারতের অনেকেই মুগ্ধ বটে, কিন্তু খৃশ্চানীর সহিত পাশ্চাত্য প্রভাব এতই জড়িত যে একটা হইতে অন্যটাকে পৃথক্ করিয়া দেখা দুঃসাধ্য।

যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে দেশদেশান্তরে গিয়া রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মপ্রচার করিতে বলেন নাই। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথে চলিলেই কল্যাণলাভ করা যায়। রাজনীতির ও ব্যবসায়ের যুগেই ধর্ম্মকে অর্থোপার্জ্জন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিয়োগ করা হইতেছে। ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই তাহারাও ঐরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়া বাহির হয়। এতদপেক্ষা ধর্ম্মের গ্লানিকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? বর্ত্তমান খৃশ্চান সম্প্রদায় যে ধর্ম্মের প্রচার করেন তাহা ঠিক যীশুখৃষ্টের অপার্থিব যোগতত্ত্বের অনুরূপ নহে। যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে পাশ্চাত্য দেশে যে সমস্ত ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান সামাজিক বুদ্ধি-বিচক্ষণতার সামঞ্জস্য রাখিয়াই বর্ত্তমান খৃশ্চানী মত চলিতেছে। যীশুখৃষ্ট যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাই যথার্থ খৃশ্চান-ধর্ম্ম। বর্ত্তমান 'খৃশ্চানী' হইতেছে অন্যেরা যাহা যীশুর উপদেশ মনে করেন তাহা। ঐ সমস্ত লোকের চিন্তাশক্তির মূল্য যতটুকু ইহার মূল্যও ততটুকুই বটে। কতিপয় খৃশ্চান যীশুমতের অকাট্য ব্যাখ্যার ক্ষমতা পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের সেই দাবী অপর খৃশ্চানেরা গ্রাহ্য করেন না। যীশুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন সত্যসমূহ বিশুদ্ধভাবে প্রচার করিলে ভারতীয়েরা তাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে। কারণ, যীশু যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার বহু পূর্ব্বে ভারতের মহর্ষিরাও তাহাই বলিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের স্বীয় মাহাত্ম্য বলেই খৃশ্চানধর্ম্মের এত গৌরব। ভারতীয়েরা যখন যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে, যখন তাহারা নিজের ভাবানুসারে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে, তখন তাহারা খৃশ্চানধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিবে না। জনৈক আইরিষ শ্লেষলেখক যেমন বলিয়াছিলেন,—'ইহা মজার ধর্ম্ম', 'যীশুখৃষ্ট খাসা খেলোয়াড়', 'পাদ্রীরা ভাল খেলার সাথী', 'পাদ্রীদের অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায়ের নাম পৌরোহিত্য' ইত্যাদি; তেমন

বিদ্রূপাত্মক উক্তি ভারতীয়েরা খৃশ্চানধর্ম্মের বিরুদ্ধে কখনো করিবে না। যাহারা যীশুখৃষ্টের উপদেশের মর্ম্ম যথাযথ অবগত নহে তাহাদের কাছে ভারতবাসীরা কখনো তাহা জানিতে চাহিবে না। গৃহে থাকিয়াই হউক, বা গৃহত্যাগ করিয়াই হউক, যিনি প্রকৃত খৃশ্চান সন্ন্যাসী তাঁহাকেই ভারতীয়েরা শ্রদ্ধা করিবে। পুরাকালে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রচারার্থ ভাড়াটীয়া লোক নিযুক্ত হইত না। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন তাঁহারা ভগবদানন্দে ও কর্ত্তব্যবোধেই করিতেন। হিন্দুরা কাহারো উপর নিজের ধর্ম্মমত জোর করিয়া চাপাইয়া দেন না, কাহারো দুঃখদুর্দ্দশা দূরীকরণের বা কাহাকেও উচ্চরাজপদদানের প্রলোভন দিয়াও নিজের মত গ্রহণ করিতে বলেন না। যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমতসমূহকে যদি পাশ্চাত্য পোষাকে আবৃত্ত করা না হইত তবে ভারতীয়েরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। আর একটা অন্তরায়,—মিশনারীরা যাহাকে খৃশ্চান করেন তাহাকে জাতিচ্যুত করিয়া ফেলেন। যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের সন্তানকে খৃশ্চান করিতে পারেন তাহার উপাধি হইয়া যায় মুগিন্স, অথবা অন্য কিছু। ধুতিচাদরের পরিবর্ত্তে সে শার্ট ও পেণ্টালুন পরে, গো-মাংস খাইতে আরম্ভ করে। ফলতঃ তাহার হিন্দু-সমাজে ফিরিয়া যাওয়ার পথে ঐ সমস্ত বিষম অন্তরায় হয়। দক্ষিণ ভারতে ও চীনদেশে বহুকাল পূর্ব্বে যেসকল খৃশ্চান মিশনারী ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিতেন তাঁহারা কাহারো জাতি নষ্ট করিতেন না। এমন কি দক্ষিণ-ভারতে কোন কোন ব্রাহ্মণ খৃশ্চানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও উপবীতী ছিলেন। শূদ্রদের মধ্যে যাহারা খৃশ্চানধর্ম্ম গ্রহণ করিত তাহাদেরও জাতীয় আচার ব্যবহারে যেন কোনরূপ অপবিত্রতা প্রবেশ না করে তাহারা তেমনভাবেই চলিত। যজুর্ব্বেদের অনুবাদকে ইউরোপে 'যীশুস্ বেদ' নামে প্রচার করা হইয়াছিল। ভল্টেয়ার তদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে খৃশ্চানধর্ম্মই সমস্ত

জ্ঞানের ভাণ্ডার নহে, অনেক কিছু ভারতবর্ষ হইতে ধার করা। অতঃপর প্রোটেষ্টান খৃশ্চানেরা একেবারে বিপরীত ধারা অবলম্বন করেন। সম্প্রতি তাঁহাদের সুরও কিছু নরম হইয়াছে।

খৃশ্চানধর্ম্মকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ব্যবহার করা হয় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। জনৈক ফরাসী মিনিষ্টার বলিয়াছেন—'ক্ল্যারিকেলিজম্' নামক ধর্ম্মের বিরোধী ভাব বিদেশে রপ্তানী করিবার জিনিষ নহে। ফ্রান্স হইতে যে ধর্ম্মের বহিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে তাহাই ফ্রান্সের উপনিবেশসমূহে ফরাসী জাতির স্বার্থরক্ষা করিতেছে। অন্যান্য দেশের লোকেরা ইচ্ছা করুক বা নাইই করুক প্রথমতঃ তাহাদের সম্মুখে ক্রুশ খাড়া করা হয়, ক্রমে তাহা পতাকায়, তাহার পর ব্যবসায়ে পরিণত হয়। এসব ব্যাপারে কেহ কোন এসিয়াবাসীর বা আফ্রিকাবাসীর পরামর্শ লয় কি ? ইউরোপে ইদানীং খৃশ্চানধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা হ্রাস পাইতেছে বটে, কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ তাহাই ইউরোপের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে দৃঢ়তর করিতেছিল। এশিয়াবাসীদিগকে খৃশ্চান করিয়া ইউ-রোপীয়দের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধভাব হ্রাস করিবার এবং ইউরোপীয় সাধনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অনেক চেষ্টা হইতেছে। 'কন্‌ফ্লিক্ট অব্ কলার' গ্রন্থের লেখকও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'অনেকেরই বিশ্বাস ইউরোপের দিকে এসিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বাধাদান অসম্ভব। এতদবস্থায় অতীতের ন্যায় এখনও খৃশ্চানধর্ম্মই ইউরোপ এবং শেতাঙ্গদের একমাত্র ভরসা। এই জন্যই এংলো-স্যাক্সন জাতিরা কৃষ্ণাঙ্গদিগকে খৃশ্চান করিবার জন্য প্রবলতর চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। বলা হয় যে নিগ্রো জাতীয় মোছলমানেরা দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রামপরায়ণ; তাহাদিগকে খৃশ্চান করিতে পারিলে শ্বেতাঙ্গদের জাতি-সম্বন্ধীয় এবং রাষ্ট্রনীতিক্ ভীতি হ্রাস হইবে, এবং ভবিষ্যতে আরো বহু স্বার্থ

সিদ্ধি হইবে। গ্রন্থকার ইহাও বলিতে লজ্জাবোধ করেন নাই যে আফ্রিকায় রাজনৈতিক খৃশ্চানধর্ম্ম প্রচার করা হইয়াছে, এবং তথায় খৃশ্চানেরা মায়াবিনী দেলিলার অঙ্কই অভিনয় করিতেছে, অর্থাৎ দেলিলা যেমন সেম্‌সনের চুলগুলি কাটিয়া তাহাকে নিবীর্য্য করিয়াছিল তেমনই আফ্রিকা-বাসীদের ভিতর যে বীরত্ব আছে তাহাদিগকে খৃশ্চান করিয়া তাহা অপসারিত করা হইতেছে।"—তিনি আরও বলেন,—খৃশ্চানধর্ম্ম প্রচারের ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি এসিয়ার অন্যান্য স্থানের লোকদের এবং আফ্রিকার নিগ্রোদের বিরোধিতা হ্রাস হইলেও ভারতে সেরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ বহু যুগযুগান্তের কঠোর সাধনার উপর ভারতের সমাজসৌধ প্রতিষ্ঠিত। ভারতবাসী বুঝিতে পারে যে খৃশ্চানী ভাব প্রবেশ করিলে তাহার সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে "আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতীয়েরা খৃশ্চান হওয়ার পর যে শুধু জাতিচ্যুত হইয়াছে এমন নহে, নৈতিক হিসাবেও তাহারা উপকৃত হয় নাই। স্বজাতির আবহাওয়া ত্যাগ করিয়া তাহারা অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় প্রবেশ করায় তাহাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে।" আরো অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

মিঃ আর্চ্চার খৃশ্চান নহেন। তিনি যুক্তিবাদমূলক স্বাধীনতার উপাসক। তাঁহার মতে খৃশ্চানধর্ম্ম মধ্যপথের পান্থনিবাসমাত্র। তিনি বলেন 'ভারতবাসীকে সেই স্তরে (মধ্যপথের পান্থনিবাসে) নেওয়ার জন্যই তাহাদেরে খৃশ্চান করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা তাহারা অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে, ঐটুকু পার হইলেই স্বাধীন সভ্যতার সুন্দর আলোকময় পথ দেখিতে পাইবে। কারণ তাঁহার 'যুক্তিবাদের' ছাপ না পাইলে কেহই যে সভ্য হইবার উপায় নাই! তিনি বলেন, ভারতবর্ষ ধর্ম্মহীন দেশ, ভারতবাসী যাহাকে ধর্ম্ম বলে তাহা ত্যাগ করিলেই তাহার মঙ্গল। ভারতের ধর্ম্ম ত্যাগ

করিয়া খৃশ্চানধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই তাহারা প্রকৃত সভ্যতার অর্দ্ধপথে পঁহুছিবে। খৃশ্চানধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস নাই, তথাপি ভারতবাসীর জন্য তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কেন না, তাহা না হইলে তাহারা স্বাধীনতা লাভের পথে যাইতে পারিবে না। খৃশ্চান হওয়ার পর তাহাদের আরো অগ্রসর হইতে হইবে, তখনই তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হইবে। ইহাই মিঃ আর্চ্চারের গ্রন্থের ভিত্তিভূমি। প্রকৃত ধার্ম্মিক মিশনারী খৃশ্চান-ধর্ম্ম প্রচার করেন ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য। কারণ তাহাই তিনি বিশ্বাস করেন। মিঃ আর্চ্চার ভারতবাসীকে খৃশ্চান করিতে চাহেন তাহাদিগকে স্বাধীনতার অর্দ্ধপথ দেখাইবার জন্য।

জাপানেও এই ভাবের লোক দেখা দিতেছেন। কোন জাপানী লেখক জাপানবাসীকে পরামর্শ দিয়াছেন যে খৃশ্চানেরা যেমন খৃশ্চানধর্ম্ম প্রচার দ্বারা রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করিয়াছে, জাপানীরাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার দ্বারা জাপানীদের রাজ্য বিস্তারের উপায় করুক। বুদ্ধদেবও অতঃপর রাজনৈতিক প্রচারকে পরিণত হইবেন!

সকলের মনোভাব এইরূপ নহে। মিঃ প্রাইস্ কলিয়ার বলেন, সমস্ত মিশনারীর দলকে তাঁহাদের বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠানই অধিকতর মঙ্গলজনক; কারণ তাঁহারা এদেশবাসীর প্রতি যে মমতা প্রদর্শন করেন তাহা একেবারে হাস্যস্কর হইয়া উঠে। এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা শুধু রাজনীতির কথাই ভাবেন। ঐরূপ লোকেরা খৃশ্চানধর্ম্ম সত্যমূলক কি না এবং তদ্দ্বারা ভারতবাসীর মঙ্গল হইবে কি না, সে কথা চিন্তা করেন না। খৃশ্চানধর্ম্ম প্রচার দ্বারা তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ও জাতির স্বার্থসিদ্ধি কতদূর হইবে শুধু তাহাই ভাবেন। পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁহাদের ধর্ম্মকে যে কিরূপ ব্যবসায়ের দ্রব্যজাতে পরিণত করিয়াছেন তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের বিজ্ঞাপনগুলি দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

রাজনীতির সহিত জাতীয় স্বার্থ সম্মিলিত হইয়া যে তীব্র সংঘর্ষ উপস্থিত করে তাহার তুলনায় ইদানীং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম্মবিরোধের মাত্রা অনেক কম। প্রথমতঃ উচ্চ স্তরের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা কখনো দেখা যায় না। এমন কি উচ্চাঙ্গের হিন্দুত্বে অসীম সহিষ্ণুতা দেখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহাকে 'সত্যের প্রতি উদাসীনতা' বলিয়াছেন, আবার কেহ তাহাকে অসহিষ্ণু গোঁয়াড় বলিতেছেন। দুই দিকেই তাহার দোষ। সে যাহা হউক, বেদান্তের প্রভাব ভারতের সর্ব্ব নিম্নস্তরে পর্য্যন্ত এমনভাবে বিস্তৃত হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা থাকিলেও তাহারা অনেকটা সংযত। ভারতীয় সহিষ্ণুতা ব্যক্তিগত স্বভাবের বিষয় নহে। জ্ঞান ও চরিত্রবলের তারতম্য ও অধিকারবাদের উপরই ইহার ভিত্তি। ভারতের অধিকারবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, সকল মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস একই রকম নহে. সকলেই একই রকমের সাধনার উপযুক্ত নহে, যাহার যেমন বুদ্ধি নৈতিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তি সে তেমন ভাবেই সাধনার বিষয় গ্রহণ করিবে। সম্ভবতঃ এই কারণে ভারতবাসীকে যেসমস্ত পাশ্চাত্যবাসী 'ধর্ম্মহীন মোহান্ধ' বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও এখন বেশ উদারতা দেখা যাইতেছে। বহুসংখ্যক লোক এইক্ষণ আর প্রকৃত খৃশ্চান নহেন, নামে মাত্র। পরের উপর আধিপত্য বিস্তারের সময়েই তাঁহারা খৃশ্চান সাজেন। বস্তুতঃ এইক্ষণ তথাকথিত উদারতাই বিস্তারলাভ করিতেছে। অনেকে মনে করেন যে ধর্ম্ম জিনিষটা ব্যক্তিগত, বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্বাধীন হওয়াই পুণ্য কর্ম্ম। যে সভ্য দেশে যে ধর্ম্ম বিকাশ লাভ করিয়াছে উহা সেই দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলকর। যদি কোথাও কোন মহৎ তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে তাহা এক ব্যক্তিতে ও এক ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে আবদ্ধ

নাই। । ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব হইতেছে মানবসমাজকে উন্নীত করা, তাহা লইয়া পরস্পরে শত্রুতা বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। জাতীয় বিরোধ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিরোধ যখন রাজনৈতিক সংঘর্ষের সহিত যুক্ত হয় তখনই ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। আয়র্লণ্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া বিবাদ চরমে উঠিবার মূল কারণ হোমরুল, ভারতে হিন্দু ও মোছলমানদের মধ্যে বিরোধের মূল স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা ও সরকারের কৃপালাভের প্রলোভন। ইদানীং রাজনীতিই প্রধান, ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত তাহার সেবায় নিয়োজিত করা হইতেছে।

এস্থলে রাজনৈতিক ব্যাপারের আলোচনা করা আমার ইচ্ছা নহে; উহার কতকগুলি সাধারণ নীতি আলোচ্য বিষয়ের সহিত কিরূপ সংশ্লিষ্ট তন্নিরূপণেরই চেষ্টা করিব। এক জাতির উপর অন্য জাতি আধিপত্য স্থাপন করিলে প্রথমোক্ত জাতির উপর জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক শেষোক্ত জাতির প্রভাব পড়িবেই। যেমন কোন ক্ষমতাশালী লোক ইচ্ছা করুন আর নাইই করুন তাঁহার পারিপার্শ্বিক লোকদের উপর তাঁহার প্রভাব পড়ে, তেমনই বিজয়ী জাতির প্রভাব তাহার অধীন জাতির উপর পড়ে। সেই প্রভাব কোথাও স্বয়মুদ্ভূত, কোথাও বিজয়ী জাতির পূর্ব্বসঙ্কল্পিত। যে কোন অবস্থাতেই হোক্ পরাজিত জাতির সভ্যতা বিজয়ীদের সভ্যতার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। পরাজিত জাতি যদি অসভ্য হয় তবে তাহাকে সভ্য করিয়া তোলা তাহার পক্ষেও মঙ্গলজনক এবং শাসকদের পক্ষেও লাভজনক। মেকলে বলিয়াছিলেন—অসভ্য জাতির উপর আধিপত্য করা অপেক্ষা সুসভ্য জাতির সহিত ব্যবসা করাও অধিকতর লাভজনক। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল যে ভারতের কোটী কোটী লোককে ব্রিটনের খরিদ্দার করিতে হইবে, যে শাসননীতির ফলে তেমন হইবে না তাহা নির্বুদ্ধিতার

পরিচায়ক বলিতে হইবে। মিঃ উইলিয়ম আর্চ্চার চাহেন ভারতের লোকেরা যাহাতে অভাবের পরিমাণ বেশী বেশী বাড়াইতে থাকে তাহাদিগকে তেমন শিক্ষাই দিতে হইবে। এই বালকোচিত উক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভাব ত লেশমাত্রই নাই, পরন্তু যে ভারতবাসীর প্রতি তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন তাহারাই ইহাকে উপেক্ষা করিবে; কারণ ইহাকে তাহারা সমীচীন ও সন্তোষজনক মনে করিবে না। বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

ভোগের মাত্রা বৃদ্ধির দ্বারা কখনো কামনা প্রশমিত হয় না, আগুনে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা আরো জ্বলিয়া উঠে, তেমন যতই ভোগ বাড়াইবে ততই কামনাও বাড়িবে। বস্তুতঃ অভাববৃদ্ধির নীতি ব্যবসায়ীদের ছাড়া অন্য কাহারো মঙ্গল করিতে পারে না। ভোগবিলাসের মাত্রা বাড়াইবার বুদ্ধি গ্রহণ করিলে, ইংলিশ মটোরকার, স্কচ্ হুইস্কি এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিলাসদ্রব্যই লোকেরা বেশী পরিমাণে ক্রয় করিবে। অসভ্য জাতিসমূহকে যাহারা এই ভাবের সভ্যতা শিক্ষা দেয় তাহাদিগেরই ভাণ্ডার ধনপূর্ণ হয়। আফ্রিকার নদীতীরবাসী উলঙ্গ জাতিদিগকে সভ্যতার নামে তাহাদের অভাববৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দিয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা তাহাদিগকে কতকগুলি রঙিন্ কাচের টুক্‌রা দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের বহুমূল্য হাতীর দাঁতগুলি লইয়া আসে। এই প্রকৃতির লোকেরা যখন বলে যে ভারতের লোকেরা শোচনীয় দরিদ্রতাকে ভালবাসে এবং তাহা লইয়াই থাকিতে চাহে তখন তাহা নিতান্ত বিসদৃশ ও অশ্রদ্ধেয় মনে হয়।

যে সকল অসভ্য জাতির কোনরূপ সাধনা নাই তাহারা বিজয়ী প্রভুদের সাধনা-প্রণালীই গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত সুসভ্য দেশের লোকদের সেই সমস্যা তেমন সোজা নহে। ভারতে দুই পথ মুক্ত

আছে ঃ—ভারতবাসীকে তাহাদের নিজের ভাবানুসারে চলিতে এবং শাসকদের সংশ্রবে স্বভাবতঃ যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইতে দেওয়া ; দ্বিতীয় পথ হইতেছে শাসকদের আদর্শানুযায়ী শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করা। ভারতে দুই উপায়ই অবলম্বিত হইয়াছে। রাজনৈতিক হিসাবে দুইটিতেই সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। বিজিত প্রজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে দিলে ওলন্দাজ রাজ্যে যেমন সর্ব্বদা শাসক ও শাসিতদের মধ্যে বিরোধ ঘটে এখানেও তেমনই ঘটিবে। পক্ষান্তরে শাসকেরা যদি নিজের জ্ঞানগবেষণায় শাসিতদিগকে প্রস্তুত করেন তবে তাহারা শাসকদের সহিত সমান অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইবে এবং প্রজারা যখন চাহিবে শাসকেরা তখনই তাহাদিগকে তেমন অধিকার দিতে প্রস্তুত না হইতেও পারেন। ঐরূপ অধিকার দানের পূর্ব্বে শাসিতদের সাধনার ধারাকে যদি শাসকদের আদর্শানুযায়ী করিয়া নেওয়া যায় তবে শাসনকার্য্যের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। এই নীতি অনুসারে চলিলে শাসিতদের সকল বিষয়ে ন্যূনতা বিদূরিত হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। যখন দূর হয় তখন শাসক ও শাসিতেরা হয়ত সম্মিলিতভাবে শাসনকার্য্য পরিচালন করিবেন, অথবা শাসিতদের হস্তে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করত বৈদেশিক শাসকেরা চলিয়া যাইবেন। এই দুইটী সম্ভাব্য পরিণামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতের বর্ত্তমান শাসননীতি পরিচালিত হইতেছে।

মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়া গিয়াছেন,—"ভারত হইতে আমাদের সরিয়া যাইতেই হইবে। সভ্য জাতি হইতে নির্ব্বিরোধে সরিয়া গেলেও আমাদের পক্ষে লাভ, অসভ্য জাতির সহিত মারামারি কাটাকাটি করিয়া কোন লাভ নাই।" সার টি ই কোল্‌ব্রুক লিখিয়াছেন,—"ভারতবাসীকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের

অধিকার দিলেও উহা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হয়।” ইহার সহিত তিনি আরো একটা কথা যোগ করিয়াছেন,—“যদ্দ্বারা তাহাদেরও মঙ্গল হইবে জগতেরও মঙ্গল হইবে।” প্রথম লক্ষ্যটা স্থির রাখিয়া চলিলে শেষোক্ত কথার কোন মূল্যই থাকে না। কারণ, প্রথমোক্ত নীতি অনুসারে চলিলে প্রজার স্বার্থ যখনই শাসকদের বিরুদ্ধ হইবে তখনই শাসকেরা তাহাকে তাঁহাদের স্বার্থসেবার অনুকূলে পরিচালিত করিবেন। এইরূপে শাসিতদের সাধনার ধারাকে শাসকেরা যখন নিজেদের ধারায় পরিণত করিতে পারেন তখনই তাঁহাদের অস্ত্রবলে আয়ত্ত বিজয় সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে। বিদেশী বিজয়ী জাতির শাসন যতদিন ঐভাবে চলিতে থাকে দেশবাসীর ঐরূপ পদানত অবস্থা তাহার প্রচুর আনুকূল্য করে, তৎপর সেই বৈদেশিক শাসন শেষ হইলেও দেশবাসীরা নানারূপে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে থাকে। এক জাতির সাধনা যদি অন্য জাতির সাধনাকে পরাস্ত করে তবে প্রথমোক্ত জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্য না থাকিলেও তাহার স্বার্থের বিঘ্ন ঘটে না।

ভারতের দিক্ হইতে দেখিলে বলিতে হইবে, বিদেশী শাসকদের সভ্যতা অবলম্বন করিয়া যদি ভারতবাসী হোমরুল লাভ করে তবে তাহার স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভারতীয় ভাবধারামণ্ডিত গৃহ (হোম) আর থাকিবে না। তখন যাহারা ভারতকে শাসন করিবে, তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকদের ওরফে হইবে, অর্থাৎ মেকলের ভাবানুযায়ী তাহারা বর্ণব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে ইংরেজ হইয়া যাইবে। এক জাতির সাধনা অন্য জাতির সাধনাকে গ্রাস করিলে তাহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়ায় মেকলের সেই উক্তিতেই তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখনই ভারতের কতকগুলি লোক তেমন সাজিয়াছে। জাতি-বুদ্ধি যাঁহাদের আছে তাঁহারা উহাদিগকে ‘কালা ফিরিঙ্গিই’ বলিয়া থাকেন। ভারতীয় সভ্যতার যদি কোন মূল্য

থাকে এবং তাহার উত্তরাধিকারীরা যদি তাহাকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, এই যে বৈদেশিক সাধনা তাঁহাদের সাধনাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাতে বাধা দেওয়া। আত্মস্থ থাকার অধিকার ও রাজভক্তি স্বতন্ত্র বস্তু, একের সহিত অন্যকে জড়াইয়া কেহ যেন ভ্রম না করেন। সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইয়া থাকিতে গেলে হয়ত ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাহার প্রভাব পড়িতে পারে, এবং আমি মনে করি তেমন প্রভাব অবশ্যই পড়িবে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইদানীং সংস্কৃত চর্চ্চার কিঞ্চিৎ উৎসাহ দিতেছেন দেখিয়া দেশীয় কেহ কেহ তৎপ্রতি গভীর সন্দেহের আরোপ করিয়া বলিতেছেন,—ভারতকে মূর্খ করিয়া চিরদাসত্বে আবদ্ধ রাখিবার অভিপ্রায়েই এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এমনই তাহাদের স্বীয় সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা! তেমনই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পড়িয়া একজন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন,—ইহার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে ভারতবাসী চিরকাল কুলি মজুরই থাকিবে। ভারতীয় সাধনার মাহাত্ম্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছি সেই সমস্ত পড়িয়া কেহ বলিয়াছিলেন,—"আমি ভারতবাসীকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমাকে উপাধিভূষিত করা উচিত।" অপরদিকে কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ঐ স্কুলগৃহের কতকগুলি সাধারণ বিলাতী ছবি বিক্রয় করত তাহার মূল্যের দ্বারা ভারতীয় মনোরম কারুকার্য্যময় তাম্র ও কাংস্য নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন বাঙ্গালী সংবাদপত্রে লিখা হইয়াছিল যে, ইংরেজদের আগমনের পূর্ব্বে এদেশের যে অবস্থা ছিল ইহাকে সেই অবস্থায় নিক্ষেপ করার জন্যই এই সব করা হইতেছে। এইরূপ উক্তি যাহারা করে তাহাদের বিশ্বাস,—'যাহারা শুধু ভারতীয় সাধনার চর্চ্চা

করে তাহারা ঘোর তমসাচ্ছন্ন, ইংরেজী সাধনাই ভারতীয়দের পক্ষে একমাত্র আলো, কেবল পাষণ্ডেরাই সেই আলো হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধকারে নিমগ্ন রাখিতে চায়, কেন না, ভারতবাসী যে পূর্ব্বে মূর্খই ছিল! ইংরেজদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতীয়দের কিছু দর্শনশাস্ত্র ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা থাকিতে পারে, কিন্তু ও'গুলি যে সেই মান্ধাতার আমলের; ভারতীয়েরা এইক্ষণ সেই যুগ ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।'—কোন্ সম্মোহন মন্ত্রের প্রভাবে কতিপয় ভারতবাসীর এইরূপ মানসিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব।

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতের সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝিতে ভুল করিলেও ভারত তাঁহাদের নিকট উপকৃত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আছেন; যে সমস্ত প্রথা মানবতার বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যতীত অন্য বহু প্রথার উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইংরেজী ভাষা শাসকদের ভাষা বলিয়া তাহা আয়ত্ত করা ভারতবাসীর কার্য্যতঃ প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও অবস্থাগতিকে বাধ্য হইয়া তাহা শিখিতে হয়। কারণ, কুলিমজুরের চাকরীতে যাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না তাহারা অবশ্যই ইংরেজী শিখিবে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী-ভাব অতিমাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে, ভারতীয়-সাহিত্য-চর্চ্চার দ্বারা এযাবৎ তৎপ্রতি বাধা জন্মাইবারও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এজন্য গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, দেশের লোক তেমন প্রার্থনা করিয়া ত প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরা এখনও নিজস্ব বস্তুর গুরুত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। যদি করিতেন তবে ভারতীয় সাধনার বিষয় তাঁহাদের চোখের কাছে

নিয়া বলিতে হইত না,—"চেয়ে দেখ, ইহা তোমার নিজস্ব বস্তু, ইহা মূল্যবান, ইহাকে শ্রদ্ধা কর।" এক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য দেশীয় কোন পণ্ডিত নিয়োগের বিরুদ্ধে দেশীয় শিক্ষিত লোকেরাই আপত্তি করিয়াছিলেন ; কারণ, তিনি "কেবলমাত্র পণ্ডিত" (mere Pandit) অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন। এমনই ইঁহাদের জ্ঞান যে ইঁহারা মনে করেন, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতে এবং বুঝিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষা থাকা চাই। এখনও এদেশে এমন সব দার্শনিক অধ্যাপকেরা আছেন যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু সাংখ্য ন্যায় বা বেদান্ত সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাঁহাদের নাই, থাকিলেও অতি সামান্য। এমন লোকও আছে যাহাদিগকে ইংরেজী ভাল বলিতে পারে না বলিলে দুঃখিত হয়, কিন্তু নিজের ভাষা যে ভালরূপে জানে না তজ্জন্য তাহাদের তেমন দুঃখ বা লজ্জাবোধ নাই। শিল্পকলাসম্বন্ধেও ইউরোপীয়েরা দেখাইয়া দেওয়ার ফলেই ভারতীয়েরা ইদানীং সেই দিকে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ করায়ত্ত এবং ইংরেজী নীতি অনুসারেই পরিচালিত। গবর্ণমেণ্ট যে ভারতীয় জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি বিধানের জন্য মনোযোগ দেন নাই তজ্জন্য ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরাই মূলত দায়ী। কারণ, তাঁহারা উহা চাহেন নাই। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বৈদেশিক শাসকেরা বুঝিবেনই বা কি, শিক্ষাও বা দিবেন কি ? যাহার প্রার্থী নাই তাহা দিবেন কেন ? তাঁহারা যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন তাঁহাদের নিজের সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই শিক্ষা দিবেন, এবং তদ্দ্বারা যখন তাঁহাদেরও বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি হয় তখন আর কথা কি ? পরন্তু ভারতীয়েরা যাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, ইংরেজেরা স্বভাবতঃই মনে করেন যে তাহা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও নাই। ভারতীয়েরা যদি

তাঁহাদের নিজের জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্য বুঝেন তবে তজ্জন্য অধিক পরিমাণে না হউক, অন্ততঃ ইংরেজী শিক্ষা বিধানে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয় সেই পরিমাণও দাবী করিতে পারেন।

ইহাও দেখিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলেও প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়ী সভ্য জাতির বিদ্যমানতাই ভারতবাসীর প্রত্যেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। জাতিভেদ ও যৌথ-পরিবার প্রথা অনেক শিথিল হইয়াছে, আর কতদিন এই সমস্ত টিকিয়া থাকিবে, বা টিকিবে কি না ভবিষ্যৎই তাহার সাক্ষ্য দিবে। প্রাচীন পল্লীজীবন ত একরূপ নাই বলিলেই হয়। নগরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলে বিজাতীয় হাবভাব ধরিতেছে। সমাজবদ্ধ হইয়া থাকার প্রাচীন ভাবও চলিয়া যাইতেছে, সকলেই স্বতন্ত্র ও স্ব স্ব ভাবানুসারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হয়ত কতকগুলি পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়াছে; অবশ্য 'অনিবার্য্য' কথাটা আমি বলিতে চাহি না। এই পরিবর্ত্তনের প্রবাহে পদস্খলিত হইয়া ভারতীয়দের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত না হয় তেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশেও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ১৮৬৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া চিন্তাশীল ফরাসী লেখক এম লে প্ল্যা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে ইউরোপে পারিবারিক ও কৃষিবিষয়ক পুরাতন রীতিনীতি ক্রমেই বিনষ্ট হইতেছে। ইদানীং বিনাশের মাত্রাই অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খৃশ্চান লেখকেরা মনে মনে আনন্দানুভব করেন যে খৃশ্চানী প্রভাবে হিন্দুত্ব বিনষ্ট হইতেছে। তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন কি না জানি না, নব্যতান্ত্রিকদের প্রভাবে খৃশ্চানধর্ম্মেরও ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে।

ভারতবাসীর ধর্ম্মসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের তথাকথিত নিরপেক্ষতাই তাহার গুরুতর অনিষ্টসাধনের কারণ। ফরাসী দেশের গবর্ণমেণ্টকে

বহুদিন পূর্ব্বে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা বলিয়াছিলেন,—'যেখানে ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করা হয় সেখানে নিরপেক্ষতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।'—সকল ধর্ম্মকে সম্মান ও সমানভাবে আনুকূল্য করিলেই প্রকৃত নিরপেক্ষতা হয়। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ পিতামাতার কাছেই ধর্ম্ম শিক্ষা করে। বর্ত্তমান স্কুলকলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করার ফলে যুবকদের মন তাহাদের অধ্যাপকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকে, আবার সুলভে শিক্ষা লাভ হয় বলিয়া ভারতীয়েরা তাহাদের সন্তানদিগকে মিশনারী স্কুলে অথবা খৃশ্চানদের পরিচালিত স্কুলে পাঠায়। তথা হইতে ফিরিয়া তাহারা স্বীয় পিতামাতাকে মূর্খ ও অন্ধবিশ্বাসী মনে করিতে ও অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ভারতবাসী স্বধর্ম্ম হারাইতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে এমন কিছুই পাইতেছে না যদ্দ্বারা আত্ম-জীবনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি স্থির করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়েরা খৃশ্চানও নহে, স্বজাতীয় ধর্ম্মজ্ঞানও ইহাদের নাই, ধর্ম্মানুষ্ঠানের রীতি নীতিও জানে না। এতৎসম্বন্ধে ইদানীং কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু সম্যক্ পরিবর্ত্তনের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। সাধুরা যে ভারতীয় শাস্ত্রভাণ্ডারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন তদ্দ্বারা উপকারের আশা করা যায়। ইহার ফলে পরবর্ত্তী যুগে বেদান্ত ও আগম শাস্ত্রের তত্ত্বানুসারে লোকেরা কার্য্যারম্ভ করিবে এরূপ আশাও করা যাইতে পারে। অথবা খৃশ্চান ধর্ম্মের ভারতীয় সংস্করণও হইতে পারে। * কারণ

---

* সার জনের এই আশঙ্কাই যেন সত্য হইতে চলিয়াছে। ইদানীং ঘরে ঘরে গীতা দেখা যায়, তথাকথিত শিক্ষিতেরা কথায় কথায় গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করেন, কিন্তু গীতার উপদেশ আত্মজীবনে সফল করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। পরন্তু সাধুর পোষাক-ধারীরা গীতা ও বেদান্তের ব্যাখ্যা দ্বারা খৃশ্চানীই ত চালাইতেছেন। (অনুবাদক।)

গীতাদি শাস্ত্রপ্রচার দ্বারা এযাবৎ এমন কোন প্রভাবের সৃষ্টি হয় নাই যদ্দ্বারা সর্ব্বত্র ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের সুবিধা হইতে পারে। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হওয়াও দুষ্কর। পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ফল দাঁড়াইয়াছে প্রাচীন ভারতের বিশুদ্ধ জীবনযাত্রার রীতিনীতির প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শন। ভারতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিলে,—ভারতের নিজস্ব বিসর্জ্জন দিলে যে ভারতের কল্যাণ হইবে ইহা আমি কখনো মনে স্থান দিতে পারি না। এই বিষম অনর্থের জন্য শুধু ব্রিটিশ শাসননীতি দায়ী নহে, খৃশ্চান মিশনারীরা এবং যেসকল ইউরোপীয় লেখক মনে করেন যে পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রচলন দ্বারা এদেশের মঙ্গল হইবে তাঁহারা এবং পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয় এদেশীয় লেখকেরাই এজন্য বিশেষ দায়ী। সরকারী ও বে-সরকারী এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহত না হইলে ইংরেজী সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

এই বিষয়ে ইংরেজেরা তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে চলিতেছেন; ভারতবাসীরও কর্ত্তব্য তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে চলা। ভারতবাসীরা যদি তাঁহাদের নিজের সভ্যতাকে নগণ্য বলিয়া আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিতে না চাহেন, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে রক্ষা করিবেন। তাহা পাশ্চাত্য শাসকদের সুবিধাজনক বা তাঁহাদের মনোমত হইল কি না, তাহা দেখিবার কোন প্রয়োজন ভারতবাসীর নাই। শাসকেরাই সে চিন্তা করিবেন। গীতার উপদেশই স্মরণীয়। গীতা বলেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

ভবিষ্যৎ কি ভাবে গঠিত হইবে তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব পিতৃপুরুষদের রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া চলি, স্বদেশের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করি এবং যাহা সর্ব্বোত্তম তাহা রক্ষা করিতে যত্নবান থাকি, পাপের প্রশ্রয় না দিই, তবে অন্যের

সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল ভাল ব্যতীত মন্দ হইতে পারে না। প্রকৃতি নিজেই অনাবশ্যক পার্থক্য বিদূরিত করেন।

ভারত যদি নিজের আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে বৈদেশিক প্রভাবের পাদমূলে সমর্পণ করে তবে মঙ্গলের আশা নাই। কেহ যদি মনে করেন যে বৈদেশিক প্রভাব সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও মঙ্গলজনক এবং ভারতীয় সভ্যতার কোন মূল্য নাই তাহা রক্ষারও কোন প্রয়োজন নাই এবং যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা দূর করাই শ্রেয়ঃ, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। আমি তেমন কখনো মনে করি না। ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারকেই প্রাধান্য দেওয়ার ফলে এযাবৎ ভারতীয় ধর্ম্ম অবজ্ঞাত হইয়াছে ; এবং পরানুকরণ ও বৈদেশিক প্রভাবের স্রোতে আত্মসমর্পণ কিরূপ মারাত্মক তাহা ভাবিয়া দেখা হয় নাই। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই (স্বরাজ্যসিদ্ধি) মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যাহারা সেই অধিকার ও নিজের আত্মাকে হারাইয়াছে তাহাদের আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি ? যে নিজকে হারাইয়া ফেলে বা আত্ম-ধর্ম্মচ্যুত হয়, সে সমস্ত জগৎকে জয় করিলেও তাহার কোন মূল্য থাকে না। ইহা যেমন ব্যক্তিগত হিসাবে, তেমনই জাতির হিসাবে সত্য।

ভারতীয় সভ্যতা যদি আত্মরক্ষা করিতে পারে তবে তাহা জগতের কল্যাণসাধন করিবে। ইহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইহার আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগবেষণার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের কিঞ্চিন্মাত্রকেও অবজ্ঞা বা পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, সমস্তকেই সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। বিশ্বমণ্ডল শ্রীভগবানেরই দেহ, ইহার অতি ক্ষুদ্রাংশও পবিত্র। এই ভাব যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তদনুসারে নিজকে ও নিজের স্বার্থকে সরল সাত্ত্বিকভাবে রক্ষা করেন তাঁহারা শুধু নিজের মঙ্গলসাধন করেন এমন নহে, ভগবন্নির্দ্দেশানুসারে চলিয়া তাঁহারা সমগ্র জগতেরই কল্যাণ করেন।

ইংরেজ সমালোচকেরা এদেশের সাধনপ্রণালীকে বিশেষভাবে পর্য্যদস্ত করিবার চেষ্টা করেন। আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে মিঃ উইলিয়ম আর্চ্চার সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অন্যান্য সমালোচকেরা কেহ ভারতের ধর্ম্ম, কেহ দর্শনশাস্ত্র, কেহ বা ইহার কলাশাস্ত্রের নিন্দা গাহিয়াছেন, কিন্তু মিঃ আর্চ্চার ইহার সমস্ত বিষয়েরই মুণ্ডপাত করিয়াছেন। তাঁহার স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে,—ভারত এখনও সভ্য হয় নাই, অসভ্যতার নিম্নস্তরেই রহিয়াছে। বিলাতের "টাইমস্" পত্রিকা তাঁহার এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বড়ই আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু যেসমস্ত ইউরোপীয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভারতের প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহাদের উপর যথেচ্ছ গালি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"ঐসমস্ত ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদের কাছে সুলভে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ভয়ঙ্কর মারাত্মক। তাঁহারা ভারতীয়দিগকে বুঝাইয়া দেন যে তাহাদের 'ঈশ্বরগুলি' [এই ভাবের বিদ্রূপাত্মক ভাষাই উঁহারা ব্যবহার করেন] এবং তাহাদের সাধনা আমাদের ঈশ্বর ও সাধনা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, এবং তাহাদের অন্তরাত্মার ভিতরে অতি উচ্চ দরের আধ্যাত্মিকতা বিরাজ করিতেছে, যাহা পাশ্চাত্য আত্মার অনধিগম্য !—এই সমস্ত কাল্পনিক উক্তি মিঃ আর্চ্চার অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি হিন্দুর সাহিত্যে, দর্শনে, কলাশিল্পে কোথাও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাবোদ্দীপক এমন কিছুই দেখিতে পান নাই যাহা কোন জাতিকে উন্নত করিতে সমর্থ।" অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্রের কথা দূরান্তাং—গীতা এবং বেদান্তের মধ্যেও উচ্চ ভাবের কিছুই পান নাই। তারপর কংগ্রেস ও আধুনিক সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ভারতের 'খাঁটি বন্ধু' মিঃ আর্চ্চারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া

বলিয়াছেন—এই সমস্তই ভারতকে ধীরে ধীরে আমাদের আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছে—ইহাই ভারতের একমাত্র মুক্তির পথ।”

মিঃ আর্চ্চার যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন সেই সকল বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন অভিজ্ঞতাই নাই। তৎপূর্ব্বে যে সমস্ত লেখক ভারতসম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন তাহারই চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু কোন্ বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইদানীং এইরূপ সমালোচনা চলিতেছে ইহাতে তাহা ভালরূপেই প্রকটিত হইয়াছে। মিঃ আর্চ্চার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের সময় অবশ্যই আসিবে, তাহা কি স্বাধীনভাবে লাভ করিবে, না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপ পাইবে তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই, ভবিষ্যতের জন্যই রাখিয়া দিয়াছেন। তবে বর্ত্তমান সময়ে ভারত অসভ্য বর্ব্বর, তাহার অবস্থা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষতঃ ব্রিটিশ সভ্যতার অনুমোদিত নহে। এতদবস্থায় যদি তাহাকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হয় তবে তাহা ব্রিটিশ সভ্যতার ক্ষতিজনক এবং পৃথিবীর শান্তির পথে বিঘ্নসঙ্কুল হইবে। আর্চ্চারের সমালোচকও লিখিয়াছেন,—“হিন্দুসমাজ বহু শতাব্দীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার, দার্শনিক চিন্তা এবং অপরিবর্ত্তনীয় আচার প্রথার দ্বারা গড়া হইয়াছে। আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজ হইতে তাহা যে কত স্বতন্ত্র তাহা ধারণাও করা যায় না।” ইঁহাদের বক্তব্য এই যে ভারতের স্বায়ত্তশাসন পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাহাকে ভূষিত হইতে হইবে। কারণ পাশ্চাত্য জাতিরা জগতের ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছে, কেবল ভারতই তাহার প্রতিবন্ধক। তাহা হইলে অবস্থা দাঁড়াইল,—ভারত যে স্বায়ত্তশাসনের আশা করে তাহা পাওয়ার জন্য তাহাকে তাহার নিজ বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিতে হইবে, যদি না দেয় তবে চিরকাল পরের অধীনতা পাশে তাহার আবদ্ধ থাকা আবশ্যক।

তাহার নিজস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পাশ্চাত্য জাতির সহিত মিলিয়া গেলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। নতুবা ভারতের স্বায়ত্তশাসনলাভে জগতের বিঘ্ন ঘটিবে। এই সমস্ত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি হইতেই "টাইমস্" আর্চ্চারের বহিকে সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ভারতবাসীকে স্বরাজ্য দেওয়া উচিত বা অনুচিত, অথবা কোনকালে দেওয়া হইবে কি না, তৎসম্বন্ধেও আমি কোন অভিমত প্রকাশ করিতেছি না। আমি কেবল দেখাইতেছি, কি উদ্দেশ্যে ভারতের জ্ঞানগবেষণা ও সভ্যতার উপর এই সমস্ত আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা নিঃস্বার্থও নহেন, তাঁহাদের কোন জ্ঞানগবেষণাও নাই। যে সমালোচনা নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে শুধু সত্যনির্দ্ধারণের জন্য করা হয় তাহাই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্য ও কলাবিদ্যা প্রভৃতির যেইটিতে যাহার রুচি ও অধিকার তিনি তাহা লইয়াই আলোচনা করিবেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, জাতির আত্ম-সংরক্ষণ বিষয়ে তাহার সাধনা যতদূর কার্য্যকর হয় তাহাতেই তাহার গুরুত্বের পরীক্ষা। মিঃ আর্চ্চারের সমালোচনায় কেবল ব্যক্তিগত অভিমতকেই সর্ব্বোপরি স্থান দেওয়া হইয়াছে।—তিনি যুক্তিবাদের উপাসক, অতএব তাঁহার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার মতে ইউরোপের সাহিত্য এবং কলাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠতম; ভারতের ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাঁহার কাছে কিছুই নহে। এইরূপ সমালোচনায় যুক্তি, অভিনিবেশ এবং নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসা নাই, আছে কেবল ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান সাধনার প্রতি তাচ্ছীল্য এবং নিজের যাহা কিছু তৎপ্রতি বিশেষ পক্ষপাতিতা। শুধু মিঃ আর্চ্চার নহেন, এইরূপ পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচক আরো অনেকেই আছেন।

নিরপেক্ষ বিচার ক্বচিৎ দেখা যায়। মনস্বী কার্লাইল বলিয়াছেন নিরপেক্ষ সমালোচক হইতে হইলে যাহার সম্বন্ধে সমালোচনা করিবে তাহার চামড়ার ভিতর নিজকে স্থাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার ন্যায় হইতে হইবে, যেন তাহার মত ভাবিতে এবং তাহার মত অনুভব করিতে পারি। তেমন হইতে হইলে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অহঙ্কার বা আত্মাভিমানকে বর্জ্জন করা আবশ্যক। আমি বলিব, এই ভাবের চেষ্টায় শুধু উত্তম সমালোচনার শক্তি নহে, আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তিও আয়ত্ত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সমবায়, ত্যাগ

(৫)

অতীত ও বর্ত্তমান কালকে আমি সংঘর্ষের যুগ বলিয়াছি। বস্তুতঃ এখনও ত তাহাই চলিতেছে। পশুদের ভিতর শুধু পাশবিক সংঘর্ষই দেখা যায়, মানবেও যে পরিমাণ পশুত্ব আছে সেই পরিমাণ পাশবিক সংঘর্ষের বিরাম নাই। শুধু সংঘর্ষই নহে, অনেক সময় তাহা অতীব সাংঘাতিক ভাবও ধারণ করে, নতুবা বর্ব্বর লোকদের যে সংজ্ঞা জন্মে না। এমন কি ইদানীন্তন সুসভ্য লোকেরাও দুঃখদুর্দ্দশায় নিষ্পেষিত না হইলে জগতের দুঃখে তাহাদেরও সহানুভূতি জন্মে না। বৌদ্ধতন্ত্রে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বেরা মানবের পাশবিক ভাব দমনের জন্য ৪ প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বলপ্রয়োগ চতুর্থ।

অতীতে ও বর্ত্তমানে পশু ও মানবেরা সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; পশুর ন্যায় মানবও ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে একে অন্যকে পরাস্ত করিয়া, একে অন্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাই মানবের জীবন-যাত্রার নীতি বলিয়া বিবেচিত। অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যাপার দৃষ্টে ইহাকেই চিরন্তন নীতি বলিবার যথেষ্ট হেতু থাকিলেও ভবিষ্যতে তদতিরিক্ত অন্য কোন পন্থা পাওয়া যাইবে না মনে করা ভ্রমাত্মক।

পশুসমূহ ও কতিপয় মানুষ আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরে সংঘর্ষ করিয়াই চলিতেছে, এবং তাহাদের অবস্থানুসারে হয়ত তেমন সংঘর্ষের প্রয়োজনও আছে। মানুষের মধ্যেও মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, তজ্জন্য এমন

একটা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে তাহারা ও অন্যেরা বরাবরই সংঘর্ষ চালাইবে, এবং আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনযাত্রার উপযোগী যে সময় আসিতেছে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। বিশ্বপ্রকৃতির লক্ষ্য হইতেছে মানুষের অধ্যাত্ম-দর্শনশক্তির নিকট পরম জ্যোতিকে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে প্রকটিত করা। যাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ ভাব লইয়া চলে তাহারা সেই জ্যোতির প্রতি পাপাচরণ করে। অবশ্য যাহারা সরল বিশ্বাসে ভাল মনে করিয়া কাজ করে তাহাদের কোন পাপ হয় না। যুগে যুগে জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষেরা মানবের সর্ব্বোত্তম আদর্শ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে সকলেই এক সূত্রে গ্রথিত এবং অদ্যাবধি যাহা প্রকাশিত হয় নাই সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আসিতেছে। তাঁহাদের শিক্ষানুরূপ কার্য্য চলিতে থাকিলেও সম্পূর্ণ ফল এখনও পাওয়া যায় নাই। কারণ, মানুষ একেবারে হঠাৎ আদর্শানুযায়ী উচ্চ স্তর লাভ করিতে পারে না। যেমন আমরা এখনও দেখি, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে, একটা দায়িত্ব-হীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সামাজিক জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। 'নিজের স্বার্থসিদ্ধি কর, অন্যেরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক্,'—ইহাই তাহাদের নীতিবাক্য। যেমন ব্যক্তি, তেমনই তাহাদের জাতি, কেবলই নিজের স্বার্থচিন্তা করে। ইউরোপের বিগত মহাসমরের মূল অর্থ স্বার্থপরতার চূড়ান্ত। প্রথমতঃ স্বাভাবিক ভাবে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, খৃশ্চানধর্ম্মের প্রভাবে তাহার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস হয়, তৎপর খৃশ্চানধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হওয়ায় এবং তদানুষঙ্গিক কলুষিত জ্ঞানাভিমানের বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভীষণতর মৃত্যুযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাহাদের মৌলিক বর্ব্বরতা অধিকতর তীব্রবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় অন্যের উপর অত্যাচার করিলে বিজয়ী পক্ষের যেমন সফলতা লাভ হয়, বিজিত পক্ষের তেমনই ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হয়।

সম্ভবতঃ মানবতার ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরের সেই নীতি উৎকটতার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। আশা করি, এই যুদ্ধের পরিণাম ফলে তাহার অবসান হইবে। উন্নতির গতি মন্থর, তাই বলা হয় যুদ্ধের লাল ফুল শুকাইয়া গেলেও তাহার মূল উৎপাটিত হইতে কিছু সময় লাগে। যাঁহারা মনে করেন যে ইহার পরেই স্বর্ণ যুগ আসিবে, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। যে পর্য্যন্ত মানুষ স্বীয় হৃদয়ের কঠোরতা বর্জ্জন করিতে পারিবে না, আপনার ও পরের হৃদয়ের পরিচয় যথাযথরূপে পাইবে না, সেই পর্য্যন্ত তাহার দুর্ব্বুদ্ধি এবং দুর্ভোগও যাইবে না। ভারত যদি ইচ্ছা করেন, তবে এতদ্বিষয়ে জগৎকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। তাহা করিতে হইলে তাঁহাকে স্বীয় বাণী লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। পাশ্চাত্যবাসীরা যে শিক্ষা ভারতকে দিয়াছে তাহার প্রতিধ্বনি তাহারা শুনিবে না।

ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে? "বেদান্তকেশরী" পত্রিকার জনৈক লেখক, মানুষ যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় বিষয়ে তিন প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া চলে তাহা এবং বেদান্তের সহিত ঐ তিন প্রকার নীতির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম নীতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষ ও জাতি নিজকে সুপ্রতিষ্ঠ ও সুরক্ষিত করিবার জন্য অপর সকলকে নির্য্যাতন করিতে চায়, তাহাতে নিজেরও সর্ব্বনাশ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। ইহা প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নীতি। যে পর্য্যন্ত মানুষ পরিবারভুক্ত থাকিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে নাই সেই পর্য্যন্ত তাহারা ভাইয়ে ভাইয়ে সংগ্রাম করিত। পরিবার-ভুক্ত হইয়া থাকিতে আরম্ভ করিলে এক পরিবার অন্য পরিবারের সহিত সংগ্রাম করিত। তৎপর ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সংঘর্ষনিবারণের জন্য সমাজসঙ্ঘটন আরম্ভ হয়। তারপর এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের

বিরোধ ঘটিত। সমাজে সমাজে বিরোধ নিবৃত্তির পর একজাতি অন্য জাতির ও এক সাম্রাজ্য অন্য সাম্রাজ্যের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ সংঘর্ষ চলিতে থাকিলে প্রবলেরা প্রকাশ্যে ও গোপনে দুর্ব্বল জাতিদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়া আবার ব্যক্তিগত বিরোধের সৃষ্টি করিতে থাকে। সমগ্র মানবজাতিকে সুসম্বদ্ধ করিতে পারিলেই এইরূপ বিরোধের অবসান হইতে পারে। বেদান্ত অনুসারে মানবজাতি এমনভাবে প্রস্তুত হইবে, যাহাতে এক মানুষ অন্য মানুষের, এক জাতি অন্য জাতির ক্ষতি না করে, এবং জীবমাত্রকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ভারতবর্ষ তাহাই করিয়াছেন। জ্ঞানপূর্ব্বক পরের ক্ষতি করিলেই পাপ হয়, পরের ক্ষতি করিতে গেলেই দুঃখ যন্ত্রণা জন্মে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, —'বিদ্বেষের দ্বারা বিদ্বেষ দূর হয় না, প্রেমের দ্বারাই হয়।'—প্রথমোক্ত নীতি মানুষে এবং জাতিতে বিরোধ সৃষ্টি করে; হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ জন্মায়। এই স্তরে মানুষ এবং জাতি নিজের কথাই ভাবে, এই বিশ্ব যাঁহার দেহ সেই পরমাত্মার কথা চিন্তা করে না। যে পর্য্যন্ত এই নীতি প্রবল থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কেহই নিরাপদ্ নহে; মানুষ ও জাতি কেহ উঠিবে, কেহ পড়িবে, এবং এই ভাবেই চলিবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে মানুষ সমবায় নীতি অবলম্বন করে। তখন একে অপরের সহিত সমবায় নীতি অনুসারে চলিতে থাকে; ব্যক্তিগত ভাবে ও জাতি হিসাবে যেমন নিজের তেমনই অপরের রক্ষার জন্যও ব্যবস্থা করে। প্রথম নীতির কষাঘাতে শিক্ষালাভ করিয়া এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ লোকের উপদেশ পাইয়া মানুষ এই দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়। সমাজে আধ্যাত্মিক জ্ঞানী লোক সকল সময়েই বিদ্যমান থাকেন। কারণ মানুষকে যিনি রক্ষা করেন তিনি মানুষের ভিতরেই বাস করেন। দেহ এবং মনই আত্মার বাহন। দেহ এবং মন পূর্ব্ববর্ত্তী

অবস্থায় যে যন্ত্রণাভোগ করে তাহাতেই তাহারা পরবর্ত্তী অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়; তখনই প্রকৃতির পরোপকার-বৃত্তি স্ফূরিত হইতে থাকে; মানবগণ পরস্পরে একতার বন্ধন ও সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। আত্মভাবের গণ্ডী ক্রমে নিজের ও নিজ পরিবারের মধ্য হইতে সমগ্র মানবসমাজে, তৎপর বিশ্বরাজ্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। তখন মানুষ উপলব্ধি করে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

তৃতীয় স্তর ত্যাগের। প্রত্যেক মানুষ যখন বুঝিতে পারে অন্যান্য যাহা কিছু তৎসমস্তই এক আত্মারই অভিব্যক্তি, তখন তাহারা প্রত্যেকেই পরের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। সেই অবস্থা এখনও আসে নাই। দ্বিতীয় স্তরও সকলে প্রাপ্ত হয় নাই, অনেকের পক্ষে সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। ইহাও বলা আবশ্যক যে ত্যাগ জ্ঞানপূর্ব্বক এবং স্বকৃত হওয়া চাই। দুর্ব্বল জাতিরা সর্ব্বদাই অজ্ঞানাবস্থায় আত্মত্যাগ করে ও বিলুপ্ত হইয়া যায়; তেমন ত্যাগে কোন পৌরুষ নাই। ব্যাধের ছুরিকাতলে মেষের মস্তক দানের মাহাত্ম্য কি? প্রত্যেক স্তরেই ক্ষমতা থাকা চাই এবং এমন ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই যাহা নিজের পরিণাম নির্দ্ধারণ করিতে পারে। সেই ইচ্ছা নিজের ও পরের, অথবা শুধু পরের জন্য আত্মদানে অগ্রসর হইবে। সকলেই শক্তিশালী হও, যে পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী সংঘর্ষের স্তর অতিক্রম না করিবে, সেই পর্য্যন্ত প্রত্যেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাক, যেন অন্য জাতি আসিয়া গ্রাস না করে; প্রত্যেক কার্য্যে পুরুষকার দেখাও, পুরুষকারহীনতা মানবপ্রকৃতির কলঙ্ক। বিপুল প্রাচ্য-গৌরবের অধিনেতৃগণ যদি আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত না হন তবে বিষয়কর্ম্মে সুনিপুণ ভয়ঙ্কর তমঃপ্রধান প্রতীচ্য তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

যে সকল ভারতবর্ষবাসীকে মিঃ আর্চ্চার বর্ব্বর বলিয়াছেন, তাহাদেরই বেদান্তের উপদেশ—সমগ্র বিশ্বই পরমাত্মা, তাহাই মনুষ্যরূপে ব্যক্ত; সমস্ত

প্রাণীই সমান। মানুষ যখন এই জ্ঞানলাভ করিবে তখন সে অপরের ক্ষতি করিতে পারিবে না, অন্যকে মারিয়া নিজে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে না। অন্যের ক্ষতি করিতে গেলেই নিজের ক্ষতি করা হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলিয়াছেন, মানুষ সকলকে আত্মবৎ মনে করিয়া সকলেরই হিতসাধন করিবে।—"আত্মবৎ সর্ব্বভুতেভ্যো হিতং কুর্য্যাৎ কুলেশ্বরি!" ভগবদ্দেহের প্রত্যেক অংশের কর্ত্তব্য নিজকে বাঁচাইয়া অপরকে রক্ষা করা, তাহা হইলে সমগ্রের সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে। ইহারই জন্য হিন্দুসমাজে অতীব মহান্ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের বর্ত্তমান অভ্যুদয়শীল জাতিরা অদ্যাপি প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই, কিরূপে তাহা সম্ভব বেদান্তই তাহার ভিত্তি নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন। "পরোপকারো হি পরমো ধর্ম্মঃ"।—এমন মহোচ্চ উপদেশ ভারত ব্যতীত আর কোথায় সম্ভব? 'ইহাই প্রকৃত সভ্যতা এবং ভারতই এই সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

ভারতীয় সাধনার উপর আক্রমণ

(৬)

ইদানীং আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কথা প্রায়ই শুনা যায়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতিকে তাহার আত্মোন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ তাহার নিজকেই করিতে দেওয়া হইবে, বাহিরের কাহাকেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না। পুরাকালে সরস্বতী নদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণই স্বধর্ম্মানুসারে চলিবার নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা মূলতঃ ভারতেরই নীতি। প্রত্যেক ব্যক্তির ও বর্ণের যে স্বকীয় ধর্ম্ম আছে তাহাতেই তাহার আত্মোন্নতি নির্ভর করে, প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবে, এবং স্বাধীনভাবেই করিবে। সাধারণ ধর্ম্ম যেমন সর্ব্বসম্মত ও সুনিশ্চিত, বিশেষ ধর্ম্মও তেমনই স্বীকৃত। তপস্বী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন,—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশাল বিবর্ত্তন-প্রবাহে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে বিশেষ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। আত্মোন্নতি-সাধনের নিয়মানুসারে— 'তুমিও বাঁচ, আমাকেও বাঁচিতে দাও'—ভারত এই নীতির সমর্থক। রাজনীতি সম্বন্ধে সাজাত্যকামীরা বরাবরই নিজেদের দেশের জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শাসকজাতির মুখে এই নীতির কথা নূতন শুনা যাইতেছে। লণ্ডনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'হিবার্ট জার্ণালের' সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"জার্ম্মাণির দোষ হইতেছে যে নিজের কাজ নিজে করিয়া অন্যের কাজ অন্যকে স্বাধীনভাবে করিতে দেওয়ার-নীতি সে কখনো শিক্ষা করে নাই। সে কাহারো মতামত না

লইয়াই জগদ্বাসী সকলেরই উপর তাহার সাধনা চাপাইয়া দিতে চায়।”—ইউরোপের কোন্ জাতি তেমন ভাবে নিজের কাজ নিজে করিয়া অন্যের কাজ অন্যকে করিতে দেয় ? বিশেষতঃ যাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিজেদের অধিকার বিস্তার করিয়াছে তাহারা দেয় কি ? তাহাদের মধ্যে ত ইহার নাম গন্ধও নাই। উক্ত সম্পাদক আরো লিখিয়াছেন,—“নিজে নিজের ব্যাপার লইয়া থাকার নীতির উপর যদি প্রথমাবধি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইত এবং পরোপকারের কথা কম বলা হইত, তা’হলে এত ঐশ্বর্য্য হয়ত সঞ্চিত হইত না, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক মঙ্গলজনক কার্য্য হইত। বর্ত্তমান ‘সোসিয়েল সার্ব্বিসের’ ব্যাপার অপেক্ষা আমরা একে অপরের অধিকতর মঙ্গল-সাধন করিতে পারিতাম ; আলস্য-পরতন্ত্রতা ও অযোগ্যতার পরিমাণ হ্রাস হইত, কদর্য্য মলিনতা, সর্ব্বোপরি ছল চাতুরীর মাত্রা হ্রাস হইত ;—যে সমস্ত পাপাচারে জগতের ভবিষ্যৎ কালিমাময় করিতেছে তাহারও মাত্রা হ্রাস হইত।” ইউরোপবাসীরা এসিয়ার ও আফ্রিকার অধিবাসী-দের সম্বন্ধে ঐরূপ নীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে কি ? মূল কথা হইতেছে, অন্যকে সভ্য করিবার যে ঔষধের ব্যবস্থা তাহারা করে, সেই ঔষধ নিজে ব্যবহার করিবে না। পৃথিবীর অন্যত্র যেখানে যাহা হওয়ার হউক, ইউরোপীয়দের একের উপর অন্যের হস্তক্ষেপ অসহনীয়। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য,—ইউরোপের কোন সমুন্নত জাতির আধিপত্য যদি এসিয়ার কোন জাতিকে ‘উন্নত’ ও ‘সুসভ্য’ করিতে পারে, তবে উহা ইউরোপীয় কোন জাতিকে পারিবে না কেন ? পক্ষান্তরে ‘নিজে নিজের ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার’ নীতি যদি আমরা দৃঢ়তার সহিত পালন করি, অন্যে তাহার কাজ ভালরূপে করিতে পারুক বা না পারুক তাহাতে আমাদের কি আসে যায় ? প্রাগুক্ত নীতি অনুসারে কাহারো পরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ইউরোপীয়

সমস্ত জাতি কার্য্যতঃ পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, অথচ তাহার হেতু দেখায় অন্যরূপ। বস্তুতঃ তাহাদের বক্তব্য,—এই ভূপৃষ্ঠের কোন অংশে কাহারো কোন স্বত্ব নাই, যাহারা উহার উত্তমরূপ ব্যবহার করিতে পারে উহা তাহাদেরই স্বত্ব। অতএব যাহারা উন্নত ও শক্তিশালী তাহারাই রাজত্ব করিবে, এবং অসভ্য বা কম সভ্য যাহারা তাহাদিগকে সরাইয়া দিতে হইবে। যে অন্যকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে সেই-ই হৃতসর্ব্বস্বের অবিভাবক হইয়া তদ্দ্বারা স্বীয় লাভের পথ পরিষ্কার করিবে, এবং তাহাকে নিজের সাধনানুরূপ উন্নত করিবে। এই নীতি অনুসারেই মিঃ আর্চ্চার ভারতকে অসভ্য বর্ব্বর আখ্যা দিয়া তাহাকে শাসকদের সুসভ্য আদর্শানুসারে উন্নত করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক ইউরোপীয় শক্তি নিজকে অতি উন্নত ও সুসভ্য মনে করে, অন্য কেহ যদি তাহার সাধন-প্রণালী উহার দেশে প্রচার করিতে চাহে তবে তাহাকে অনাহুত ধৃষ্টতা বলিয়া তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হয়। যে নিজের সাধন-প্রণালী অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে সে মনে করে যে উহার মত শ্রেষ্ঠ প্রণালী জগতে আর নাই, সুতরাং সর্ব্বোপরি তাহারই প্রাধান্য প্রবল হওয়া উচিত।

হয়ত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীবাসী এক জাতির সহিত অন্য জাতির সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইতেছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বিগত যুদ্ধের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিসমূহের নীতি ছিল, নিজেদের মধ্যেই হউক বা এসিয়াবাসী ও আফ্রিকাবাসীদের সম্বন্ধেই হউক, বলপ্রয়োগ এবং তদ্দ্বারা নিজে লাভ করা। নিজের লাভের জন্য অন্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ইউরোপের সকল শক্তিই ঐ নীতি অবলম্বন করিয়াছে। নিজের লাভের জন্য কেহ কোন কাজ করিতে গিয়া পরোপকারার্থ তেমন করিতেছে, এইরূপ উক্তি পূর্ব্বে কেহ করিত

না, অল্পদিন পর্য্যন্তই তাহা আরম্ভ হইয়াছে। তদ্দ্বারা পরের উপকার হইতেও পারে, সে অন্য কথা। পরকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বনের বা প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা আজও কি করিতে পারি? প্রকৃত অসভ্য এবং বর্ব্বর লোকদিগকেও কি আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুযায়ী নিজের উন্নতির বা আত্মবিকাশের চেষ্টা নিজকে করিতে দেওয়া হইবে? তেমন চেষ্টায় বিফলকাম হইলে তাহাদের অধোগতিই হউক বা বিলোপই ঘটুক চাহিয়া থাকিতে হইবে কি? স্বধর্ম্ম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি যদি প্রযুজ্য না হয়, তবে নিজের লাভের দিকে না দেখিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনুন্নত জাতিকে সুশিক্ষা দান করার অভিপ্রায়ে যে অদূর ভবিষ্যতে তেমন কোন পরহিতৈষী জাতি গড়িয়া উঠিবে তেমন সম্ভাবনা দেখা যায় না। লাভের প্রত্যাশা থাকিলে সেই ভার বহনের জন্য দাবীদার অনেকেই উপস্থিত হইবেন। আধুনিক নীতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তকেরা হয়ত বলিবেন উদ্ধার-কারীদের লাভ যাহাই হৌক্ পরের উপর আধিপত্য করার উপযোগিতা প্রমাণের জন্য প্রজার যাহাতে বিশেষ মঙ্গল হয় তেমন কার্য্য করা উচিত। শাসকদের লাভ এবং শাসিতদের কল্যাণ উভয়ই একত্রিত থাকা আবশ্যক। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য অনুসারে শাসিত প্রজার উপর কোথাও আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়, কোথাও কিছু শিথিল থাকে। কিন্তু সভ্যতার হিসাবে যেখানে উভয়েই প্রায় সমান সেখানে পুরাতন নীতি অনুসারে রাজ্য ও অর্থলাভের কথা স্পষ্টরূপে বলিয়াই হউক, বা আধুনিক নীতি অনুসারে বিজিতদের উন্নতির দোহাই দিয়াই হউক পরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে গেলেই তাহা দোষাবহ বিবেচিত হইবে।

পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি যাঁহারা উদ্ভাবন করিতেছেন তাঁহারাই সেই নীতি অনুসারে বিশুদ্ধভাবে চলুন, পূর্ব্বাপর সততা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করুন, তাঁহাদের কোন কার্য্যে যেন ছল চাতুরী প্রকাশ না পায়।

দেখা যাইতেছে ভবিষ্যতে যাঁহারা পরের উপর আক্রমণ করিতে যাইবেন তাঁহারা আক্রান্ত জাতির সভ্যতার ত্রুটি দেখাইয়াই তাঁহাদের কার্য্য সমর্থন করিবার উপায় খুঁজিতেছেন। মিঃ আর্চ্চার ও তন্মতাবলম্বীরা যে ভারতবর্ষকে বর্ব্বর উন্নতি-বিরোধী, মান্ধাতার আমলের, অন্ধবিশ্বাসী, মূর্খ, ধর্ম্মবর্জ্জিত ইত্যাদি আখ্যা দিতেছেন তাহার উদ্দেশ্য উহাই। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কোন এক সভ্য জাতির, কোন এক জ্ঞানোন্নত জাতির অধীন থাকিতেই হইবে; যেন ভারতবর্ষ সভ্যও নহে, জ্ঞানোন্নতও নহে। ভারতের উপর এইরূপ ঘোর মিথ্যার আরোপ করা হইতেছে, অথচ ভারতবাসীরা এযাবৎ তাহা খণ্ডন করেন নাই, ইহাতে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বেও যাহারা সামরিক শক্তিবলে পরের রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত তাহারা এই ভাবের যুক্তির আশ্রয় লইত না। ইদানীং সময়ের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জনমতকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, তাই বলা হয় যে প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তাহাদের উপর আধিপত্য করা হইতেছে। প্রজাসাধারণের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় অবস্থাই এতদ্বিষয়ের পরিণাম নির্দ্ধারণ করিবে।

দৃষ্টান্ত

(৭)

কৃষ্ণাঙ্গদের বিশেষতঃ যে সব কৃষ্ণাঙ্গ পরাধীন তাহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্বেতাঙ্গ জাতির চক্ষে অপকৃষ্ট দেখায়। কারণ, তাহারা ঐ সমস্তের মর্ম্ম বুঝিতে চায় না এবং প্রথমাবধি তদ্বিরুদ্ধে কুসংস্কার পোষণ করে। যে সভ্যতা উচ্চ দরের তাহা কেন তাহার জাতিকে স্বাধীন রাখিতে পারে নাই? উন্নত করিবার শক্তি যদি তাহার ধর্ম্মব্যবস্থায় থাকে তবে তাহা জাতিকে রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে কেন মুক্ত করিতে পারে নাই? যে নৈতিক সজীবতা হারাইবার ফলে জাতি দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে তাহারই বা কেন পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই? এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মনে উপস্থিত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আছে। ঐরূপ অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ পরম্পরাগত সাধনার ধারাসমূহকে এবং তৎসমস্তের সংস্করণ ও তদনুসারে কার্য্য করিবার দায়িত্ব যাহাদের উপর রহিয়াছে তাহাদিগকে, পৃথক্ ভাবে দেখিতে হইবে। কেন না, মানুষ কালক্রমে দুর্ব্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের সাধনা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে, তাহাদের উন্নতির পথও রুদ্ধ হইতে পারে।

ভারতীয় সাধনার রীতিনীতিসমূহকে আক্রমণ করত বহুকাল হইতে অত্যন্ত পরুষভাবে তাহার সভ্যতার নিন্দা করা হইতেছে। এসিয়ার প্রত্যেক জাতির ভাগ্যেই ঐরূপ নিন্দা মিলিয়াছে। ভারতই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যহীন। বেশী দূরের কথা নহে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দেও হিন্দু আইন-প্রণেতা সার টমাস্ ষ্ট্র্যাঞ্জ লিখিয়াছিলেন,—"ভারতের

জ্ঞানগবেষণাকে ঘৃণা ও নিন্দা করাই ইদানীং একটা কুৎসিৎ ফ্যাসন দাঁড়াইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে উহার উন্নতিসাধনই ব্রিটনের কর্ত্তব্য, তাহাতে তাহার স্বার্থসিদ্ধিও হইবে। তেমনভাবে চলিলে ব্রিটনের অধিকতর মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পরন্তু ভারতবাসীকে অবমাননার দ্বারা উত্যক্ত করিয়া তাহাদের ঘৃণাভাজন হওয়া কখনো সঙ্গত নহে"

অতীতে এবং বর্ত্তমানে কেহ কেহ ভারতীয় সভ্যতার নীতিসমূহ সমর্থন না করিয়াও তৎপ্রতি ন্যায্য বিচারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই সফলকাম হন নাই। মিঃ আর্চ্চার যাঁহাদিগকে প্রাচ্যপ্রবর্ত্তক ও ভারতপূজক আখ্যা দিয়াছেন তেমন অল্পসংখ্যক লোক বরাবরই আছেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন,—'বেদান্ত এবং তাহার তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্ব্বক যেসমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না যে পিথাগোরস্ এবং প্ল্যাটো ভারতীয় ঋষিগণের মূল ভাণ্ডার হইতেই উচ্চ তত্ত্বরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইদানীং সাধনার বিষয়েও রাজনৈতিক ভাবই প্রবল। তথাপি সার উইলিয়ম জোন্স জীবিত থাকিলে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইত না। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত দার্শনিক ঐতিহাসিক ভিক্টর কাজিন লিখিয়াছেন,—"প্রাচ্যদেশের, বিশেষতঃ ভারতের কাব্য এবং দার্শনিক উচ্চ তত্ত্বসমূহ ইদানীং ইউরোপে বিস্তার লাভ করিতেছে; তৎসমস্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখিতে পাই তাহাতে এত গভীর সত্যসমূহ রহিয়াছে যে তাহাদের সহিত তুলনায় ইউরোপের শক্তি বহু নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের সম্মুখে মাথা নত করিতে বাধ্য হই, এবং দেখিতে পাই মানবের আদিবাসস্থান ভারতই সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের জন্মভূমি"। ফ্রেডারিক শ্লেগেল লিখিয়াছেন,—"ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম দর্শনশাস্ত্র ও যুক্তিবাদের যে আদর্শ গ্রীক দার্শনিকেরা

সুবিন্যস্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সহিত তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। মনে হয় মধ্যন্দিন প্রদীপ্ত ভাস্করের প্রচণ্ড জ্যোতিঃ-পুঞ্জের সম্মুখে খদ্যোতের ক্ষীণ রশ্মি !—এখনই বুঝি নিবিয়া যায়। ভগবান হইতেই মানবের উৎপত্তি, পুনরায় ভগবানের সাযুজ্যলাভ তাহার করিতে হইবে। এ তত্ত্ব মানব-হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়া প্রত্যেক কার্য্যে ও উদ্যমে সে যেন ঐ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলে ভারতের শাস্ত্ররাজি তেমন ভাবেই তাহাকে প্ররোচিত এবং তাহার প্রত্যেক চেষ্টায় উৎসাহিত করেন।” আধ্যাত্মিক উন্নতি যদি মানুষ বুঝিয়া থাকে তবে এই কথাগুলিতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়া কখনো ভারতের প্রশংসা করেন নাই। পরন্তু অনেক বিষয়ে তিনি ভারতের প্রতি অবিচারই করিয়াছেন। সপেনহয়ার লিখিয়াছেন, “উপনিষদ্ অধ্যয়ন দ্বারা যেমন উপকার লাভ ও আত্মোন্নতি সাধিত হয় পৃথিবীতে তেমন আর কিছুরই দ্বারা হয় না। উপনিষদই আমার জীবনের শান্তি, উপনিষদই আমার মৃত্যুরও শান্তিদাতা হইবে।”—এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন,—“সপেনহয়ারের এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের যদি কোন প্রয়োজন থাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাহা করিতেছি। সুদীর্ঘকালাবধি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি ইহা তাহারই ফল।”

এই সমস্ত মহৎ লোকদেরই উক্তি, কিন্তু সংসারের সকল লোক তেমন নহে। পাশ্চাত্য লেখকদের অধিকাংশই ভারতীয় সভ্যতাকে আক্রমণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞতাপূর্ণ গালাগালি। রেভারেণ্ড এ এইচ বাওম্যান নামক জনৈক খৃশ্চান মিশনারী তাঁহার “খৃশ্চান থট্ এণ্ড হিন্দু ফিলজফি” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“অল্প দিন মাত্র পূর্ব্বেও সমস্ত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র জ্ঞান ও নৈতিক চিন্তার হিসাবে আবর্জ্জনা স্তূপ

বলিয়া গণ্য হইত আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে তাঁহারা আবার অতিরিক্ত প্রশংসার চূড়ান্ত করিবেন।"—তাঁহার এই উক্তিই অতিশয়োক্তি। ইংলণ্ডের এবং অন্যান্য রাজ্যের সাধারণ লোকেরা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ভারতীয় সাধনার গুরুত্ব যথোচিত উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রাচ্য-তত্ত্বে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে ভারতের অতিরিক্ত গুণগ্রাহী আমি তেমন দেখিতে পাই না। তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধ ভাব কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া যে লিখিয়াছেন তাহা ঠিক। তথাকার আধুনিক লেখকদের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে বলা ঠিক নহে। অধিকন্তু রাজনৈতিক কারণে ভারতের সাধনা ও সমাজনীতির উপর অধিক মাত্রায় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে।

এস্থলে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব অবশ্যই আছে যাহা এই বিরোধিতার কারণ। দ্বিতীয়, ভারতসভ্যতা যে এখনও সজীব রহিয়াছে এইরূপ আক্রমণ তাহাই প্রমাণ করে। ফিনিসীয়, কার্থেজীয়, বা বেবিলোনীয় সভ্যতার মধ্যে অসংলগ্ন বা অপ্রমাণ্য কি আছে না আছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য এইক্ষণ কেহই ত তেমন নৈতিক বায়ুগ্রস্ত হন না। কারণ সেই সব মৃত ও বিলুপ্ত, ভারত এখনও সজীব। জনৈক ফরাসী লেখকের ভাষায় বলা যায় ভারত অমর। হিন্দু-ভারত এইক্ষণ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে শতধা বিভক্ত, রাজনৈতিক কারণে ছিন্নভিন্ন, তদুপরি বহু ভাষা ও বিভিন্ন রকমের বর্ণমালার ব্যবহারের দরুণ, এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া বিজাতীয় বিদেশীয় শাসনাধীন হওয়ায় তাহার অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি তাহার ভিতর এমন শক্তি আছে যাহার অনুবলে সে এখনও বাঁচিয়া আছে,

এবং যাহার জন্য এখনও আমরা তাহার বিষয় লইয়া আলোচনা করি। আমি মনে করি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে একই ভাবাত্মক আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক জ্ঞান রহিয়াছে তাহা এবং তাহার পরমাশ্চর্য্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুব্যবস্থাই ইহার মূল।

জনৈক ইংরেজ ভারতকে পৃথিবীর একটা 'বিকট-কলঙ্ক' বলিয়াছেন, সারা পৃথিবীর আর কোথাও যেন কলঙ্ক নাই, সবই নিষ্কলঙ্ক! সুবিখ্যাত মণীষী অধ্যাপক লোয়েস ডিকিন্সন যথার্থরূপে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"একটা বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে ভারতবিরোধী লোকেরা প্রাচ্য প্রতীচ্যের বিভেদ দেখাইবার জন্য তেমন বিশেষ চেষ্টা করেন না, যত ব্যগ্রতা যত চেষ্টা ভারতের সহিত পৃথিবীর অবশিষ্ট সকলের বিভেদ দেখাইবার জন্য।" বস্তুতঃ ভারতের এমন কিছু একটা বিশেষত্ব আছে যাহা তাহাকে পৃথিবীর 'অপর সমস্ত জাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করে। তাই ভারত আপনাকে কর্ম্মভূমি নামে অভিহিত করে, এবং অপর সমস্ত দেশকে ভোগভূমি বলে। এই জ্ঞানানুসারেই ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এই জন্যই ভারতবর্ষের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও আমরা দেখিতে পাই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের জীবনধারা ভারতীয়দের মধ্যে অব্যাহত রহিয়াছে। বারাণসীস্থ গঙ্গাতীরে অথবা পল্লীগ্রামের তড়াগতীরে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন সেই বিমল সৌন্দর্য্য পূর্ণ প্রাচীন যুগে উপস্থিত হইয়াছি। সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ দেহস্বরূপে প্রাচীন আদর্শের প্রাণরস রক্ষা করিতেছে। পৃথিবীময় যে ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত চলিতেছে তাহার আকর্ষণে ভারত আক্রান্ত হইতেছে, এই ঘোরসঙ্কটে আত্মরক্ষার্থ তাহার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলণ্ড কতকগুলি বিষয়ে ভারতের মহোপকার সাধন করিয়াছে। তন্মধ্যে তাহার জাতীয়

জীবনের অভিনব উন্মেষ সম্বন্ধে এবং তাহার ধর্ম্ম ও প্রাচীন প্রথাসমূহ রক্ষাসম্বন্ধে যে সাহায্য করিয়াছে তাহাই প্রধান। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষ এই ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে আপতিত হইত তবে হয়ত এতদিনে সে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ভারতের পরিণামে যাহাই ঘটুক, যে পর্য্যন্ত তাহার ভাবধারা পাশ্চাত্য জগতে অনুপ্রবেশ করাইতে পারে এবং যে পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতালাভ করে সেই পর্য্যন্ত তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

প্রাগুক্ত গ্রন্থকার (অধ্যাপক ডিকিন্সন) যথার্থই বলিয়াছেন,—হিন্দু ভারত যে তাহার শাশ্বত ধর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠ আছে ইহাই তাহার বিশেষত্ব। আমি দেখাইব, ভারতের ধর্ম্মমত একদেশদর্শী নহে, পরন্তু সময়োচিত। শাক্ত বেদান্ত পরমাত্মা এবং জগতের জীবনস্রোতকে সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সম্ভবতঃ এতৎসম্বন্ধে ভ্রান্তি-বশতঃই প্রতীচ্যবাসী অনেকে ভারতের ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ডাক্তার মেথিসন লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্যবাসীর মনে মানবজগতের উন্নতি সাধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ভারতবর্ষ ধর্ম্মতত্ত্বের গবেষণায় যে চিন্তাশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, পাশ্চাত্য জগৎ তেমন কিছুই কখনো দেখাইতে পারে নাই। ভারতের ধর্ম্মই পাশ্চাত্য সাধনাকে অগ্রসর করিয়াছে। ইউরোপের মণীষিগণ যে সমস্ত উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন, ভারতের ব্রাহ্মণই তাহার পথপ্রদর্শক। পাশ্চাত্যে এমন কোন জ্ঞানালোচনা দেখা যায় না, যাহা তৎপূর্ব্বে ভারতে হয় নাই। পাশ্চাত্য এমন কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে নাই যাহা প্রাচ্যে পূর্ব্বেই মীমাংসিত হয় নাই।"—এই সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া রেভারেণ্ড বাওয়্যান লিখিয়াছেন,—"আমরা এই সমস্তকে অতিশয়োক্তি মনে করিতে পারি,

কিন্তু ভারতীয় মণীষার গুরুত্ব, দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মগ্রন্থাদির পূত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারি না।”

তাঁহার বাসনা সফল হয় নাই। মিঃ আর্চ্চার ও অন্যান্য লেখকদের সমালোচনা উহাকে ব্যর্থ করিতেছে। সে যাহা হউক, যেখানে রাজনৈতিক অভিসন্ধি নাই সেখানে জনমত সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের ১৯১৩-১৪ ইংরেজী সনের শাসনবিবরণীতে লিখা হইয়াছে,—“সন্তোষের বিষয়, দেশীয় ভাষায় লিখিত খৃশ্চান সাহিত্যে এইক্ষণ আর হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাচর্চ্চা প্রায়ই দেখা যায় না।”—উচ্চাঙ্গের সাহিত্যলেখকেরাও ইদানীং ভারতীয় সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। ইউরোপের আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানবিদেরা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রানুযায়ী পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। যাদুবিদ্যার প্রসার ইদানীং পাশ্চাত্য দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন। ভারতেই তাহার প্রথম বিকাশ এবং বহু সহস্র বৎসর যাবৎ এদেশে তাহার চর্চ্চা চলিয়াছে। বেদান্তের প্রভাবও সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানীরা যখনই স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন তখনই তাঁহারা বেদান্তের অনুসরণ করেন। সম্প্রতি “রিলিজন এণ্ড রিয়ালিটী” নামক যে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে তাহার লেখক জে এইচ টাক্ওয়াল লিখিয়াছেন,—“আমরা যে মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বহুপূর্ব্বেই তাহা অবধারিত হইয়া আছে। আমাদের পাশ্চাত্য দর্শন ধীরে ধীরে সেই অনিবার্য্য অদ্বৈতবাদের দিকেই চলিয়াছে”। হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ল্যাড বহু যুক্তিতর্ক ও গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—“একমাত্র পরমাত্মাই চরম সত্য;—আমরা তাহার এক একটা পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি। কিন্তু ইহা বেদান্তেরই সর্ব্বোচ্চ গৌরব; কতকাল পূর্ব্বে বেদান্ত এই সুগভীর সত্য ঘোষণা করিয়াছেন, এবং বারম্বার এমন দৃঢ়তার

সহিত তাহা মানবকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন যে আমরা তাহা ভুলিতে পারি না, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। সমস্ত বস্তুর পরিণাম পরমব্রহ্মে, একমাত্র অদ্বৈত পরমাত্মায় সমস্তই বিলীন হইবে। বিরাট ধারণা! অসাধারণ সূক্ষ্ম দূরদর্শন! ইহা ভারতের বিশ্ববিমোহন অদ্ভুত অধ্যাত্মশক্তির সর্ব্বোচ্চ বিজয়-গৌরব। পাশ্চাত্য জগৎ এখনও তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই।"

ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া বিপক্ষ দল তদ্বিরুদ্ধে প্রবলতর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ভিন্ন সম্প্রদায় যে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহা স্বাভাবিক; তেমনই ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকদের যুগব্যাপী বাদবিতর্কও চলিতে থাকিবে। তৎসঙ্গে ইদানীং রাজনৈতিক স্বার্থ আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারই প্রেরণায় ভারতীয় ধর্ম্ম ও আচারপদ্ধতির বিরুদ্ধে উৎকট কুৎসা প্রচারার্থ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে এবং সংবাদপত্রেও প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ যে রাজনৈতিক উচ্চাধিকার চাহিতেছে তজ্জন্য সে উপযুক্ত নহে, ইহা প্রমাণ করাই ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু সোজা কথাটা বলিবে না যে—"এই দেশটা আমরা চাহি, অতএব যে কোন উপায়ে ইহাকে হাতে রাখিব।" বলা হয়—"মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য, ভারতের মুক্তির জন্য, সুতরাং তাহার উন্নতির জন্য, তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করা, তাহার শাসন সংরক্ষণ করা, তাহার মঙ্গল-বিধান করা, তাহাকে আমাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সভ্যতার স্তরে উন্নীত করা আমাদের কর্ত্তব্য।"—কিছুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মেণির কতিপয় লোকও ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যসম্বন্ধে ঠিক এইরূপ উক্তিই করিতেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল—'জার্ম্মেণ 'কুল্‌টুর' ইউরোপের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিলে ইউরোপের পরম মঙ্গল হইবে।' ইউরোপের সকল শক্তিই পূর্ব্বে

তথাকথিত অনুন্নত জাতিসমূহের প্রতি এই নীতির প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকলেই যে দুরভিসন্ধিমূলে এই নীতি অবলম্বন করেন এমন নহে। পক্ষান্তরে ভারতসম্বন্ধে প্রতীচ্যবাসী অনেকে সরলবিশ্বাসেই তেমন করেন বলিয়া আমার ধারণা। আমার এইরূপ ধারণার কারণ ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতিসম্বন্ধে তাঁহারা এতই অজ্ঞ যে, এবং স্বার্থপরেরা ভারতের বিরুদ্ধে এমন ভাবে মিথ্যাপ্রচার চালাইতেছে যে প্রতীচ্যের সরল লোকেরা সেই রূপ কাহিনী সত্য বলিয়াই গ্রহণ করেন, এবং সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা মনে করেন যে ভারতের উপর আধিপত্যের দ্বারা তাঁহারা ভারতের এবং নিজেদের উভয়েরই মঙ্গলসাধন করিতেছেন। কতকগুলি বিষয়ে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় তাহা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীর ধারণা সম্পূর্ণ বা অংশতঃ ভ্রমাত্মক হওয়ার জন্য ভারতবাসীই অধিকতর দায়ী। কারণ ইংরেজী অভিজ্ঞ ভারতবাসীরা অনেকেই তাঁহাদের জাতীয় জ্ঞানগবেষণাকে তুচ্ছ, অশ্রদ্ধা ও নিন্দা করিয়া থাকেন ; যাঁহারা তেমন করেন না, তাঁহারাও তাহার সংরক্ষণ ও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করেন না। সে যাহা হউক, আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্যবাসীরা যে নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা কহিয়া থাকেন তাহার অনেকটাই কপটতা। ভারতীয় সাধনার উপর তাঁহাদের অনেকের আক্রমণ দুরভিসন্ধিমূলক ও সত্যবর্জ্জিত। ভারতীয়েরা বর্ব্বর, ধর্ম্মহীন, নৈতিক জ্ঞানবর্জ্জিত ইত্যাদি উক্তি অবিরাম ঘোষণা করার, অথচ ভারতীয় সভ্যতার কোন গুণের উল্লেখ না করার হেতু আর কি থাকিতে পারে ? অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও ভারতীয়দের ঔদাস্যই ঐরূপ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে ভারতের কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, নশ্বরবাদ এবং সর্ব্ববিষয়ে ভগবন্নির্ভরতা ইত্যাদিই ভারতের নৈতিক চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিকে

এত দুর্ব্বল করিয়াছে যে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা তাহাদের নাই। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা নিঃস্বার্থভাবে এইরূপ দার্শনিক বিষয় উপস্থিত করেন না। কর্ম্ম কি, তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে বলিলে এইরূপ সমালোচকদের অনেকেরই চক্ষু স্থির হইবে। তৎসম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু জ্ঞান আছে তাঁহারাও পদে পদে ভ্রম করিয়াছেন। এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। এই সব বিষয়ে ভারতবর্ষ সভ্য নহে, বর্ব্বর,—যদি এইরূপ প্রমাণ করা যায় তবে তাহা রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্য নহে। ধর্ম্ম, নীতি, মানসী-শক্তি এবং সমাজসম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দুদিগকে যদি অতি কদর্য্য প্রমাণ করা যায়, তবে ব্রিটিশ জাতি তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে চাহিবে না। এমন করিতে হইবে, ভারতবাসীর কোনরূপ সভ্যতা আছে বলিয়া যেন ব্রিটিশ জাতি বুঝিতে না পারে; বলিতে হইবে যে সে ভয়ঙ্কর বর্ব্বর। পাশ্চাত্য কোন কোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু যদি রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বশূন্য অন্তরে ভারতের কোনরূপ জ্ঞানগবেষণার প্রশংসা করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত অথবা স্বার্থপর বলিতে হইবে। "টাইমস্" পত্রিকা যেমন লিখিয়াছেন—'ইহারা সুলভে যশঃ অর্জ্জনের প্রয়াসী' অথবা মিঃ আর্চ্চার যেমন বলিয়াছেন,—'ইহারা প্রাচ্যভাবান্বিত, তিলকে তাল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন, নিরর্থক বহু মূল্যবান সময় ক্ষয় করেন, ইঁহারা হয় থিওজফিষ্ট, অথবা বুদ্ধিহীন বিকৃতমস্তিষ্ক, ইত্যাদি রূপ আখ্যা ইঁহাদের দিতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি যে ধর্ম্মমূলক তাহা স্বীকার করিলে চলিবে না, অস্বীকারই করিতে হইবে। কারণ, ধর্ম্মভাব যাহারই কাছে থাকুক সে সম্মানার্হ, যাহাতে ধর্ম্মভাব আছে, তাহাতে অন্যান্য সদ্‌গুণও আছে। এই জন্যই "টাইমস্" মিঃ আর্চ্চারকে সমর্থন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"মিঃ আর্চ্চার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে

ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক এমন কোন উচ্চ ভাব নাই যাহা কোন জাতিকে উন্নত করিতে পারে।"—তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে অন্যেরাই ঐরূপ উচ্চ ভাব ভারতবাসীর অন্তরে জাগাইবে এবং তাহাদের উন্নতির ব্যবস্থাও অন্যেরাই করিবে। তেমনই কলিকাতার এংলোইণ্ডিয়ান দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও ভারতের অযোগ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য লিখা হইয়াছে যে,—'তন্ত্রানুযায়ী জীবনযাত্রার রীতি এখনও ভারতবাসীদের মধ্যে গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছে।' —তন্ত্রসম্বন্ধে এত কুৎসিত কথা পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে প্রচারিত আছে যে তন্ত্রের নাম শুনিতেই তাহারা শিহরিয়া উঠে। ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষসৃষ্টি ব্যতীত তাহাদের রাজনৈতিক দাবীর সহিত তন্ত্রকে সংযোজিত করার উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে ? ঐ পত্রিকার এক সংবাদদাতাও লিখিয়াছেন যে 'ভারতবাসীকে যদি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয় তবে ইংরেজদিগকে তাহাদের অপেক্ষা সভ্যতা ও সাধনার নিম্নস্তরের লোকদের শাসনাধীন করা হইবে। যে খৃশ্চানেরা আইশিস্, মিথ্র, এল্টার্টি এবং ইলিউজিনিয়ান প্রভৃতি পুরাকালের গুপ্ত উপাসনাপ্রণালীর উচ্ছেদ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তান্ত্রিক উপাসকদের অধীন করা কি রাজনীতিজ্ঞতার পারিচায়ক হইবে ?'—এই সমস্ত লেখকেরা রাজনৈতিক হিসাবে ঠিক কথা বলিতেছেন কি না সে বিচার আমি করিব না। এইরূপ সমালোচনার উদ্দেশ্য কি এবং তাহাতে সত্য কতটুকু আছে তাহাই আমার দ্রষ্টব্য। তাঁহাদের সভ্যতা যে উচ্চ স্তরের বারম্বার তাহাই তাঁহারা বলেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ?

তত্ত্বদর্শী লোকেরা বলেন, আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ভারতের মজ্জাগত। মিঃ আর্চ্চারও প্রথমতঃ লিখিয়াছেন, "পাশ্চাত্য গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা

ভারতের জন্য মহান্ গৌরবের দাবী করেন। ভারতকে তাঁহারা অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক বলেন। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে অবিনশ্বর সত্য আছে তাহার এবং জীবজগতের অন্তরতম তত্ত্ব ধারণা ও বিশ্লেষণ করার একমাত্র শক্তি ভারতবাসীরই আছে বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন।"—কিন্তু এতদ্বিষয়ে উঁহাদের সহিত তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত। তিনি বলেন,—ভারতবাসীর চরিত্র আমি যেমন দেখিতেছি তাহাতে বলিতে পারি,—এই ধর্ম্ম বিষয়েই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। ভারতের বিশেষত্ব সবল সুপুষ্ট অধ্যাত্ম-বীজকে বিকশিত করায় নহে, উহাকে ধ্বংস করাতেই। ভারতীয়েরা ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বদা অধোগামীই হইতেছে, ধর্ম্মের উচ্চ বিষয়গুলি তাহারা গ্রহণ করে না, মূল বস্তু ত্যাগ করত খোসা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। এইজন্যই আমি বলি, ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চাসন দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানববুদ্ধির অগম্য কল্পনা। কেবলমাত্র দু'একজন ধর্ম্মধ্বজী প্রমত্ত লোক ব্যতীত ভারতবর্ষ উচ্চ জাতির এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন মানবের উপযোগী মহৎ বিশুদ্ধ উন্নতিশীল ধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়াছে বলিয়া কেহই বলেন না। হিন্দুত্বে উচ্চতর কিছু থাকিলেও হীনতার সহিত মিশ্রিত হওয়ায় আধুনিক অল্পসংখ্যক সংস্কারকদের মধ্যে ছাড়া অন্যত্র তাহার অস্তিত্বই নাই।"—ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, খৃশ্চান প্রভাবান্বিত ভারতের নব্য সংস্কারকদের ধর্ম্মকেই তিনি উচ্চতর হিন্দুত্ব মনে করিয়াছেন। সাধারণ ইংরেজ লেখকদেরও এইরূপ ধারণা। কারণ, তাঁহারা এই নব্য-তান্ত্রিকদের কথাই ভাল বুঝেন, প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্ম-তত্ত্বের মর্ম্ম তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। মিঃ আর্চ্চার মনে করেন যে "সংসারের নশ্বরত্ব, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির ভ্রান্ত সংস্কার ও শক্তিনাশক মনোবিজ্ঞানের উপর প্রাচীন শাস্ত্রাদির ভিত্তি। প্রাচীন শাস্ত্রমতে এই সংসার ক্ষণস্থায়ী, বিষয়নির্লিপ্ততাই শ্রেয়ঃ, অতীত ও ভবিষ্যতের

অনন্তকালের মধ্যে বর্ত্তমান সময় অতি অকিঞ্চিৎকর,—এই সমস্ত ধর্ম্মমত ইচ্ছাশক্তিজাত ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। ধর্ম্মমতের নামে ইহা শুধু কল্পনাই বিস্তার করিয়াছে। ইহার বিশ্বতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি ভিত্তিহীন চাতুর্য্যপূর্ণ অনুমানের সমষ্টি। আঁধারে হাতড়াইয়া তাহারা মনে করে যে দেখিতেছে। যাহা অনুমান করে, তাহাকে বলে জানিতেছে,—এইরূপ ভ্রান্তি ও ধর্ম্মহীন অভ্যাসেই ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে। ভারতের লোকেরা আধ্যাত্মিক দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ কোন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারে নাই; বরং তদ্বিপরীতই দেখা যায়। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকলেই যাহাতে বুদ্ধি-বৃত্তি হারায়, বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয় ও ধর্ম্মের গ্লানি করে কেবল তেমন শক্তিরই বিকাশ করিয়াছে। ভারতে উচ্চ চিন্তাশীল লোক হয় ত ছিলেন, কিন্তু ভারত তাঁহাদের চিন্তাশীলতা হইতে যুক্তিমূলক মহত্ত্বব্যঞ্জক ধর্ম্ম, এমন কি নৈতিক শক্তি লাভের উপযোগী ধর্ম্মও সংগ্রহ করে নাই।”

মিঃ আর্চ্চারের গ্রন্থে দেখা যাইতেছে, আদম সুমারীর কর্ম্মচারীরাও ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন! ১৯০১ ইংরেজী সনের আদম সুমারীর রিপোর্টে লিখা হইয়াছে যে “ভারতের ধর্ম্ম ভূত প্রেতের উপাসনা, তাহার সঙ্গে একটু দার্শনিকতা মিশ্রিত করা হইয়াছে মাত্র, অথবা আরো সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, ভোজবাজীর সঙ্গে একটু আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণই হিন্দুধর্ম্ম!”—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্? ইহাকেও মিঃ আর্চ্চার আনন্দের সহিত তাঁহার প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন!

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে মিঃ আর্চ্চারের অভিজ্ঞতা দেখুন:—তিনি লিখিয়াছেন, —হিন্দুত্বকে মানবতত্ত্বজ্ঞেরা ভূত-প্রেতের উপাসনাই বলেন।

“যে সমস্ত অস্বাভাবিক গল্প চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে তাহাই সাধারণ হিন্দু ধর্ম্ম।”

"বর্ব্বরতার স্তর ছাড়াইয়া যেসব জাতি উচ্চ স্তরে উঠিতেছে হিন্দুর ধর্ম্ম তাহাদের সকলের নিম্নে।"

"হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত তুলনায় রুষীয় বা স্পেনীয় চাষাদের ধর্ম্ম অনেকটা যুক্তিপূর্ণ ও উন্নত।"

"হিন্দুত্ব বলিতে যে প্রকৃতিকে বুঝায় তাহা অতি বিষাদপূর্ণ। অস্বাভাবিকতা ও অস্বাস্থ্যকরতার দিকেই তাহার গতি।"

"হিন্দুধর্ম্ম নৈতিক চরিত্রের সহায়ক নহে।"

"হিন্দুত্ব যদিও ধর্ম্মের অনেক কথা কহে নৈতিক শিক্ষা বিধানের কোন দাবী সে করে না।"

"পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অনেক পাপাচরণ হিন্দুদের মধ্যে নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য যে তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক এমন নহে, সেইরূপ পাপাচরণের অবসর তাহাদের ঘটে নাই, ইহাই তাহাদের নিষ্পাপ থাকার কারণ।"

"সত্য বটে ভারতবর্ষ অচিন্ত্যের চিন্তায় অতুলনীয় শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, যাহারা নিজের দেহকে পর্য্যন্ত চালনা করে না, ভক্তদের প্রদত্ত ভিক্ষায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের পক্ষে এ কার্য্য উপযুক্ত বটে।"

"ইহার দর্শনশাস্ত্র জীবনের কোন মূল্য আছে বলিয়া বলে না, এবং প্রকৃতির ভিতর কি আছে তাহার সন্ধান না করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতেই প্ররোচিত করে।"

"পদ্মাসনে বসিয়া নাভিমূলে ধ্যান করিতে করিতে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এমন কি সারাজীবন কাটাইয়া দেওয়া একমাত্র উষ্ণ দেশেই সম্ভব।"

"একমাত্র উষ্ণ দেশের লোকেরই মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে এইভাবে বিশ্বের প্রকৃতি ও গঠনপ্রণালীর সত্যতা নির্ণয় হইতে পারে।"

"ইহার মনোবিজ্ঞান শক্তিনাশক, ইচ্ছাশক্তিজাত ব্যক্তিত্বের বিনাশক। পরন্তু মনোবিজ্ঞান যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন তাহা মানুষের সৃষ্ট ও ভ্রান্তিপূর্ণ।"

"মনোবিজ্ঞানে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা বা তৎসম্বন্ধে বিচক্ষণতার সহিত বাদানুবাদ করিবার শক্তি থাকিলেই তাহা উচ্চ মানসী-শক্তির দ্যোতক হয় না।"

"যাহার গুরুত্ব পরীক্ষার কোন উপায় নাই তাহার মূল্যই বা কি ?"

"মনোবিজ্ঞানের ব্যাপার হইতেছে,—যাহা জানিবার উপায় নাই তাহাকে জানিবার চেষ্টা এবং যাহাকে চিন্তা করা যায় না তাহাকে চিন্তা করা।"

অবশেষে তিনি এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসায় কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ হইতে অগ্রণী এবং ভারতে সূক্ষ্ম চিন্তাশীল মহৎ লোকেরা জন্মগ্রহণও করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানে ভারতবর্ষ কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের উপর নির্ভর করিতে বলিয়া স্বয়ংই আবার তাহার দোষপ্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

"ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক শক্তি যে যে প্রকারে আত্মবিকাশ করিয়াছে, পাশ্চাত্য দেশ কেন চীন জাপানও ভারতের বহুপূর্ব্বে তত্তদ্বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে"।

"পাশ্চাত্য মানসী-প্রতিভা প্রাচ্য প্রতিভাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে"।

"নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যায় পাশ্চাত্য রাজ্য বহুব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, চিন্তারাজ্যে গভীর হইতে গভীরতর তলদেশ স্পর্শ করিয়াছে।"

"ভারতবাসীরা যে প্রকৃত সভ্যতা হইতে বহু দূরে তাহাদের প্রাত্যহিক

কার্য্যপ্রণালীই তাহার প্রমাণ। যেদিকে তাকাও সেই দিকেই ধর্ম্মের নামে তাহাদের উৎকট কাণ্ডগুলি দেখিতে পাইবে।"

"হিন্দুত্ব যুক্তিবিরোধী। সংক্ষেপে বলিতে পারি, ইহা বর্ত্তমান জগতের পক্ষে বিসদৃশ।"

"হিন্দুত্বের উপর যে কলুষরাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছে তিন হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তাহা বিধৌত হয় নাই। সত্য বটে অন্যান্য ধর্ম্মেও কলুষতা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ঐসব দূরীকরণের জন্য চেষ্টাও হইয়াছে, অন্ততঃ তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হইয়াছে। হিন্দুত্বের মলিনতা কিছুমাত্র ক্ষালন করা হয় নাই,—এমনই ভ্রমান্ধতাপূর্ণ যে কোনরূপ দোষ দূরীকরণের জন্য উহা প্রস্তুত নহে। দোষ ছাঁকিয়া পবিত্র হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাতে নিমজ্জিত থাকাই তাহার প্রবৃত্তি। তাহার এই প্রবৃত্তি জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় তাহাকে সর্ব্বনিম্নে স্থান দিয়াছে।"

"যে পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম তাহার দোষরাশি কোনরূপে ছাঁকিয়া ফেলিয়া পবিত্র হইতে না পারে সেই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ পৃথিবীর সভ্যজাতিসমূহের সমকক্ষ বলিয়া আদৃত হওয়ার জন্য কোনরূপ সঙ্গত দাবী করিতে পারে না।"

এই ভাবের সমালোচনা আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যায় অভিজ্ঞ কোন কোন লোকও মিঃ আর্চ্চারের সমর্থক আছেন। ডাক্তার এ, ই, গাফ উপনিষদকে বলিয়াছেন,—

"ইহা অসভ্য যুগের, অধঃপতিত জাতির ও অনুন্নত বর্ব্বর সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।"

"খৃশ্চানধর্ম্মের পুরাতন অব্যবহার্য্য 'প্রিস্ক্রিপ্টিভ সেক্রো' অপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব কিছুই নাই।"

"ইহাতে আধ্যাত্মিক বিষয় অতি সামান্যই আছে।"

"ভারতীয় শাস্ত্রসম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে ইউরোপের দৈনন্দিন ব্যাপার হইতে হীন ভাবের আলোচনা করিতে হয়।"

"হীন ভাবকে উচ্চ ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, ইহাই হইল গুরুতর অন্তরায়। ইংরেজী শব্দ মহার্ঘ্য ভাবরাজির প্রকাশক। ভারতীয় ভাবের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। তেমন চেষ্টা করিতে গেলে উচ্চকে নীচ করা হয়, এবং তৎকালের জন্য বর্ব্বর হইতে হয়।

ইঁহার মতে পাশ্চাত্য ডিক, টম্ বা হ্যারি প্রভৃতির দৈনন্দিন ব্যাপারে যে ভাব ব্যক্ত হয় তাহা হইতে ভারতীয় মহর্ষির পরমাশ্চর্য্য বাণী—'তত্ত্বমসি' অনেক নিম্নস্তরের ভাবব্যঞ্জক! জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক আরো এক ধাপ উপরে চড়িয়াছেন। তিনি আমার এক বিলাত প্রত্যাগত বন্ধুকে বলেন,—'ভারতীয় ধর্ম্ম ও মনোবিজ্ঞান লইয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিবেন না, কারণ ঐ সমস্তে কিছুই নাই।' ডাক্তার গাফ্ দেখিতে পাইয়াছেন যে ইহার ভাবসমূহ নিম্ন স্তরের, ইঁনি দেখিলেন যে ইহাতে মূল্যবান কিছুই নাই। তিনি আমার বন্ধুকে উপদেশ দিয়াছিলেন যেন অর্থ-বিজ্ঞানই ভালরূপে আলোচনা করেন, তাহাতেই তাঁহার আত্মার শান্তিলাভ ঘটিবে।

প্রাচ্যবিদ্যার অভিজ্ঞ কোন কোন লোকও যখন এই ভাবের অভিমত প্রকাশ করেন তখন বুঝা যায় তাঁহারা ভারত-সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ পান নাই; তাঁহারা যে বিপথগামী হইবেন তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। মিঃ প্রাইস্ কলিয়ার তাঁহার "প্রতীচ্যে প্রাচ্য" (The East in the West) গ্রন্থে সার হ্যারি জনষ্টন নামক এক ব্যক্তিকে ভারত-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ উঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—'হিন্দু ধর্ম্ম দুঃস্বপ্নের ন্যায়, বৃথা সময় নষ্টকারক, আবর্জ্জনামিশ্রিত পদার্থ বিশেষ, তদ্দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কেবল মানবসমাজের জীবন-সংগ্রামে অধিকতর ভারবৃদ্ধি করে মাত্র।·····যে পর্য্যন্ত ভারতের

২০ কোটী লোক এইরূপ মূঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস, অশ্রদ্ধেয় ও অনাবশ্যক উৎসবাদি এবং খাদ্যাখাদ্য বিচার লইয়া থাকিবে, অন্ততঃ সেই পর্য্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ জাতির স্বৈরাচারমূলক শাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অপর একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য কি ইংরেজের পক্ষে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য। যাহারা নয় আনা পয়সায় এক সপ্তাহ কাটায়, ১০ বৎসর বয়সে যাহাদের বিবাহ হয়, জাতি-ভেদের আচার ব্যবস্থার ফলে যাহারা সর্ব্বদা না হইলেও প্রায়ই অধঃপতিত অবস্থা হইতে মাথা তুলিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে যে কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে তাহাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়।" দেখা যাইতেছে টাকা পয়সাই ইঁহার নিকট মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। মিঃ হেরল্ড বেগ্‌বি তাঁহার "লাইট্ অব্ এসিয়া" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"হিন্দুত্ব বলিতে ভয়, অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার কুম্ভীপাকে হাবুডুবু খাওয়া। নৈতিক উপদেশের নামগন্ধও ইহাতে নাই। ইহাতে ঈশ্বর নাই, বাক্‌চু, ডন জুয়ান প্রভৃতির ন্যায় ঘোর মদ্যপায়ী লম্পটেরাই হিন্দুর দেবতা। ইহা নিতান্ত বৈষয়িক ও বালকোচিত কুসংস্কারপূর্ণ পাশবিক ধর্ম্ম, ইহা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ নহে, ঈশ্বর হইতে বহুদূরে স্থিত নরকেরই পথ। হিন্দুত্ব বুদ্ধিমান ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দেয়, তাহার মনকে তাহার স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ্টা করিয়া তোলে, বিফলতাই ইহার দীর্ঘজীবন লাভের কারণ।"

অধুনা যেসব প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাহাতে মূল্যবান বিষয় আছে বলিয়াও বলেন তাঁহাদিগকে ঐ শ্রেণীর খৃশ্চান লেখকেরা বিশ্বাসই করেন না। সে যাহা হউক্, খৃশ্চানধর্ম্মের প্রতি একবার ব্যতীত আর কখনো হিন্দুদিগকে এইরূপ উৎকটভাবে খৃশ্চানদের মনে বেদনাদায়ক আক্রমণ করিতে আমি দেখি নাই। তাহাও ফ্রান্সের এন্টিক্ল্যারিকেল সংবাদপত্রের

অনুকরণে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত একটি বিদ্রূপাত্মক সংবাদপত্রের ব্যাপার; অল্পদিন মাত্র সেই পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল। খৃশ্চানদের এই সমস্ত লেখা দেখিলে তাহারা কি ভাবে পরধর্ম্মের উপর আক্রমণ করে, আর বেদান্ত এবং গীতা অন্যান্য ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিবার জন্য কিরূপ উপদেশ দেন এই দুইয়ের পার্থক্য সুন্দররূপেই বুঝা যায়।

ভারতীয় শিল্পবিদ্যাসম্বন্ধে মিঃ আর্চ্চার লিখিয়াছেন,—"নানারূপ শিল্পকার্য্যে ভারতবাসীর বিচক্ষণতা দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা মানবের সর্ব্বোচ্চ শক্তিপ্রকাশক নহে; ইউরোপীয় শিল্পনৈপুণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত নহেই, তাহার সমানও নহে। বীরের লক্ষণ দেখাইতে ভারতীয়েরা সিংহের বা ব্যাঘ্রের বিশাল স্কন্ধ ও ক্ষীণ কটির উল্লেখ করে। অর্দ্ধ সভ্য লোকেরাই এইরূপ আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে; ভারতীয়েরা যখন এ যাবৎ সেই আদর্শ লইয়াই চলিতেছে তখন তাহারা সেই স্তর অতিক্রম করে নাই বলিলে কিছু অন্যায় হয় না!" *

প্রত্যেক বিষয়েই দেখান যাইতে পারে যে মিঃ আর্চ্চার তাঁহার নিজের উক্তিতেই নিজের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার প্রণালী ন্যায়ানুগ নহে, তাঁহার ভাবমোহেই তিনি পরিচালিত হইয়াছেন। সকল বিষয়ে ভারতের নিন্দার বহর শেষ করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন— "কলিকাতা বোম্বাই এবং অন্যান্য স্থানে এমন কতকগুলি সুশিক্ষিত পরিবার দেখিয়াছি, যাঁহাদের সঙ্গে মেলামেশায় নিজকে কৃতার্থ ও আনন্দিত

* এইরূপে হিন্দুর স্থপতিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি, সঙ্গীত, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও নাটকাদি, কিছুরই মধ্যে উচ্চভাবের কিছুই তিনি দেখিতে পান নাই। সমস্তকেই তিনি যথেচ্ছ ঘৃণিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধ এবং আকবর ব্যতীত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন লোকই ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই সমস্ত ঘৃণিত উক্তির অনুবাদ অনাবশ্যক। (অনুবাদক।)

বোধ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রাচীন আভিজাত্যানুরূপ সুমার্জ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলে নিজকে অর্দ্ধ বর্ব্বর বলিয়া মনে করিতে হয়।”—ঠিক কথা। এমন যে মিঃ আর্চ্চার, তিনিও স্বীকার করিতেছেন যে ভারতীয় সভ্যতার উচ্চ আদর্শের নিকট নিজকে অর্দ্ধ বর্ব্বর মনে করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয়দের গৃহে গিয়া তেমন কিছু মনে করেন না। তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য এই সুমার্জ্জিত আভিজাত্যানুরূপ সভ্যতা কোথা হইতে আসিল? যে প্রাচীন ভারতের কোন গৌরবের কথা মিঃ আর্চ্চার স্বীকার করেন না, উঁহারা সেই প্রাচীন ভারতীয় গৌরবেরই উত্তরাধিকারী নহেন কি? ইহা কি কখনো সম্ভব, যাহা মূলতঃ ধর্ম্মহীন বর্ব্বর, তাহা হইতে এমন কিছু জন্মিতে পারে যাহার সমক্ষে মিঃ আর্চ্চারকেও অবনত হইতে হইয়াছে? তিনি আরো লিখিয়াছেন—এই বর্ব্বরতার মধ্য হইতেই অতীতে তেমন বহু সহস্র লোক জন্মিয়াছেন। ইহা কি কখনো সম্ভব? কুবৃক্ষে কি কখনো উত্তম ফল ফলে? তবে কেন বলেন না,—বৃক্ষটা ভালই, ইদানীং ইহাতে আশানুরূপ ভাল ফল ফলে না। ইহার কারণ, হয়ত ইহা রোগাক্রান্ত হইয়াছে, অথবা উৎকৃষ্ট সার পাইতেছে না, কিম্বা বৃদ্ধত্বজনিত দুর্ব্বলতা আসিয়াছে।

উত্তর

(৮)

ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলে দুইটি সাধারণ বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথম,—অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও সকল রকমের লোক আছে। দ্বিতীয়,—ভারতীয়দের সাধারণ একটা বিশেষত্ব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বহু ধর্ম্মমত ও প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুত্ব বলিতে ভারতবাসীর ধর্ম্ম অপেক্ষা তাহাদের সভ্যতা আচার নীতি ইত্যাদিকেই বেশী বুঝায়। তাহা হইতেই কতকগুলি মূল ধর্ম্মমত ও দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়দের পরস্পরের মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে বলিয়া বলা হয়, বস্তুতঃ ততটা নয়। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা দেখাইতে পারেন যে যত রকমের সম্ভব তৎসমস্ত রকমের মানুষই ভারতে জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদী হইলেও চার্ব্বাক এবং লোকায়ত, বিষয়ভোগে প্রমত্ত কামুক, বেদ ও ব্রাহ্মণনিন্দুক, নিরীশ্বরবাদী, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' 'নীতির প্রচারকদেরও জন্মভূমি বটে। ভারত যেমন একদিকে স্ত্রীসংসর্গত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্মদাতা, তেমনই অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে কামচর্চ্চায়—কামশাস্ত্রে সুসিদ্ধ লোকেরও জন্মদাতা। এদেশে আদি-রসাত্মক সাহিত্য ও কামোদ্দীপক চিত্রাদিরও অভাব নাই। যে ভারতের সন্ন্যাসীরা সংসারত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসী হইয়াছেন, সেই ভারতের কলাবিদ্যানিপুণ গৃহীরা মনোরম সাজসজ্জায় সংসারকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। ভারতভূমি একদিকে ধ্যানযোগীদের, অন্যদিকে কর্ম্মকুশল

লোকদের জননী। কত বীরপুরুষ কত রাজনীতিজ্ঞ কত সুদক্ষ শাসন-কুশল লোক এইখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা বলেন যে এদেশে কখনো স্বায়ত্তশাসনপ্রথা ছিল না, তাঁহারা জানেন না যে কাহার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন। ফরাসী গ্রন্থকার এম বার্থলেমী সেণ্ট হিলেয়ার লিখিয়া গিয়াছেন,—(ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে) "সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্তশাসন-প্রথা ভারতে যতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি ততদূর করে নাই।" অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন,—"ভারতের স্বায়ত্তশাসন-প্রথা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সুপবিত্র, প্রাচীন সাম্প্রদায়িক প্রথানুসারে সুব্যবস্থিত। প্রত্যেক গ্রামে নায়ক পঞ্চায়ত ও অন্যান্য কর্ম্মচারী আছে। রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য এবং প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্যও সুনির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভোটদান ভোটসংগ্রহ ইত্যাদি পাশ্চাত্য প্রথা এদেশে ছিল না বলিয়া স্বায়ত্তশাসন কাহাকে বলে এদেশের লোকেরা জানিত না। এমন এক শ্রেণীর লেখকও আছেন যাঁহারা বলেন,—'ভারতবাসী স্বৈরাচারী রাজশাসনই চাহে। ইঁহারাও হিন্দুর মনোভাব ও ইতিহাসের তত্ত্ব অবগত নহেন। হিন্দু রাজারা স্বৈরাচারী ছিলেন না, যেমন প্রজার তেমনই রাজার ইচ্ছাও ধর্ম্মানুগত ছিল। প্রজারা যেমন রাজাকে ও তাঁহার উত্তম কার্য্যকে শ্রদ্ধা করিত, রাজাও তেমনই প্রজাকে ও তাহাদের উত্তম কার্য্যকে শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাচীন ভারতের স্বত্বসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অতি সুন্দর, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান স্বত্বসম্বন্ধীয় আইন হইতেও তাহা উৎকৃষ্ট। সার উইলিয়ম মার্কবির অভিমত এই যে ইংলণ্ডের স্বত্বসম্বন্ধীয় আইন হিন্দু আইনের আদর্শেই গঠিত হওয়া আবশ্যক। সুবিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ সার রাসবিহারী ঘোষ বলেন,—'হিন্দু আইন সততার ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতার আদর্শ'। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু যে শক্তি

প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্যান্য গৌরবান্বিত ব্যাপারসমূহেরই অনুযায়ী

ভারতে বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও ব্যবসায়ী ছিলেন। গ্রীক্ এবং রোমান সভ্যতার সময় হইতে অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপে ভারতের কারুকার্য্যময় শিল্পজাত দ্রব্যের সমাদর ছিল। তখনও ভারতের ঐশ্বর্য্যকাহিনী ইউরোপকে মুগ্ধ করিত। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা রোমের বহু স্বর্ণ লইয়া আসিত বলিয়া তথাকার ঐতিহাসিক প্লিনি কতই দুঃখ করিয়াছেন। ইংরেজ বিশেষজ্ঞেরা বলিতেন 'ভারতের সুচিক্কণ সূত্র পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' বিগত সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে যেসমস্ত পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রমশিল্প, কারুকার্য্য ও ব্যবসায় বাণিজ্যে হিন্দুদের বিচক্ষণতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ঐতিহাসিক মিঃ আলেক্‌জাণ্ডার ডাও লিখিয়াছেন 'মৃদু আবহাওয়া, উর্ব্বর ভূমি ও হিন্দুর স্বাভাবিক শিল্প-নৈপুণ্যগুণে বঙ্গদেশ ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।' ঐতিহাসিক ওর্ম্মি লিখিয়াছেন 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ব্যবসাবাণিজ্য প্রবল ছিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের আমদানীর বিরুদ্ধে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়, ফলে তৎসমস্তের উপর আমদানী শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য কেহ যেন ব্যবহার না করে ১৭০০ সনে তেমন এক আইন পাশ হয়। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বনে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তদবধি ইংলণ্ড ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যই লইয়া যাইতেছে।

গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চায় ভারত চিরপ্রসিদ্ধ হইলেও বহির্জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসায়ও ভারতবাসী অনভিজ্ঞ ছিলেন না, অবশ্য সেই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় সাফল্য তাঁহারা লাভ করেন নাই।

না। মিঃ আর্চ্চারের ধারণা এই যে ইংরেজ গুরুরা হিন্দুদিগকে যাহা শিক্ষা দিতেছেন উহারা কেবলমাত্র তাহাই শিখিতেছে। ইহা ঠিক নহে। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতিই যে জ্ঞানলাভের সুনিশ্চিত উপায় হিন্দুরা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে তাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুরাই সূক্ষ্ম বিচারনৈপুণ্যপূর্ণ ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। কার্য্যকরী বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেও হিন্দুরা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের চর্চ্চায় এসিয়া হইতে কিছুমাত্র অগ্রবর্ত্তী ছিল না, এই তিন শত বৎসরেই ইউরোপ বিজ্ঞানের চর্চ্চায় বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এতদ্বিষয়ে অত্যধিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং নব্য প্রতীচী (ইউরো-মেরিকা) সমগ্র জগতের রাজনীতি সমাজনীতি বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদিতে প্রাচীর উপরে উঠিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করে। কিন্তু আমরা যদি মধ্য যুগের গ্রীক্, গ্রীকো-রোমান, সারাসেন, চীন ও ইউরোপের সহিত তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই ভারতের হিন্দুরা বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাসম্বন্ধেও কম উন্নতি করিয়াছিলেন না, বরং অনেক বিষয়ে বেশী করিয়াছিলেন। হিন্দুদের নিকটে গ্রীকেরা যে বৈজ্ঞানিক তথ্য লাভ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা তাহাই সুপ্রতিষ্ঠ করিতে যাইতেছেন। গণিত, রসায়ন-শাস্ত্র এবং ঔষধাদির জন্য সারাসেনদের প্রশংসা করা হয়, বস্তুতঃ তৎসমস্তই হিন্দুদের। হিন্দুরা কোন কোন বিষয়ে গ্রীকদিগের নিকট ঋণী, যেমন খগোলবিজ্ঞান। বরাহমিহির খগোলবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বিষয় গ্রীক্-দিগের নিকটে অবগত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার দেখাইয়াছেন যে বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রে হিন্দুরা যে শুধু গ্রীক্জাতি হইতে অগ্রবর্ত্তী ছিলেন এমন নহে, ইউরোপীয়েরা ১৬শ, ১৭শ এবং

১৮শ শতাব্দীতে যেসমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন, হিন্দুরা বহু পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক হ্যাঙ্কেল তাঁহার গণিতের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "ভারতীয় গণিতশাস্ত্র আমাদের বর্ত্তমান বিজ্ঞানে পর্য্যন্ত কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" ডাক্তার মর্গান বলেন,—"আমরা বর্ত্তমানে যে গণিত ব্যবহার করি তাহা ভারতেরই।" সংখ্যা এবং দশমিকের আবিষ্কারক হিন্দুরাই। বীজ-গণিতকে আরবীয়েরা 'এল্‌জেব্‌রা' নামে প্রকাশ করেন, তাহাও হিন্দুদের। জ্যামিতিও হিন্দুদের আবিষ্কৃত, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বৌধায়ন, আপস্তম্ভ এবং ভাস্কর প্রভৃতির প্রাচীন গ্রন্থে তাহার বিবরণ দেখা যায়। ত্রিকোণমিতির আবিষ্কারকও হিন্দুরা। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকুমার শীল বলেন, "ইউরোপীয়দের বহুপূর্ব্বে বাচস্পতি জ্যামিতির এবং নিউটনের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য Differential Calculus নামক উচ্চ গণিতের আবিষ্কার এবং জ্যোতিষসম্বন্ধীয় গণনায় তাহার ব্যবহার করেন। সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহসমূহের গতি, পৃথিবীর গতি ও মাধ্যাকর্ষণ এবং পতনশীল বস্তুর বিবৃদ্ধগতির নিয়ম ইত্যাদিও হিন্দু বৈজ্ঞানিকেরাই বহু পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক সরকার বলেন,—"আধুনিক নীতি অনুসারে স্থৈরজগতের মূল তথ্য আবিষ্কারে অন্যান্য জাতির ন্যায় হিন্দুরাও হয়ত বিফল হইতে পারেন, কিন্তু ভৈষজ্য-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শরীরব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা, ধাতবদ্রব্য-বিশ্লেষণ, চিকিৎসাকৌশল, প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা সমধিক সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন,—হিন্দুর মানসী-শক্তি স্বাধীনভাবে বাহ্য বস্তুর গুণগ্রহণের পরিচয় দিয়াছে, তৎসমস্তের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপায়ও নির্ণয় করিয়াছেন, ন্যায়ানুগ

তথ্য বিশ্লেষণের ও সত্য নির্দ্ধারণের কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, বহির্জগতের গুপ্তরহস্য নির্ণয়ের জন্য তদুপরি শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, প্রকৃতিরাজ্য হইতেও এমন তথ্য নিষ্কাশিত করিয়াছেন যাহার উপর বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি গ্রথিত হইয়াছে।"—মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা সফলতা লাভ করেন নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। মিঃ আর্চ্চারের ন্যায় যদি কেহ মনে করেন যে হিন্দুরা শুধু নাভিচক্রে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াই সুদীর্ঘ কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহা আরো অধিক ভ্রমাত্মক হইবে।

স্থূলতঃ বলা যায় ভারতবর্ষে মহোচ্চ গুণসম্পন্ন শক্তিমান অনেক পুরুষ ও নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যেমন অন্যান্য দেশে তেমন এদেশেও দস্যু তস্কর পাপী এবং সাধারণ লোকও আছে। মানবরাজ্যে সাধারণ লোকের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং যাঁহারা ভারতের বিরুদ্ধে লিখিতে চাহেন তাঁহাদের বক্তব্য যেন দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক যথাযথ প্রকাশ করা হয় তাহা দেখা উচিত। যাঁহারা প্রশংসা করেন তাঁহাদেরও উচিত অতিশয়োক্তি না করা। এই বহি লিখিবার পূর্ব্বে এক স্থলে পড়িয়াছিলাম,—"হিন্দুর নিকট অতীতও নাই, ভবিষ্যৎও নাই। হিন্দু সর্ব্বদাই তাঁহার ভগবানে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তিনি জানেন যে এই বিশ্বও সর্ব্বদা ভগবানে অবস্থিতি করে।"—এই ভাবের লেখা পড়িয়া কেহ হয়ত মনে করিবেন যে প্রত্যেক হিন্দু সর্ব্বদা ঐভাবে ভগবচ্চিন্তারত থাকে। এইরূপ লেখা যেমন অসঙ্গত, তেমনই ইহা ভারতবাসীকে অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ করে। ভারতীয় সভ্যতার সাধারণ প্রকৃতি আধ্যাত্মিক, ইহা বলিলে বুঝায় না যে প্রত্যেক হিন্দু ভগবদ্গতপ্রাণ। যেমন অন্যত্র তেমনই ভারতে মানবসমাজের অধিকাংশ পুরুষ ও নারী সাধারণধর্ম্মী। তাহারা

সর্ব্বত্রই সংসারের ভাবনা যন্ত্রণা লইয়া কালযাপন করে; তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা তাঁহাদের জাতির মহাপুরুষদের উচ্চ ভাবানুযায়ী যথাশক্তি ধ্যানধারণা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কতকগুলি লোক বিষয়াসক্ত, সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, ইউরোপেও তেমন এক শ্রেণী আছে। এদেশের সাধারণ লোকেরা খাদ্যাভাবে ও অন্যান্য কারণে দুর্ব্বল বলিয়া পাশ্চাত্য লোকদের মতন বৈষয়িক উন্নতিসাধনে তেমন উদ্যমশীলতা দেখাইতে পারে না। কাঙ্গালেরা ত পেটের দায়ে 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়াই ব্যাকুল। মধ্যশ্রেণীর দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িতেছে; তাহারা একদিকে অন্ননির্ব্বাহের, অন্যদিকে সন্তানদের শিক্ষা ও কন্যাদের বিবাহ কিরূপে দিবে সেই চিন্তাতেই অস্থির। তাহারা তাহাদের সুখশান্তিপূর্ণ অতীতের দিকে চাহিয়া হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে, বর্ত্তমান তাহাদের যন্ত্রণাপূর্ণ, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কেহ আশান্বিত, কেহ শঙ্কিত। কাহারো আত্মনিষ্ঠা আছে, কেহ তাহা হারাইয়াছে। ধনীরা কেবল নিজের ভোগবিলাস ও গবর্ণমেণ্টের কাছে সম্মান লাভের জন্যই ঘুরিয়া বেড়ায়, দেশের ভালমন্দের দিকে দৃক্‌পাতও করে না। ধর্ম্মবিশ্বাসী কেহ নিয়তিকে শিরোধার্য্য করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন; কেহ ভাবিতেছেন ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের দুঃখের দিন কাটিয়া যাইবে। কেহ কেহ প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ আছেন যাঁহাদের সাত্ত্বিক জীবনাদর্শ জাতির প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিতেছে। ভারতবর্ষের মূল আদর্শ ও ভারতবাসীর মধ্যে—বিশেষতঃ বর্ত্তমানে যখন ভারতের বহুলোক তাহাদের জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তখন তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা বরাবরই স্মরণ রাখিতে হইবে।

বিভিন্ন স্তরের মানবসমূহের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ধর্ম্মমত ও প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূরিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যখন ভারতীয় ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করি—কোন্ রকমের ধর্ম্ম তাঁহাদের লক্ষ্য? যাঁহারা নিজের মত ব্যতীত অন্য কিছুই ভাল মনে করেন না, এবং অন্যের যাহা কিছু তৎসমস্তকে নিন্দা করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসেন তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়াই উচিত। অপরেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বিব্রত হইবেন। যাঁহারা নিন্দা করিবার জন্য আসিবেন তাঁহারা সকল রকমের ধর্ম্মকেই দোষপূর্ণ মনে করিবেন। তথাকথিত 'প্যান্থিষ্টদের (যাঁহারা সকলই ঈশ্বরময় বলিয়া বিশ্বাস করেন) সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন—'ইহারা সৃষ্টিছাড়া।'—একেশ্বরবাদীদের সম্বন্ধে বলিবেন—"ইহাদের ধ্যান ধারণা সবই বাড়াবাড়ি।' বৌদ্ধধর্ম্মকে বলিবেন 'নিরীশ্বরবাদ।' অদ্বৈতবাদীদিগকে বলিবেন 'ইহারা সত্যের প্রতি উদাসীন।' যাঁহারা সাম্প্রদায়িক তাঁহাদিগকে বলিবেন 'ইহাদের ধর্ম্ম গোঁড়ামী।' ভারতীয় স্থপতি শিল্পকে বলিবেন 'দানবোচিত বিকটাকার।' ইহার চিত্রশিল্পকে বলিবেন,—'নগণ্য।' সীতাকে বলিবেন 'চরিত্রহীনা'। রামকে বলিবেন 'অপ্রাকৃতিক সাধু!'—ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ সমালোচকদের মনোভাব এই যে তাঁহাদের নিজের মতের সহিত যাহা মিলিবে না তাহা ভালই হইতে পারে না। কৃষ্ণাঙ্গ জাতিসমূহের—বিশেষতঃ যাহারা পরাধীন, তাহাদের ধর্ম্মমত ও সামাজিক রীতিনীতি শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা হীন হইবেই। তাহা না হইলে তাহাদের উপর শ্বেতাঙ্গেরা আধিপত্য করে কেন? অধীন জাতির সভ্যতা শ্রেষ্ঠ হয় কিরূপে? অধীন জাতির ধর্ম্মে যদি তাহার উন্নতি-সাধনের নৈতিক শক্তি থাকিত তবে ভারতবাসী পরাধীন হইল কেন? এই প্রকৃতির বিরুদ্ধ সমালোচকেরা ভারতের নিন্দা করিতে গিয়া বলেন, ভারতের ধর্ম্ম; ভারতের দর্শনশাস্ত্র, ভারতের রীতিনীতি সমস্তই এক ভাবের। আবার রাজনীতি এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে নিন্দা করিতে গিয়া বলেন,—একের সহিত

অপরের কোন মিল নাই, সবই হ য ব র ল'। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন —'হিন্দুত্ব কাহাকে বলে?' এমন একটা নির্দ্দিষ্ট কিছু নাই যাহাকে হিন্দুত্ব বলা যাইতে পারে। হিন্দু একটা জাতি নহে, বিভিন্ন জাতির বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ সংমিশ্রণ। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন,—নিরীশ্বরবাদীর সহিত ঈশ্বরবিশ্বাসীর, অদ্বৈতবাদীর সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর ও দ্বৈতবাদীর, পুতুল-পূজকদের সহিত জ্যোতির্ব্বিন্দুধ্যানকারীদের, যেই প্রথায় পূর্ব্বে নরহত্যা পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এখনও পশুহত্যা প্রচলিত আছে তাহার সহিত যাহারা 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' বলিয়া সর্ব্বজীবে ভগবদ্দর্শনের কথা বলে তাহার; যাহারা ত্রিশকোটী দেবতার উপাসনা করে তাহাদের সহিত যে সমস্ত যোগী অপৌরুষেয় পরমাত্মার ধ্যান করে তাহাদের এবং যাহারা জাতিভেদও সম্প্রদায় ভেদের গোঁড়া তাহাদের সহিত যাহারা জাতিভেদ মানে না তাহাদের মিল কিরূপে সম্ভব? এই শ্রেণীর বৈদেশিক সমালোচকেরা মনে করেন যে বহু ধর্ম্মমত ও আচারপদ্ধতি ভারতবর্ষকে জঙ্গলে পরিণত করিয়াছে, ইহাতে প্রবেশের কোন পথই নাই। বস্তুতঃ পথ আছে, এবং তাহা একই। যাঁহারা তাহা দেখেন নাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য, যাহাদের সম্বন্ধে তাঁ াদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই তাহাদের এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া ঐরূপ সমালোচনা না করা। তাহাতেই তাঁহাদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা পাইতে পারে। আমি দেখাইব যে ভারতে আধ্যাত্মিক ঐকমত্য আছে, তাহার বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মূল একই। তাহার বিভিন্ন স্তরের মানবসমূহ অধিকার ও মনের বৃত্তি অনুসারে অতি সুন্দররূপে বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও আচার পদ্ধতি পালন করিতেছে। একটি অতি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই,—যে মূল হইতে এই সকল নানা মত ও নানা প্রথার উদ্ভব হইয়াছে সেইগুলির পরিবর্ত্তন ঘটিলেও সেই মূল অবিকৃত থাকিবে।

এইরূপ সমালোচনার উত্তরদানকালে আমি যে 'ভারতের' কথা

বলি তাহার স্বরূপ কি পাঠকদের জানিয়া রাখা ভাল। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাবিষয়ে অভিজ্ঞতা ও অতীত ব্যাপারের গবেষণার ফলে এবং তাহার বহু বৈচিত্র্য দর্শনে ভারতশক্তির প্রভাব সম্বন্ধে যে একটা ধারণা জন্মে তাহাই আমার লক্ষ্য। বিশ্বশক্তির আত্মপ্রভাবে তাঁহারই মনোময় কোষ হইতে যাবতীয় বৈচিত্র্যসমন্বিত যে একটা চৈতন্য সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহাই এই ভারতশক্তি। উহার কারণ ও কার্য্য উভয়ই এক ভারত শক্তিরূপে প্রকটিত। লোক বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষ ভালই হউক বা মন্দই হউক তাহারা এক এক রূপে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে, কেহ ইহার প্রতি অবিশ্বাসীও হইয়াছে।

মিঃ আর্চ্চার ও তজ্জাতীয় সমালোচকেরা ভারতসম্বন্ধে যেসমস্ত ভুল করেন তন্মধ্যে একটি এই :—ভারতীয় সভ্যতার মূল উপাদান এবং তদুপরি যেসকল উপরাবরণ আসিয়া পড়িয়াছে বা তদ্বিরুদ্ধ অধিমাংসের মতন জন্মিয়াছে এই দুইয়ের পার্থক্য দেখেন না। ভারতীয় ধর্ম্মবৃক্ষ বহু প্রাচীন, সুতরাং ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এই সুদীর্ঘ যুগযুগান্তের প্রবাহে ইহার মূল কাণ্ডের উপর পরগাছাও জন্মিয়াছে। মিঃ আর্চ্চার প্রভৃতি যদি এই উপসর্গগুলির সমালোচনা করিতেন, তবে সেই সমালোচনা সমীচীন হইত, এবং যথার্থ উপদেশও দান করিতে পারিতেন। কিন্তু মিঃ আর্চ্চার ঠিক বিপরীত পন্থা ধরিয়াছেন। তিনি ভারত-সভ্যতার মূল নীতির উপর আক্রমণ করিয়াছেন, অথচ সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি অল্প। ভারতীয় সভ্যতার মূল নীতি এবং যাহা তজ্জাত নহে, পরন্তু লোকের দুর্ব্বলতা বা পাপ হইতে উৎপন্ন,—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কতদূর তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ভারতের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের বিষয়ও আছে, কিন্তু সেরূপ অভিযোগ করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। ভারতীয় সভ্যতার বিশুদ্ধ উপাদানগুলি বিন্যস্ত করিয়া বর্ত্তমানে সেইগুলির বিপরীত

আচরণের ফলে কতিপয় ভারতবাসী কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছে, এবং কিরূপে এদেশের উন্নতিতে বাধা পড়িয়াছে অনায়াসে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। মিঃ আর্চ্চার প্রভৃতিও বলেন যে এদেশের উন্নতিতে বাধা পড়িয়াছে, কিন্তু কি কারণে ও কিরূপে পড়িয়াছে তাহার অনুসন্ধান তাঁহারা করেন না। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে বৌদ্ধ যুগে জাতি-ভেদের শৈথিল্য ঘটায় অবিচারিত ভাবে নানাজাতি মিশ্রিত হইয়া বিশুদ্ধ আর্য্যসভ্যতার প্রভাব হ্রাস করিয়াছে, তাহাই ভারতের বর্ত্তমান অধঃপাতের মূল এবং তাহাই ইহার উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

ভারতসভ্যতার মূল তত্ত্বসমূহ সুপ্রতিষ্ঠ হউক বা না হউক, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল তত্ত্ব হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও তাহার ভিত্তি খুঁজিতেছে। এই সব বিষয়ে মানুষের অভিমত বিভিন্ন হইবেই। রাব্দুল মুছন্দার সত্যই বলিয়াছেন,—মতভেদ বিধাতারই দান। মতভেদ ঘটিলেই অন্যের নীতিকে নিকৃষ্ট বা বর্ব্বরোচিত বলিবার কারণ নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে, তজ্জন্য প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে নিকৃষ্ট এমন বলা যায় না। বস্তুতঃ ভারতই যে সত্য পথে চলিয়া আসিতেছিল, ভবিষ্যৎ তাহাই প্রমাণ করিবে না, ইহা কে বলিতে পারেন ? আমি সাধারণ নীতিসমূহের কথাই বলিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিগত শতাব্দীতে যেসমস্ত নীতি প্রচার করিয়াছে তাহার একটিও সুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, এখনও তাহাদের পরীক্ষা চলিতেছে। ইতিমধ্যে এক যুদ্ধক্ষেত্রের কামানোদ্গীরিত ধূম্ররাশির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অতীত নীতিসমূহ বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

মিঃ আর্চ্চার সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী বিষয়সমূহকেও ধর্ম্মের সহিত মিশাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে হয়ত কোনটার সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রবই নাই, কোনটা ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রোজনীয়, কোনটা হয়ত

আধুনিক উদ্ভূত, কোন বিষয় হয়ত শাস্ত্রে একরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, লোকে না বুঝিয়া তাহার অপব্যবহার করে। আর্চ্চার শিশু কন্যাহত্যা ও সতীদাহের উল্লেখ করিয়া ভারতের নিন্দা করিয়াছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে কোথাও হয়ত কেহ শিশু কন্যাকে হত্যা করিত; সর্ব্বত্র তেমন হইত না। পরন্তু অন্যান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহা বিশেষভাবে নিন্দিত। সেইরূপ নিন্দাবাদ চীনদের বিরুদ্ধেও প্রচলিত আছে; চীনদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ঐ নিন্দাবাদকে খৃশ্চান মিশনারীরা প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক গাইল্‌স্‌ তাঁহার "চাইনিজ সিবিলাইজেসন" নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, কোথাও কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক হয়ত তেমন কিছু করিয়া থাকিবে, ঐরূপ কোন প্রথা তথায় প্রচলিত নাই। যখন এইরূপ মিথ্যাপবাদ রাজনৈতিক স্বার্থে ও ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে তখন তাহা সহজে পরিত্যক্ত হয় না। এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন যে মুসলমান ধর্ম্মমতে নারীদের আত্মা নাই। সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস, ভারতের সতীরা স্বেচ্ছায় মৃত পতির চিতায় আত্মাহুতি দিতেন না, বিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক অথবা অহিফেনাদি খাওয়াইয়া অজ্ঞান করত জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হইত, উহা এমনই হৃদয়হীন বর্ব্বরের কাণ্ড! বস্তুত এইরূপ নারীহত্যা হিন্দুর শাস্ত্র কখনো সমর্থন করেন না। 'মহানির্ব্বাণতন্ত্র' নারীজাতিকে বিশ্বজননীর অংশরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; বলপূর্ব্বক নারীকে দাহ করিলে নরকই তাহার জন্য ব্যবস্থা। আমি নিজেই এক শিশুহত্যার বিচার করিয়াছি; কিন্তু তাহাকে প্রচলিত প্রথা বলিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাই নাই। এইরূপ দোষারোপ নিতান্তই অসততার পরিচায়ক।

সমুদ্র-যাত্রা কোন কোন পণ্ডিতের মতে নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু মূল ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। প্রাচীনকালে ভারতের বণিকেরা

এবং নাবিকেরা সমুদ্র অতিক্রম করত বহু দেশদেশান্তরে যাইতেন। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে অল্পদিন। সম্ভবতঃ ভারতবাসী যাহাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া না যায় এবং বিজাতীয় প্রভাবে কলুষিত না হয় এই উদ্দেশ্যেই তাহা করা হইয়াছে। ইদানীং সেই নিষিদ্ধতা অনেকটা শিথিল হইয়াছে। নারীদিগকে পর্দ্দায় ঘেড়িয়া রাখার সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই। ভারতের কোন কোন অংশে পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত আছে বটে, তাহাও উচ্চ শ্রেণীতে। মুসলমান রাজন্যবর্গের পারিবারিক প্রথা হইতে ইহা অনুকরণ করা হইয়াছিল; এখনও তাহা সম্ভ্রমসূচক মনে করিয়াই রক্ষিত হইতেছে। অন্যদিকে কি দেখিতে পাই? ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের অনুকরণে একদল ভারতবাসী মদ্যপান ধরিয়াছে, ইংরেজ সাজিতেছে, তাহারা দেশীয় পোষাক ছাড়িয়াছে, ইংরেজ ফ্যাসনে ক্লাব করিয়া সেখানে ইংরেজী পোষাক লইয়া যায় এবং দেশীয় জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র থাকে। এই শ্রেণীর একজন ভারতীয় কোন এক ইংরেজকে বলিয়াছিল যে সে উচ্চ শ্রেণীর একজন (belonged to the upper ten)। এই সব ইতর অনুকরণপ্রিয়তা ভারতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে ভারতীয় নারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই বলা হয়; বর্ত্তমানে যে প্রণালীর শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, ইংলণ্ডেও নারীদিগকে সে প্রণালীর শিক্ষা অল্পদিন পূর্ব্বেও দেওয়া হইত না। পাশ্চাত্য দেশে নারীদের অধিকার কত খর্ব্ব ছিল বা তাঁহারা কিরূপ হেয় বিবেচিত হইতেন তাহার সুদীর্ঘ কাহিনী, বর্ণনার অবকাশ নাই। হিব্রুদের সময়ে তথায় নারীরা নিম্ন স্তরের জীব বলিয়া বিবেচিত হইতেন। মিসেস্ কেডী ষ্টেণ্টন লিখিয়াছেন, "খৃশ্চান শাস্ত্র এবং রাজকীয় ব্যবস্থা শিক্ষা দিত যে নারীরা পুরুষের পরে, পুরুষের জন্যই সৃষ্ট; তাহারা পুরুষের নিম্ন স্তরের এবং পুরুষের অধীন প্রাণী।"

সেণ্ট পল এবং সুবিখ্যাত খৃশ্চান ধর্ম্মযাজকগণ বলিয়াছেন স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা হীন এবং পুরুষের অধীন। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে এবং বিবাহপ্রথাকে কিরূপ ঘৃণা করিতেন তাহা সর্ব্বত্র বিদিত। সেণ্ট অগষ্টাইন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'স্ত্রীজাতির সৃষ্টিরই বা কি প্রয়োজন ছিল?' খ্যাতনামা ধর্ম্মযাজকেরা বলিয়াছেন,—"স্ত্রীজাতিই যত পাপের মূল; আদমের দেহের একটি হাড় হইতে তাহার সৃষ্টি, তাঁহার আত্মার কোন অংশ স্ত্রীজাতিতে নাই।" - "রাত্রে একাকী ঘুমাইতে যাহারা ভয় পায় বিবাহের প্রয়োজন তাহাদেরই"—ইত্যাদি। ইউরোপে ফিউ-ডেল্‌দের শাসনকালে আইনকানুনের ব্যবস্থায় স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত হেয় করা হইত। মিঃ লেকী লিখিয়াছেন,—"খৃশ্চানধর্ম্ম স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য নির্ণয় করিয়াছে বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পৌত্তালিকদের অপেক্ষা খৃশ্চানদের বিধিব্যবস্থায় স্ত্রীজাতিকে অনেক নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে।" এম লিগুব লিখিয়াছেন,—"ফিউডেল্ শাসনে দাম্পত্য নীতি পশুত্বে পরিণত হইয়াছিল।"—ইউরোপের প্রাচীন কাহিনী তুলিবার প্রয়োজন নাই, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সাধারণ আইন কি ছিল মিসেস কেডী ষ্টেণ্টন তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেই দেখা যায় স্ত্রীজাতিকে নিম্ন স্তরে রাখা হইয়াছিল। স্ত্রীজাতিকে নিজের সম্পত্তি বা দেহরক্ষার অধিকার পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল না, নৈতিক এবং আর্থিক হিসাবে বরাবর তাহাকে স্বামীর অধীন রাখা হইয়াছিল। এই সেই দিন (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) জন ষ্টুয়ার্ট মিল 'স্ত্রী জাতির অধীনতা' সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। মাত্র গত ২৫ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকার স্থাপনের চেষ্টা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে। মনে হয়, এই সংগ্রামে স্ত্রীজাতি দু'এক দিন মাত্র পূর্ব্বে জয়লাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীজাতির শিক্ষা সবে আরম্ভ

হইয়াছে। ভারতেও পুরাকালে যাহাই থাকুক, এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন করা হয়। স্ত্রী যে পুরুষ অপেক্ষা হীন তাহাও ঘোষিত হইয়াছে। সাধারণতঃ কন্যাজন্ম দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। পুরুষের অধীনেই তাহার স্থান। যদিও বেদের কোন সূক্ত নারীকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তথাপি বেদপাঠ স্ত্রী শূদ্র উভয়েরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতি যে পুরুষের সমান নহে, হীন, এই দুর্নীতি অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু অপর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও এমন কথা আমি পাই নাই যাহা খৃশ্চান ধর্ম্মযাজকদের নিন্দাবাদের সমতুল্য হইতে পারে। অবশ্য কেহ কেহ স্ত্রীজাতিকে মলমূত্রাদির আধাররূপে বর্ণনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যোণিসম্পর্ক ত্যাগ করিতেই বলিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে কি দেখিতে পাই ?—স্ত্রীজাতির, বিবাহের ও মাতৃত্বের অর্চ্চনাসূচক বহু স্তোত্র আছে; হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রে স্ত্রীধন নির্দ্দিষ্ট আছে। শাক্ততন্ত্রে স্ত্রীজাতিকে জগজ্জননী ভগবতীর পার্থিব প্রতিমূর্ত্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন,—স্ত্রীজাতির কোনরূপ ক্ষতি যেন করা না হয়, তাঁহাদের প্রতি যেন কেহ কটূক্তি প্রয়োগ না করে, স্ত্রীজাতিকে যেন সর্ব্বদা সম্মান করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গকে পূত দৈবানুষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে। অবশ্য অপপ্রয়োগের ফলে তাহারও যে অপব্যবহার হয় নাই এমন নহে। ভারতের পুরাবৃত্তে গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বহু নারী শিক্ষায়, শাসনৈপুণ্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বপ্রদর্শনে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নহেন এমন অনেক মহিলাও নানাদিকে শক্তিপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, কিছুকাল যাবৎ ভারতের স্ত্রীলোকেরাও যে তাঁহাদের অধিকার এবং প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারেন নাই তাহা সত্য, কিন্তু তজ্জন্য বলা যায় না যে ভারতীয় নারীরা সভ্যতা ভদ্রতায়

পশ্চাৎপদ। ভারতের কৃষকেরা যেমন তাহাদের রমণীরাও তেমনই উপযুক্ত। সার জর্জ বার্ড উড লিখিয়াছেন, 'ভারতের কৃষকেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।' মিঃ জি কে চেষ্টার্টন রুশীয় কৃষকদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, ভারতীয় কৃষকদের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। ইহারা আধুনিক বিজ্ঞানের, কলকৌশলের ও ব্যবসায় বুদ্ধির কোন ধার ধারে না, সামান্য বস্ত্রখণ্ডে লজ্জা নিবারণ করে, পুরাতন ধরণের লাঙ্গলদ্বারা ভূমিকর্ষণ করে, তাহাদের জমিটুকু এবং কঠোর জীবন যাপনের সৎসাহস ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন সম্বল নাই। কিন্তু তাহারা প্রকৃত সভ্য, তাহাদের শক্তি অনুসারে তাহাদের জাতীয় উচ্চ সভ্যতার ধারা তাহারা লাভ করিয়াছে। সুশিক্ষা এবং আক্ষরিক বিদ্যা এক কথা নহে। ভারতীয় রমণীদিগকে সুশিক্ষা দিতে কাহারো আপত্তি নাই, কিন্তু কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহাই বিচার্য্য। ইংলণ্ডে সাফ্রেজ আন্দোলনের সময় তদ্বিরুদ্ধবাদীদের এবং এখনো ইউরোপের অধিকাংশ লোকের যেইরূপ ভারতবর্ষেও সাধারণতঃ সেইরূপ মতই প্রচলিত। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে রমণীদিগকে আত্মোন্নতির সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতির উপরই আমার অধিক বিশ্বাস। কিন্তু পূর্ব্বে পুরুষ ও নারীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থার পার্থক্য অনুসারে শিক্ষার যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল তদপেক্ষা আধুনিক নিয়মে পুরুষ ও নারীকে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা শ্রেষ্ঠ কি না এখনও বলা যায় না। স্ত্রীজাতির অধিকারের কথা বা তাঁহারা পুরুষ হইতে হেয় কি না তেমন কথা ইহাতে আসে না, প্রশ্ন হইতেছে তাঁহাদের কিরূপ শিক্ষা পাওয়া উচিত। শাক্তদের ন্যায় আমরাও যতদিন নারীজাতিকে প্রত্যক্ষ ভগবতী বলিয়া বিশ্বাস করিব, এবং তদনুসারে চলিব, ততদিন আমাদের আচরণে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না, নারীজাতির কোনরূপ অমঙ্গলও আমাদের দ্বারা ঘটিবে না।

তৃতীয় প্রকারের আক্রমণ হইতেছে জাতিভেদ ও বিবাহপ্রথার উপর। বিবাহ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা সেইসব পাঠ করিতে পারেন। বাল্যবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধতা যে ভাবে চলিতেছে শাস্ত্রানুসারে তাহা সমর্থন করা যায় কি না তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। যে পর্য্যন্ত তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা না হয় সেই পর্য্যন্ত যেসমস্ত ব্যভিচার ঘটিয়াছে তজ্জন্য ভারতীয় সভ্যতার মূল নীতির উপর দোষারোপ করা চলে না। বাল্যবিবাহের অপব্যবহার ঘটিয়াছে, ইদানীং বিবাহের বয়সবৃদ্ধির ঝোঁক্‌ আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মতানুসারে তাহাও অল্পবয়স বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কারণ সেখানে বিবাহের বয়স ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত ইংলণ্ডের আইন অনুসারে এখনও তথায় ১২ বৎসর বয়সেই বালিকাদের বিবাহ হইতে পারে; পূর্ব্বে তথায় আরো কম বয়সেই তাহাদের বিবাহ হইত। ইউরোপের তুলনায় ভারতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বালিকাদের যৌবনোদ্গম হয়। এবং হিন্দুরা জাতিকে সুদৃঢ় রাখিবার ও যেসমস্ত যৌন ব্যভিচার পাশ্চাত্যদেশের পুরুষদের ভিতর আছে এবং বর্ত্তমানে নারীদের ভিতরও প্রবেশ করিতেছে তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সকল পুরুষ ও নারীর বিবাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক মনে করেন।

জাতিভেদের সমর্থকেরা বলেন,—উন্নতিশীল সভ্যতার সমীকরণ প্রভাবে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বোত্তম একতা এবং সদ্ভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যেই জাতিভেদ প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা ইহাকে ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ মনে করেন। পাশ্চাত্য অন্যান্য সমালোচকদের ন্যায় মিঃ আর্চ্চার ইহার উপরই ভয়ানক ক্রুদ্ধ। তিনি লিখিয়াছেন, "ভয়ানক অমানুষিক ভণ্ডামিই ভারতের ধর্ম্ম," জাতিভেদ প্রথা ভারতের নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছে, এবং তাহাই বুদ্ধিহীন মূর্খতাপূর্ণ

অহঙ্কারকে ধর্ম্মে ও সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন দেয়।" জাতিভেদকে যিনি ভণ্ডামি বলেন তিনি সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় সর্ব্বত্রই জাতিভেদ রহিয়াছে:— শাসক, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমজীবী প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ভিন্নভাবে সমাজ গঠন করিয়া আছে। এই সব স্বাতন্ত্র্য ভণ্ডামি হইতে উদ্ভূত হয় নাই, সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ বা কার্য্যতঃ জাতিভেদ ইদানীং পাশ্চাত্য রাজ্যেও বিদ্যমান। অনেকেরই বিশ্বাস, যতই পরিবর্ত্তন ঘটুক না কেন শ্রেণীভেদ থাকিবেই। সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক গিডিংস্ লিখিয়াছেন,—"সমাজ পুরাতন হইলেও শ্রেণীসমূহ মিশিয়া যায় না, বরং তাহাদের পার্থক্য অধিকতর দৃঢ় ও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে। যে সমাজ-সংস্কার বিভিন্ন শ্রেণীকে একত্র মিশাইতে চাহে তাহা বিফল হয়।" কার্য্যে, ক্ষমতায় ও উপ-যোগীতায় 'সকল মানুষই সমান'—এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান ইউরোপে সামাজিক এবং আর্থিক ব্যবস্থার সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই। একে একে তথাকার প্রত্যেক রাজ্যই ধর্ম্ম হইতে রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিতেছে। ক্যাথলিকেরা ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রকে একসূত্রে গ্রথিত রাখিয়াছিলেন। তারপর লুথারের ধর্ম্মসংস্কার, 'রিনেসেন্স', ফরাসী বিপ্লব এবং আধুনিক অন্যান্য আন্দোলন সেই সম্মিলন-সূত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে বর্ত্তমান ইউরোপের কোন স্থির ভিত্তি বা লক্ষ্য নাই। প্রত্যেক বিষয়েই বিশৃঙ্খল মতভেদ চলিতেছে, কতকগুলির ভিতর ধ্বংস-নীতিও প্রবেশ করিয়াছে।

বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত:—ধনী ও দরিদ্র। অর্থশালীরাই গণ্যমান্য ও ক্ষমতাবান। ধনীকে যাঁহারা তেমন মনে করেন না তাঁহারা হয়ত প্রাচীন ধর্ম্মমতাবলম্বী, অথবা আধুনিক

সমাজসংস্কারকদের দলভুক্ত। অধ্যাপক গিডিংস্ যেসময়ে সমাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই সময়ের ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—যাহারা অশ্রান্ত ধনাগমের জন্য ছুটিয়াছে, ধনের পরিমাণই তাহাদের সফলতার পরিমাপ ; এই শ্রেণীর যাহারা সফল হয় তাহাদের ও যাহারা বিফল হয় তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে ; যোদ্ধ জাতিরা যেমন দুর্ব্বলদের উপর অত্যাচার করে, তেমনই ধনীরা নির্ম্মম কঠোর পীড়নে দরিদ্র লোকদিগকে খাটাইয়া নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিবে ; দেশের আইন কানুন ধনীদের সাহায্য করিবে, অর্থলোলুপতা বিচারবুদ্ধি ও ধর্ম্মবুদ্ধি উভয়কেই কলুষিত করিবে।" ইউরোপের বর্ত্তমান বিপ্লব তাহাতে বাধা দিতে পারিবে কি না তাহা কে বলিবে ?

ধর্ম্ম, দার্শনিক নীতি ও দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনের আদর্শ লইয়াই ভারতের সমাজাদর্শ গঠিত হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্রানুসারে ভারতের আদি যুগে ৪ বর্ণ ছিল, বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ দুই জাতি দেখা যায় :—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। চারি আশ্রমেরও দুইটিই দেখা যায়,—গৃহস্থ ও অবধূত। শূদ্রদের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে নানা শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। জীবনযাত্রার ব্যবসায়কে বৃত্তি বলা হয়। প্রত্যেক বর্ণের স্ব স্ব বৃত্তি লইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিয়ম। স্বীয় বৃত্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের জন্য নিম্নবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অবাধে তাহা চলিতে দিলে আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা, যেমন বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণদের ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য লেখকেরা সাধারণতঃ এই বর্ণ চতুষ্টয়ের সহিত তদ্‌বহির্ভূত অস্পৃশ্য অন্ত্যজদিগকে একত্রিত করিয়াই ভ্রম করিয়া থাকেন। চাতুর্ব্বণ্য হিন্দু ও অস্পৃশ্য পঞ্চমদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ পঞ্চমদের আচরণ কলুষিত।

বর্ণাশ্রমীদের কলসির বা কূপের জল তাহাদের দ্বারা দূষিত হওয়ার আশঙ্কাতেই তাহাদিগকে ঐ সমস্ত স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। সে যাহা হউক, তাহাদের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয় তাহা ঠিক; তাহারই ফলে তাহারা সামাজিক সুবিধালাভের আশায় খৃশ্চান হইতেছে। তাহারা কদর্য্যভাবে থাকিলে যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তেমন শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহার সংস্কারের জন্য বর্ণাশ্রমীদের মধ্যেও বেশ আন্দোলন চলিতেছে।

জাতিভেদের দুইটি প্রধান বিষয়ঃ—পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও আহার-নিষিদ্ধতা। ইউরোপীয়েরা, বিশেষতঃ ইংরেজেরা সহভোজনকে যত আবশ্যক মনে করেন, হিন্দুরা তেমন করেন না। একত্রে আহার না করা স্বত্বেও বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চলিতে পারে। বস্তুতঃ ঐ দুই প্রকারের বাধার মধ্যেই বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুরা স্বচ্ছন্দে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে। ইউরোপীয়দের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তেমন মিলামিশা নাই। নিগ্রো জাতীয় প্রসিদ্ধ বুকার ওয়াসিংটন বলিয়াছেন,—"সামাজিক ব্যাপারে আমরা হাতের আঙ্গুলের মতন খুব স্বতন্ত্র থাকিতে পারি, অথচ আবশ্যক বিষয়ে পরস্পরে মিলিয়া উন্নতিসাধনও করিতে পারি।"—পরন্তু ভারতে ঐরূপ বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে বলিয়া তাহা পালন করিয়া চলিতেও কেহই অপমান বোধ করে না। এত যে উদার ইংলণ্ড সেখানেও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া যাঁহারা খ্যাত তাঁহারা স্বজাতীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীদের সহিত এক টেবিলে আহার করেন না। ইউরোপে ভিন্ন শ্রেণীর লোকের সহিত বিবাহ হয় না। পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতের পার্থক্য এই যে পাশ্চাত্যবাসীরা মুখে বলেন যে তাঁহাদের ভিতরে জাতিভেদ নাই, যে শ্রেণীভেদ আছে তাহাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, শক্তি অনুসারে যে উন্নত হয় সেই উচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে, কিন্তু কার্য্যতঃ তেমন কদাচ

ঘটিয়া থাকে। ভারতের জাতিভেদে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, অতীতে তেমন কঠোর নিয়ম ছিল না, যেমন ক্ষত্রিয় জাতি হইতে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ইদানীং জাতিভেদ যাঁহারা মানেন তাঁহারা বিভিন্ন জাতির সহিত আহারও করেন না, বিবাহসম্বন্ধও করেন না। পাশ্চাত্যদেশে যদি উচ্চপদস্থ কেহ তন্নিম্নপদস্থের সহিত অর্থাৎ হাজার টাকা বেতনের লোক যদি একশত টাকা বেতনের লোকের সহিত এক টেবিলে আহার করেন তবে তাঁহার সমাজে তিনি পতিত হইবেন। ভারত জাতিভেদের দেশ বটে, কিন্তু এখানে তেমন ভণ্ডামি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি, আমার পরিচিত এক সঙ্গতিশালী জমিদার ও উকীল হাইকোর্টে তাঁহার ৭ টাকা বেতনের চাকরের সহিত একত্রে জলযোগ করিতেন। ইংলণ্ডের কোথাও কখনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দৈবাৎ কোন সদ্বংশীয় সহকারীর সহিত জলযোগ করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গতিশালী লোকেরা যেমন সামান্য ভৃত্যের সহিতও এক পংক্তিতে বসিয়া সাধারণতঃ আহার করেন তেমন দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডে কোথায় ? পক্ষান্তরে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য-শালী ক্ষত্রিয় মহারাজার সঙ্গে বসিয়া আহার করিবেন না। ইহাতেই ভারতীয় বর্ণভেদের সহিত পাশ্চাত্য শ্রেণীভেদের পার্থক্য সুস্পষ্ট দেখা যায়। পাশ্চাত্যের উচ্চ শ্রেণীর সেই হামবড়া ভাব, এদেশেও প্রবেশ করিতেছে, অবশ্য এখনও অতি অল্প। কোন ধনী বাঙ্গালীর এক যুবক পুত্র ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন,—'আমরা উচ্চশ্রেণীর লোক' (belonged to upper ten); ইংলণ্ডেই তিনি এই ভাব অনুকরণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে নিম্ন স্তরের সহিত বিবাহ করিবার স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু করিলেই সমাজে বর্জ্জিত হইতে হয়, অবশ্য টাকা থাকিলে অন্য কথা, টাকাই যে সেখানে উচ্চকুলে প্রবেশ করিবার চাবি। সেখানে অর্থের

পাদমূলেই সকলে মাথা নোওয়ায়। ফলে দেখিতে পাই ভারতের প্রাচীন প্রথা ন্যায়ানুগত ও অনুল্লঙ্ঘনীয় ভাবে আচরিত হয়। ইউরোপে পরিবর্ত্তন মুখে স্বীকার করা হয়, কার্য্যতঃ হয় না; যাহা হয় তাহাও অর্থের মোহে। এইটুকু লিখিবার সময় সংবাদপত্রে দেখিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকার রেলপথে চলাচলের নিয়ম করা হইতেছে যে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ও ডাক-গাড়ীতে কৃষ্ণাঙ্গ জাতির কাহাকেও চলিতে দেওয়া হইবে না এবং কোন নিগ্রো পুরুষের সহিত শ্বেতাঙ্গ রমণীর বিবাহ হইতে পারিবে না। যাঁহারা মনে করেন যে ঐরূপ ব্যবস্থা সমর্থনেরও যৌক্তিকতা আছে তাঁহারা কখনো নিজেদের আচরণের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বর্ণাশ্রমীদের মধ্যে একের সহিত অপরের বা বর্ণাশ্রমীদের সহিত পারিয়াদের আচরণ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহার দোষ দিতে পারেন না। যেমন নিগ্রোর সহিত শ্বেতাঙ্গের বিবাহ নিষিদ্ধ তেমনই পারিয়ার সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহ নিষিদ্ধ;—পার্থক্য কোথায়? পক্ষান্তরে ভারতীয়দিগকে দূরে রাখিবার জন্য ইংরেজেরা যে ব্যবস্থা করিতেছেন, ভারতীয়েরাও তাহার দোষ দিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের জাতিভেদ প্রথাই যে সেই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুই মতের কোন্‌টি বিশুদ্ধ আমি তাহা দেখাইতেছি না, যে ভ্রান্তি ও যুক্তিবাদের উপর উভয়ের জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত আমি তাহাই দেখাইতেছি। "হিন্দু মেছেজ" পত্রিকার জনৈক লেখক প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে পার্থক্য দেখাইতে গিয়া লিখিয়াছেন যে প্রাচ্যেরা আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। আমিও দেখাইয়াছি যে তাঁহাদের এই নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

ভারতীয়েরা আবহমানকাল আত্মা এবং বাহ্যিক বিষয়ের মধ্যে আত্মাকেই প্রথম ও উচ্চতর স্থান দিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ দৃঢ়চেতা লোকেরা বাহ্যিক্ অবস্থা হইতে স্বাধীন থাকেন এবং বাহ্যিক্ অবস্থাকে

নিজেদের সেবকরূপে পরিচালিত করেন। মিঃ আর্চ্চার মনে করেন যে ‘এদেশের লোকের বিশ্বাস,—মানুষ সমুদ্রতরঙ্গের মতন উদ্দেশ্যবিহীন নিরালম্বভাবে উঠে ও পড়ে’।—ইহা তাঁহারই অতিশয় অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি। মানুষ যে স্বাধীন এবং মানুষ স্বয়ংই যে স্বীয় অদৃষ্টনিয়ন্তা, এ বিশ্বাস ভারতবাসী অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের লোকেরা পোষণ করে না। অতএব যে অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত চরিত্রের সহায় তাহাকে সুদৃঢ় রাখাই আবশ্যক। তাহা হইলেই বাহিক্ ব্যাপারকে সুব্যবস্থিত করা অনায়াসসাধ্য হয়। ব্যক্তিগত মানসিক চাঞ্চল্য এবং স্বার্থের প্রতিবাধা অতিক্রম করত বীজের গুণ সুরক্ষিত রাখা এবং তাহা পিতা হইতে পুত্রে সংক্রমিত করার চেষ্টাই ধারাবাহিকরূপে চলিতেছে। প্রধানতঃ দেহযন্ত্র এবং তদুপযোগী স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের উপরই আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে। ভারতীয় সমাজদেহকে সুব্যবস্থিত করার মূলে বরাবরই এই লক্ষ্য রহিয়াছে। সমাজের লক্ষ্য হইতেছে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন জিতেন্দ্রিয় হয়, স্বরাজ্যসিদ্ধি লাভ করে ও জিবাত্মাকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতির লক্ষ্য হইতেছে বাহ্য জগতের উপর জয়লাভ করা, এবং তজ্জন্য দেহ ও সমাজকে গড়িয়া তোলা। যেসমস্ত দার্শনিক ভিত্তির উপর ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত এস্থলে আমি তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিব না। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে মন ও বস্তুর মূল প্রকৃতি শুধু মানুষে নহে, সমস্ত সৃষ্ট জীবে এবং শুধু দৈহিক পদার্থে নহে ব্যক্তির আন্তরিক সংস্কারেও আত্মপ্রকাশ করে। জীবাত্মা নিজের উপযোগী দেহই ধারণ করেন। এজন্য বলা হয় ভগবান গুণ ও কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুসারে ৪ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মত গ্রহণ না করিলে বর্ণভেদের কোন অর্থ থাকে না। পাশ্চাত্য মত ইহা স্বীকার করে না। খৃশ্চানধর্ম্মের মত এই যে, আত্মা বিশুদ্ধ অবস্থাতেই

ঈশ্বর হইতে আসে, এইখানে ভাল বা মন্দ দেহে আবদ্ধ হয় এবং সর্ব্বপ্রথম সুখ দুঃখাদির অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকে। প্রাচ্যবাসী এবং অনেক পাশ্চাত্যবাসীও এই মত যুক্তিহীন ও ভ্রমাত্মক মনে করেন। জাতিভেদ পাশ্চাত্যবাসীর নিকট কঠোর বিবেচিত হয়, কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মে তাহার বিশ্বাস নাই। তাহার বিশ্বাস, মানুষ কেবল এই একবারের জন্যই জন্মিয়াছে। নিষ্ঠাবান হিন্দুর বিশ্বাস পূর্ব্বজন্মের গুণ ও কর্ম্মফলানুসারে আত্মা তদুপযোগী দেহ ধারণ করে; মানুষের বর্ণ ই কেবল এক জন্মের জন্য। বর্ত্তমান জন্ম যদি নিম্নবর্ণে হইয়া থাকে তবে তাহার বর্ণোচিত ধর্ম্মপালন ও আত্মোন্নতি সাধন দ্বারা সে ভবিষ্যৎ জন্মে শ্রেষ্ঠতর, এমন কি শ্রেষ্ঠতম বর্ণও লাভ করিতে পারে। অর্থবলে বা পদগৌরবে এক বর্ণ অপর বর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় না। দারিদ্র্যের বা স্বল্প আয়ের দরুণ পাশ্চাত্য দেশের মানুষ যেমন অবজ্ঞাত হয়, ভারতে তেমন হয় না। ঐরূপ শ্রেণীভেদ পাশ্চাত্য দেশেই হইয়া থাকে। এখানে বর্ত্তমান জন্ম পূর্ব্ব জন্মেরই গুণ বা দোষের পরিচায়ক। জাতিভেদের নিয়ম পালন করিয়াও সকলে সামাজিক ভাবে মেলামেশা করিয়া থাকে। এখনো ব্রাহ্মণ্যের বিশেষত্ব আছে, এখনো তাহা উচ্চগুণসম্পন্ন। অন্যান্য বর্ণ তেমন নহে। কারণ, পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য, বর্ত্তমানে অনেক ব্রাহ্মণের পতন ঘটিয়াছে। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি কোনরূপ পাপে আসক্ত হইতে পারেন না, অহঙ্কারীও হইতে পারেন না, হইলে তিনি ত এই জীবনেই হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘৃণিত হইবেন, পরজন্মে হয়ত সর্ব্ব নিম্ন স্তরে গিয়া জন্মলাভ করিবেন। জাতিভেদ প্রথানুসারে সমানধর্ম্মী লোকদিগকে এক শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে বলিয়া যদি কেহ মনে করেন তবে ভুল করিবেন। এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা ধর্ম্মের অর্থ বুঝেন না। সামান্য ধর্ম্ম সকল বর্ণের

সকল মানুষের জন্যই। প্রত্যেক মানুষেরই সত্যনিষ্ঠ দয়ালু ন্যায়পর নিরহঙ্কার ইত্যাদি সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত। কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম এক এক বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আহারাদি সম্বন্ধে শূদ্র হইতে কঠোরতর নিয়ম পালন করেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মিগণ অন্যান্য ধর্ম্মিগণের ন্যায় মনে করেন না যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা মুক্তিলাভের পক্ষে তাঁহাদের অপেক্ষা কম যোগ্য। হিন্দুসমাজের যে কোন বর্ণের লোক যদি স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করে, কোন অহিন্দুও যদি তাহার স্বীয় ধর্ম্মমতের সত্যতায় এবং ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসের সহিত আত্মকর্ত্তব্য পালন করে তাহারও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, সে স্বীয় কর্ম্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সুখসন্তোষের যতটুকু অধিকারী ততটুকু পাইবেই। বলা বাহুল্য, এই উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা প্রতিপালিত হয় না। * খৃশ্চানেরাও তাঁহাদের আদর্শানুসারে চলেন না। তজ্জন্য শাশ্বত ধর্ম্মের দোষ দেওয়া যায় না। স্বধর্ম্মের অপালনই হিন্দুর পতনের কারণ। যে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম-ভাণ্ডারের সংরক্ষক বলিয়া পূজিত হইতেন, আজ তাঁহারা ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। সামান্য অন্নবস্ত্রে তৃপ্ত থাকিয়া কঠোর জীবন-যাপন যাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল আজ তাঁহারা উচ্চপদ, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতালোলুপ হইয়াছেন। যে পরিমাণে তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিতেছেন, সেই পরিমাণেই তাঁহারা সাধারণের নিকট সম্মান হারাইতেছেন। জর্জ্জ ক্যাম্বেল আমেরিকাবাসী কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে যে বহি লিখিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন,—“ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন জ্ঞানগবেষণা, বিভিন্ন পদ, বিভিন্ন সভ্যতা লইয়া

* দোষ কাহার ? ভারতবর্ষে বৈষয়িক উন্নতিসাধন দ্বারা সর্ব্ব রকমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে এখনো কাহারো পক্ষে বাধা নাই। ধর্ম্মোন্নতি সাধনেই বা কে কাহাকে বাধা দেয় ? [অনুবাদক]

কিরূপে শান্তিপ্রীতির সহিত বহু শতাব্দী ধরিয়া বাস করিতেছে, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে; একমাত্র জাতিভেদমূলক সামাজিক সুব্যবস্থা গুণেই ভারতে তাহা সম্ভব হইয়াছে।” মান্দ্রাজী খৃশ্চান কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম মিলার “হিন্দু মেছেজ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“মানুষে মানুষে সমসুখদুঃখভাগিতা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যেমন পরিস্ফুটভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, এমন অন্য কোন ধর্ম্মে হয় নাই।” আমেরিকান গ্রন্থকার মিঃ প্রাইস্ কলিয়ার ‘প্রতীচ্যে প্রাচ্য’ (ইষ্ট্ ইন্ দি ওয়েষ্ট) গ্রন্থে দেখাইয়াছেন “প্রাচীন ভারতে দরিদ্রতা কলঙ্কের বিষয় ছিল না, জন্ম ও জাতি লইয়াই উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইত। অধুনা পাশ্চাত্য অর্থ-গরিমার বীজ ভারতের শিরায় শিরায় অনুপ্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। এইক্ষণ যে যত ধনসম্পদের অধিকারী হয় সেইই তত গণ্যমান্য। ভারতের পক্ষে ইহা নূতন। ইহাই ভারতে অসন্তোষের মাত্রা বাড়াইতেছে। মানুষ অল্পায়াসে সাধু হইতে পারে, ধনী হওয়াই কঠিন, অথচ পাশ্চাত্য মোহে এইক্ষণ অনেকেই সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাহাদের নিজের দুর্দ্দশা যেন প্রচুর হইয়াছিল না, তাই তদুপরি এই নূতন অসন্তোষ, পাশ্চাত্য হলাহল, টাকার পরিমাণ দিয়া লোকের সম্মান ওজন করার ব্যাধি আসিয়া জুটিয়াছে।” তিনি আরো লিখিয়াছেন,—“ইউরোপীয় খৃশ্চানেরা ভারতবর্ষে এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা ভারতবাসীর সঙ্গে বৈবাহিক বা সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের নামও শুনিতে পারে না, আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ খৃশ্চানেরাও তাহাদের সহিত যীশুখৃষ্টের পবিত্র ভোজের সময়েও আফ্রিকাবাসী খৃশ্চানদিগকে মিলিত হইতে দেয় না। সামাজিক ব্যবহারে ত তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াই রাখিয়াছে।”—আমি দেখিয়াছি, দেশীয় খৃশ্চানদের সমাধি স্থান স্বতন্ত্র। মাটীর নীচে গিয়াও কৃষ্ণাঙ্গদিগকে পৃথক্ রাখিতে হইবে!

আমাকে কেহ উহার কারণ বলিয়াছেন যে, উহারা উহাদের সমাধিস্থান পরিষ্কার রাখে না। জানি না কোন্‌টি অধিক পরিতাপের বিষয়—প্রকৃত ব্যাপার, না তাহার ব্যাখ্যা।—আর ইহারাই বলে, ভারতীয় জাতিভেদ অশ্রদ্ধেয় ও অসঙ্গতিপূর্ণ। অকপট হউন; সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্যকে যদি নিন্দার্হ মনে করেন, তবে আসুন, আমাদের ভিতর হইতে সর্ব্বতোভাবে তাহা দূর করি। কাঞ্চন-প্রাধান্যের আদর্শ ও হীন ভাবের জাতীয় কুসংস্কার দূর করি। স্বাতন্ত্র্যের যদি প্রয়োজন থাকে তবে তাহাই গ্রহণ করুন, ভারতে যাহা চলিতেছে তদ্বিরুদ্ধেও কিছু বলিবেন না।

জাতিভেদ সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য ভারতবাসীরাই তাহা করিবেন। তাঁহারা যদি যথার্থই জাতিভেদ ত্যাগ করিতে চাহেন তবে তাহা বিলুপ্ত হইবেই, অন্য কেহ তাঁহাদের উপর জাতিভেদ চাপাইয়া রাখিবে না। তাঁহারা জাতিভেদ ত্যাগ না করিলে বুঝিতে হইবে যে এখনও তদ্দ্বারা তাঁহাদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতেছে, বিশেষতঃ যে ইউরোপীয় প্রভাব সমাজ ধ্বংস করিতে উদ্যত তাহাতে বাধা দিতেছে। ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যেই, অর্থাৎ হিন্দুর সমাজ-সংঘটন উচ্ছেদ করত তৎসঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মেরও বিনাশের জন্যই কতিপয় পাশ্চাত্যবাসী জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমার বিশ্বাস, বিজাতীয় প্রভাবের আক্রমণাশঙ্কা দূরীভূত হইলে জাতিভেদ প্রথা আপনাআপনিই অনেকটা সংশোধিত হইত। নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও জাতিভেদের কোন কোন দোষ ও অসুবিধার কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতারও দাবী করেন। অবশ্য এইরূপ দাবী প্রত্যেক মানব-সম্প্রদায়ই স্ব স্ব সামাজিক ব্যবস্থা-সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় জাতিভেদের সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলি দোষাবহ ব্যাপার আছে যাহা জাতিভেদের কোন কাজে লাগে না।

পরন্তু সামাজিক পার্থক্য মানবোচিত পরস্পর সৌহার্দ্দের ভাব নষ্ট করিবার কোন কারণ নাই। একটা ঘটনা আমি জানি, যখন একজন ইংরেজ পীড়িত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার এক ভারতীয় ভৃত্য তাঁহার শুশ্রূষাকালে এমন সব কাজ করিয়াছিল যাহা তাহার জাতীয় প্রথার বিরুদ্ধ, অথচ তাহার প্রভুর প্রয়োজন এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবশতই করিয়াছিল। কিন্তু সে নিত্য তেমন করিতে থাকিলে ফল বিপরীত হইত।

এই সমস্ত বিষয়ে অপব্যবহার যে হয় তাহা নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্যেরা এদেশের অনেক কিছু অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের তেমন মনে করা ঠিক কি না তাহা অন্য কথা, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন স্থান আছে কি যেখানকার লোকের আচরণ অন্য দেশের লোকের চক্ষে তেমন বিসদৃশ বিবেচিত হয় না? মিশনারীরা 'খৃশ্চান' ইউরোপকে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ভারতবাসীর সমক্ষে ধরিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তদ্বিপরীত। মিশনারীরা বলিয়া থাকেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দু-সমাজের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারে না, খৃশ্চানধর্ম্মই পারিবে। প্রকৃত ব্যাপার এইক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, এবং ভারতের যাঁহারা কিছুকাল ইউরোপে বাস করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা বলিতেছেন যে তাঁহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে, যুযুধানেরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যেসমস্ত কাহিনী প্রচার করিয়াছে তাহা হইতেই প্রাচ্যবাসীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারে যে পাশ্চাত্যেরা যেসব সুপ্রতিষ্ঠার দাবী করে তৎসমস্তই শূন্যগর্ভ। এখন যে কোন বুদ্ধিমান ভারতবাসী কিছুকাল ইউরোপে বাস করিয়া আসিবেন, তিনিই উহাকে অসভ্য বর্ব্বর বলিতে পারিবেন। ইউরোপে যে প্রকৃতির চুরি ডাকাতি, মারামারি কাটাকাটি হইতেছে, মদ্যপান ঐন্দ্রিয়িক ব্যভিচার, দাস-মনোভাব এবং অস্বাভাবিক কামলীলা ইত্যাদি চলিতেছে, পূর্ব্বে

তৎসমস্ত ভারতবর্ষে অবিদিত ছিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন,— "ভারতীয়দের মধ্যে বিকট লাম্পট্য নাই, তাহাদের পূত আচার ব্যবহারের মাহাত্ম্য দেখিলে আমাদের আত্মাভিমান খর্ব্ব হয়।"—ইউরোপে শিশু এবং পশুর প্রতি এত অত্যাচার চলিতেছে বলিয়া তাহাদের রক্ষার জন্য তথায় সমিতি গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে। সন্তানের প্রতি দয়া বাৎসল্য এবং পশুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ভারতের একটা বিশেষত্ব। ইদানীং নিম্ন শ্রেণীর গাড়োয়ান ও সহরের গোয়ালারা গরুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলেও হিন্দুসাধারণ গো-জাতির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান। ইউরোপে বৃথা আমোদের জন্য কত পশু হত্যা এবং জীবিতাবস্থায় অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি কত নিদারুণ পাপানুষ্ঠানই হইতেছে। তাহাদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কত অভাব! ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজেরাই তাঁহাদের স্বদেশবাসীদিগকে প্রত্যহ স্নানের নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে পাপাচার, অধর্ম্ম, কুসংস্কার প্রভৃতির অন্ত নাই। স্থূলতঃ তথাকার লোকেরা বৈষয়িক সাফল্যেরই উপাসক। তথাপি যে সেখানকার কতিপয় লোকের মধ্যে উচ্চ শক্তি ও গুণ নাই, আধ্যাত্মিক সাধনা নাই, বা তদ্দ্বারা তাঁহারা যে মানব-সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন না, এমন নহে। সত্যই যদি আত্মগুণগরিমা উপলব্ধির সময় আমরা সকলে সদ্‌বুদ্ধি ও শিষ্টতা অবলম্বন করি তবেই অচিরে বুঝিতে পারিব যে, কোন দেশই দোষবর্জ্জিত নহে। তাহা হইলেই আমরা অন্যের ভাল করিতে পারিব, এবং নিজেরাও কপটতার অভিযোগ হইতে রক্ষা পাইব। জগতের সমস্ত জাতির গুণ তৌল করিলে হিন্দু-ভারতই সকলের উপরে স্থান লাভ করিবে। সকল মানুষ এখনও প্রকৃত মানুষ হইতে পারে নাই। কেহ হইয়াছেন, অন্যেরা সেই পথে অগ্রসর হইতেছে মাত্র।

ভারতধর্ম্ম এবং ভারত-সভ্যতার সাধারণ নীতি

(৯)

পূর্ব্বে ভারতের সাধারণ ধর্ম্ম ও দার্শনিক ভাবের কথা বলিয়াছি ;—তাহা কি ? সভ্যতা ও উন্নতি সম্বন্ধে যেমন নানা জনের নানা ধারণা—কখনো বা অস্পষ্ট ধারণা—ধর্ম্ম শব্দের অর্থসম্বন্ধেও তেমন। প্রত্যেক মানব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ এবং তাহার সহিত প্রত্যেক মানবের একটা সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে,—এই সত্য স্বীকার করা এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ও সমগ্র জগতের কর্ম্মশক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কর্ম্ম করার যে নীতি তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি প্রাণের ভিতর অনুভব করেন যে এই জগতের সমস্ত জীবের সহিত তিনি নানারূপে সম্বদ্ধ। তেমনই অধার্ম্মিক ব্যক্তি মনে করে যে তাহার স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত জগতের অন্য কাহারো ভালমন্দ দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার ঐরূপ আচরণ যে ধর্ম্মহীন তাহার প্রমাণ এইখানেই পাওয়া যায়। ঐভাবে যদি প্রত্যেক মানুষ চলিতে থাকে তবে এই বিশ্বের অস্তিত্ব থাকিবে না, বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক দৈহিক অবনতির মূল কারণ খুঁজিলে এক সুগভীর নৈতিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দেহের কোন একটা কোষ যখন অপর কোষসমূহ হইতে স্বতন্ত্রভাবে চলিতে চায় তখনই দেহে রোগের উৎপত্তি হয়, কারণ ঐ স্বাতন্ত্র্যকামী কোষ তন্নিকটবর্ত্তী কোষসমূহকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার মহোপকারিণী নীতি হইতেছে মূল কেন্দ্রশক্তির পরিচালনাধীনে প্রত্যেক কোষকে সামবায়িক

সাহায্যদান করা। সেই নীতি রোগের সময় চলিয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনের ধর্ম্ম এবং সমাজ-ধর্ম্ম একই রকমের। তাই সকল ধর্ম্ম একবাক্যে স্বার্থ-পরতার নিন্দা করেন, স্বার্থপরতাকে ব্যাপকভাবে যাবতীয় পাপ ও অধর্ম্মের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সমস্ত পাপাচরণই জীবের দুঃখোৎপাদন করে। বেদান্ত বলেন—জীবাত্মার অবিদ্যা হইতেই উত্তম ও মন্দ কর্ম্মের উদ্ভব, তাহা হইতেই মানুষ সুখ ও দুঃখভোগ করে, এবং তাহাই মানুষকে জন্মমৃত্যু-সমাকুল সংসারে আবদ্ধ রাখে। বেদান্ত অনুসারে বিশ্বজগৎ স্বেচ্ছাচার-প্রসূত নয়, বিশ্বের বাহির হইতে কেহ ইহার পরিচালনাও করেন না। ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবেরই সহজাত, প্রত্যেকেরই কার্য্যে ও প্রকৃতিতে তাহা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তাহারা কি এবং কিসে গঠিত তাহাদের ধর্ম্ম তাহা প্রকাশ করে। ধর্ম্মই মানুষের স্বভাব। তাই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম সকলের মধ্যে আছে এবং এক একটী শ্রেণীতে কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে।

এই সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস আরো কতকগুলি বিষয় সংযোগ করিয়াছে। বহুরূপে আনন্দোপভোগের ইচ্ছা হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি। সেই ইচ্ছা নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে চায়। কর্ম্মেই ইচ্ছার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, কর্ম্ম ধর্ম্মমূলকও হইতে পারে ধর্ম্মবর্জ্জিতও হইতে পারে। প্রবৃত্তিমার্গে ধর্ম্মানুমোদিত ইচ্ছাই ন্যায়সঙ্গত। পুরুষার্থের ত্রিবর্গে অর্থাৎ ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থোপভোগে ধর্ম্মানুমোদিত ইচ্ছা কার্য্যকারিণী হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে সর্ব্বদা সংযত রাখা আবশ্যক, যেন তাহা পাপের পথে ধাবিত না হয়; এবং মানুষ যেন ক্রমশঃ নিজের উপর অধিকতর প্রভুত্বলাভ করিতে পারে। যাঁহারা পুরুষার্থের চতুর্থ স্তর অর্থাৎ মোক্ষকামনা করেন তাঁহারা নিবৃত্তিমার্গের যাত্রী। তাঁহারা ক্রমশঃ অধিকতর ত্যাগশীলই হইয়া থাকেন। এই দুই প্রকারের ইচ্ছাই জীবাত্মাকে সংসারের

বিবিধ বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কারণ এই জীবনের কর্ম্ম ভালই হউক বা মন্দই হউক যেসমস্ত আত্মা এইরূপ দেহবিশিষ্ট জীবনোপভোগের বাসনা করে তাহারাই এইরূপ দেহ লাভ করে। সকাম কর্ম্মমাত্রেই জীবাত্মাকে এই জন্মমৃত্যুবিশিষ্ট বিশ্বের সহিত আবদ্ধ করিলেও উত্তম এবং মন্দ কর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে উত্তম কর্ম্মের ফল সুখ, মন্দ কর্ম্মের ফল দুঃখ, শুধু এই জন্মে নহে, পরবর্ত্তী জন্মজন্মান্তরেও ইহজগতের কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কারণ দেহের মৃত্যু ঘটিলেও আত্মার বিনাশ নাই। সমগ্র ভারতের বিশ্বাস এই যে আত্মা কেবল একবার জন্ম গ্রহণ করেন না,—বহু বার এবং ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালেই করিতেছেন; এবং এই ভূমণ্ডলে যেই বার যেই দেহ অবলম্বন করেন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মই তাহার কারণ; বর্ত্তমানে যিনি যেমন কর্ম্ম করিতেছেন ভবিষ্যৎ জন্মে তিনি তাহার ফলভোগের উপযোগী দেহই প্রাপ্ত হইবেন। এই যে পুনঃ পুনঃ জন্ম ইহার নাম 'সংসার' অথবা জন্মমৃত্যুসঙ্কুল জগতে 'পরিভ্রমণ'। মানুষ বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই কর্ম্মফল, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহাও তাহারই কর্ম্মানুসারে হইবে;—এইরূপে নিজেই নিজের অদৃষ্টনিয়ন্তা, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই মানুষ নিজকে উন্নত করিতে পারে, এই শক্তি তাহার আছে। এই সংসার সসীম, নশ্বর ও ভোগাধীন। কিন্তু ইহাতেও মানুষের চরম লক্ষ্য,—শাশ্বত আনন্দময় শান্তিময় জ্ঞানময় অবাঙ্মনসগোচর মোক্ষ বা নির্ব্বাণের স্থান অর্থাৎ পুরুষার্থের শেষ স্তর আছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম, স্বত্বশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলেই সেই স্তর আয়ত্ত করা যাইতে পারে। মূল ধর্ম্ম সকল দেশেই একরূপ। ধর্ম্মানুসারে চলিবার জন্যই মানুষ আদিষ্ট। দুঃখ ও সুখকে অতিক্রম করা এবং মোক্ষলাভের জন্য বিশুদ্ধ কর্ম্ম করাই ধর্ম্মানুমোদিত।

ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই এই বিশ্বের স্থিতি,—ইহা মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র, এইখানেই মানুষ আপন কর্ম্মফল ভোগ করে, এবং এইখানেই সংসারের ভোগ হইতে মোক্ষলাভ করিয়া মানুষ তাহার চরম মুক্তি ও অনন্তকালস্থায়ী আনন্দলাভ করিতে পারে। যাহা ব্যষ্টির এবং সমষ্টির মঙ্গলজনক, যাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক এবং যাহা সকলের প্রতি সুবিচারপরায়ণ থাকিয়া মানবতার আশু এবং চরম লক্ষ্য প্রাপ্তির আনুকূল্য করে তাহাই প্রকৃত সভ্যতা।

এই বর্ণনায় ভারতধর্ম্মের মর্ম্ম সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইল। ভারতের বহির্ভাগে যেই সকল ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, যেমন মুসলমানধর্ম্ম, খৃশ্চানধর্ম্ম ও জোর-আস্তারধর্ম্ম, সেই সকলকে বাদ দিলে ভারতীয় ধর্ম্মকে প্রধান তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম (যাহাকে সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়) বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বীয় জন্মভূমি হইতে এইক্ষণ বিতাড়িত; কেবল তাহার প্রভাবমাত্র রহিয়াছে। অধ্যাপক হ্রিস্ ডেভিস্ বলিয়াছেন, ।গৌতমের সমস্ত শিক্ষাই ব্রাহ্মণের: ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসূত।। সম্ভবতঃ তিনি মনে করিতেন যে শাস্ত্রাদিতে প্রাচীন ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব যেভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে তদপেক্ষা বিশুদ্ধ ভাবে ও সম্যক্‌রূপে তিনিই উহা প্রকাশ করিতেছিলেন।—তিনি যোগী ছিলেন, জ্ঞানকাণ্ডের নীতিসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন; তিনি ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিষয়বাসনা নির্ম্মূল ও জীবমাত্রেরই প্রতি করুণা প্রদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন, বুদ্ধদেবও তাহাই করিয়াছেন। এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, তিনিও হিন্দুধর্ম্মের একজন অবতার এবং শ্রীকৃষ্ণের পরেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম সংসারযাত্রার প্রণালী এবং নির্ব্বাণদ্বারা অবিদ্যা হইতে মুক্তির উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইতেন। উক্ত অধ্যাপকের

মতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বরবাদ নহে ; ইউরোপীয়ানেরা যে তেমন বলেন তাহার কারণ স্বতন্ত্র। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের যে পরিণাম দাঁড়াইয়াছিল শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাহাই ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন। মানুষকে বিপথগামী করতঃ ধ্বংসের পথে প্রেরণের উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। জৈনধর্ম্মও নিরীশ্বর নহে। জৈনদের প্রথম তীর্থাঙ্কর ঋষভ দেবকে ভাগবৎপুরাণে বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁহাদের দ্বাবিংশ অর্হৎ শ্রীনেমীনাথকে শ্রীকৃষ্ণের পিসতুত ভাই বলা হইয়াছে।

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংসার, পুরুষার্থ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ এবং তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে, পরন্তু মিঃ আর্চ্চার যাহাকে 'সন্ন্যাস' ও 'অমঙ্গলবাদ' বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ভারতধর্ম্মের প্রধান তিন শাখার—ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের মত একই রূপ। ঐ তিন প্রধান শাখা হইতে আরো বহু শাখা প্রশাখা, বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকেরই আবার এক একটা বিশেষত্ব আছে। পর্য্যায়ানুসারে তৎসমস্তের মতামত বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শাক্ত উপাসকদের মতই বলিব। ভারতের সাধারণ ধর্ম্মনীতি ইহার স্বীকার্য্য, এবং এই ভিত্তির উপর বেদান্ত-সম্মত অদ্বৈতবাদই ইহার বিশেষত্ব।

মিঃ আর্চ্চার ভারতের 'কর্ম্ম', 'পুনর্জ্জন্ম', 'সংসার', 'অমঙ্গলবাদ' ও সন্ন্যাসসম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন অর্থাৎ এই সমস্ত যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার বা আদর্শবাদের পরিচায়ক নহে বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি এই সকলের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু এই সকলকে যে ভারতধর্ম্মের মূল সূত্র বলিয়াছেন তাহাই ঠিক। এতদ্বিষয়ে তিনি যেসব উক্তি করিয়াছেন তৎসমস্ত খণ্ডন করা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তিনি বলিয়াছেন,—"এই সমস্ত মত ও তদনুযায়ী আচরণের ফলেই এদেশ বর্ব্বরের অবস্থায় আছে, এগুলি কোন পবিত্র ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না,

এগুলি ভারতবাসীর অন্তঃকরণকে শুধু হীন কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত করিয়াছে, যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ তৎসমস্ত বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অধিকতর মঙ্গলজনক ও যুক্তিপূর্ণ নীতি অবলম্বন না করিবে ততদিন তাহাকে স্বাধীন দেশসমূহের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।"—আমি সাধারণভাবে কেবল এই সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কারণ, তাঁহার বিবেচনায় এই সমস্ত ধর্ম্ম ও বেদান্ত অনুসারে চলিয়াই এদেশের লোক ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, উদ্যমশীলতা ও প্রভুত্বপরায়ণতা হারাইয়াছে, উন্নতি-সাধনের ইচ্ছা ও শক্তি ইহাদের নাই; জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করায় তাহাকে সার্থক করিতে জানে না, সংসারকে মায়াময় বলিয়া স্বপ্ন দেখে এবং তাহা হইতে কাপুরুষের মতন পলায়ন করে।

দার্শনিকদের ভাষায় 'অমঙ্গলবাদের' অর্থ এইরূপই দাঁড়ায় বটে। হিন্দু বলেন, এই সংসার ক্ষণস্থায়ী, ব্যক্তির জীবন আরো স্বল্পস্থায়ী। অল্প কয়েক জনের পক্ষে জীবন যত সৌভাগ্য-সম্পন্নই হউক না কেন অধিকাংশ লোকেরই জীবন দুঃখময়। কতকগুলি লোকের জীবনে দুঃখ ভিন্ন সুখ খুব কমই মিলে। বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ এ সংসারে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতায় এই দুই রকমের ব্যাপারই ত প্রত্যক্ষ। অথচ সকলেই সুখপ্রয়াসী। বর্ত্তমানে কতিপয় পাশ্চাত্যবাসী মনে করেন যে এই পৃথিবী হইতে দুঃখ পাপ দুষ্কর্ম্ম এবং ব্যাধিসমূহ দূর করিয়া ইহাকে স্বর্গে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রার্থনা, তাহাই হউক। হিন্দুর বিশ্বাস, সময় চক্রবৎ ঘুরিতেছে, তাহাতে যেমন পূর্ণ সত্যযুগ আছে, তেমনই অপূর্ণ কলিযুগও আছে। কিন্তু আবহমান কাল পৃথিবীকে সকল জীবের জন্য সমানভাবে পূর্ণ সুখময় করিয়া রাখা অসম্ভব। হিন্দুর এ বিশ্বাস যথার্থ হইতে পারে, না হইতেও পারে। হিন্দু বলেন, তাহা যদি হইত তবে ভাবনা ছিল কি? যে শাশ্বত আনন্দময় অবস্থা মানুষের

সত্যিকার আন্তরিক প্রকৃতি, শাস্ত্রানুসারে যাহা ভগবান বলিয়া কথিত এবং যাহা প্রাপ্তির জন্য মানুষের অন্তর ব্যাকুল, বৈষয়িক বা মানসিক যে কোন আকারের সুখ সেই ব্যাকুলতাকে শান্ত করিতে পারে না। ইহাকেই যদি অমঙ্গলবাদ বলা হয় তবে সমস্ত প্রধান ধর্ম্মই অমঙ্গলবাদী। কিন্তু খৃশ্চানের ন্যায় হিন্দুও মঙ্গলবাদী। কারণ উভয়েরই মতে দুঃখ হইতে মুক্তি এবং শাশ্বত শান্তি আছে। সত্য বলিতে কি, ইউরোপ যে পরিমাণে 'আধুনিক' ও 'উন্নতিশীল' হইয়াছে সেই পরিমাণে তাহার খৃশ্চানধর্ম্ম হারাইয়াছে। যীশুখৃষ্টের যোগশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিল,—বিশুদ্ধ এবং শাশ্বত আনন্দলাভ করিবার জন্য এই জগৎকে যীশুর প্রকৃতির সহিত সমীকৃত করিতে হইবে, তৎপর যীশুকে ও জগৎকে ভগবানের সহিত যোগ করিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে ইউরোপের অধিকাংশ লোকই নিষ্ঠাবান নহে, যদিও মুখে খৃশ্চান বলিয়া পরিচয় দেয়, খৃশ্চান মোটেই নহে। সে যাহা হউক, ইউরোপ আধুনিক নীতি অবলম্বন করার প্রাক্‌কাল অর্থাৎ বিগত ৫০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অমঙ্গলবাদী ছিল বলিয়া কেহ বলে নাই। ইংলণ্ড এক সময়ে নিজকে "মেরী (আনন্দপূর্ণ) ইংলণ্ড" আখ্যা দিয়াছিল। তখনও 'সংস্কার' আরম্ভ হয় নাই, এতদ্বিষয়ে এবং সন্ন্যাসসম্বন্ধে হিন্দুরা যে ভাব অবলম্বন করিয়া চলেন তখন তাহাই ইংলণ্ডে প্রবল ছিল।

এইক্ষণ বস্তুতঃ ভারতে দুঃখের পরিমাণ অত্যধিক। যে জাতি স্বভাবতঃ মহৎ এবং বহু বিষয়ে বিজয়ী, কিন্তু এইক্ষণ অধঃপতিত ও বৈদেশিক শাসনের অধীন তাহার যে দুঃখের অবধি নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের যদি দুঃখবোধ না থাকিত তবে তাহারা ঘৃণিত জীব বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা দৈন্যে এবং রোগে বিষম দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। হয়ত খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজ অবগত আছেন যে আমি যখন

এই প্রবন্ধ লিখিতেছি তখন ভারতে প্রতি সপ্তাহে ৩০,০০০ ত্রিশ হাজারের অধিক লোক প্লেগে, ১০,০০০ দশ হাজারের অধিক ম্যালেরিয়ায় প্রাণ হারাইতেছে। অন্যান্য রোগ কত লোককে গ্রাস করিতেছে, বহুমূত্র ও যক্ষ্মা নাগরিকদের মধ্যে কিরূপ সংহারলীলা আরম্ভ করিয়াছে, তাহার বর্ণনা কত করিব ? যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যা লইয়া আমরা কত হা হুতাশ করি, কিন্তু ভারতের এই ভীষণ মৃত্যুর কথা কে ভাবে ? তদুপরি ভারত আজ এত দরিদ্র যে অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অধিকাংশই সারাজীবনে 'পেট ভরিয়া' আহার করা কাহাকে বলে জানে না। সর্ব্বত্রই খাদ্যের অভাব। অন্যান্য লোকদের ন্যায় ভারতবাসীও স্বাভাবিক দুঃখের কালিমায় আবৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য তাহার দার্শনিক "অমঙ্গলবাদ" ঘাঁটিতে না গিয়া তাহার পার্থিব অবস্থার অনুসন্ধান করাই সঙ্গত। অধিকন্তু সাহিত্যিকেরা সাধারণতঃ গ্রন্থাদির মতামত লইয়াই চলেন। অমঙ্গলবাদের উক্তি ভারতীয় এবং খৃশ্চীয় উভয় সাহিত্যেই দৃষ্ট হয়। যে জাতি হইতে ঐরূপ সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে সেই জাতির সকলেরই চিত্র যে তাহাতে প্রতিফলিত হয় এমন নহে। রোমান ক্যাথলিক উপাসনাগ্রন্থ এই জগৎকে মানবের অশ্রুপাত ও আর্ত্তনাদের ভূমিই কহিয়াছেন। এতদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলবাদ আর কোথায় আছে ? অথচ গীর্জ্জায় ধনী সুসজ্জিত পুরুষ ও মহিলারাই এই 'অশ্রু-ভূমির' (vale of tears) সঙ্গীত গাহিয়া গৃহে ফিরিবার পর নানা রস সমন্বিত ভক্ষভোজ্যে আপ্যায়িত হইতে থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে যাহাই থাকুক তাঁহারা দুঃখপূর্ণ সংসারকে সুখপূর্ণই দেখেন, এবং তাহা ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত নহেন। ভগবৎপ্রাপ্তির কামনায় যাঁহারা স্তোত্র পাঠ করেন মৃত্যু অতি কঠোরভাবে তাঁহাদের নিষ্ঠা পরীক্ষা করে। মৃত্যুর আগমন অনেকেই চাহে না। ভারতে ইউরোপের ন্যায় পার্থিব

সুখৈশ্বর্য্য নাই বটে, কিন্তু ভারতের অনেকেই ধর্ম্মশাস্ত্রের এইরূপ বিষাদময় উক্তি শুনিয়া আত্মহারা হয় না। সর্ব্বত্রই লোকের অন্তর ঐরূপ দুঃখযন্ত্রণার বিরোধী। হিন্দুদের বিশ্বাস, জগৎ ভাল ও মন্দ এই দ্বন্দ্বপূর্ণ। মন্দের কথা বলিতে স্বর্গের শাশ্বত আনন্দের সহিত তুলনা করিয়াই বলা হয়। মানুষ চরম শান্তিলাভের চেষ্টায় বিরত হইয়া যেন বিপদসঙ্কুল গন্তব্যপথের কোথাও বিলম্ব না করে তেমনভাবে তাহাকে অবহিত রাখিবার উদ্দেশ্যেই বিশ্বের দুঃখময় চিত্রটি কখনো বিশেষ করিয়া প্রদর্শিত হয়।

মিঃ আর্চ্চার সন্ন্যাসের ভিতর বিশেষ কিছু মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কি না জানিতে চাহিয়াছেন। যিনি যে ভাবে উহাকে দেখেন তাহার উত্তর তেমনই হইবে। তিনি বলেন ভারতবাসীর অভাববৃদ্ধি শিক্ষা করা উচিত। ইহার সহিত ভারতের সন্ন্যাসধর্ম্ম কখনো একমত হইবে না। যে দেশের লোক সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে সেখানে বণিক্‌বৃত্তি পসারলাভ করিবে না। বাসনাকে সংযত করা আবশ্যক, এই সিদ্ধান্ত অনেকেই স্বীকার করিবেন, কারণ সংযম না থাকিলে কামপ্রবত্তির স্বাভাবিক শক্তি মানুষকে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে, বিশেষতঃ 'আরো চাই' 'আরো চাই' বলিয়া বাসনাকে যতই ফুৎকার দিবে ততই তাহা বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণতঃ সন্ন্যাস বলিতে কঠোর তপস্যা, আত্মত্যাগ, দেহের নির্য্যাতন ইত্যাদিকেই বুঝায়, অনেকে কামাসক্তি এবং বিষয়াসক্তিকে পাপময় মনে করিয়াও সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। বিষয়াসক্তি সম্বন্ধে আমরা সংসারকে যেমন গড়ি তেমনই হয়। সন্ন্যাসব্রতাবলম্বীদের উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়ানুশীলনের প্রকৃতি অনুসারে সন্ন্যাসও বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। হিন্দুধর্ম্মানুসারে সাংসারিক লোকদেরও কিয়ৎপরিমাণে সন্ন্যাসব্রত পালন করিতে হয়—যেমন তিথি বিশেষে উপবাস করা। ক্যাথলিক খৃশ্চানধর্ম্মের মধ্যেও তাহা আছে। তাহাতে অতিরিক্ততা কিছুই নাই। হঠযোগী প্রভৃতি ত্যাগপন্থীরাই

কঠোরতম সাধনা করিয়া থাকেন। খৃশ্চানধর্ম্মের প্রথম যুগে, এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্য যুগে তেমন হইত। অধ্যাপক হফ্‌কিন্‌সন্‌ নামক জনৈক আমেরিকাবাসী সমালোচক লিখিয়াছেন, খৃশ্চানধর্ম্মে সন্ন্যাস নাই। আমার মনে হয় এই অদ্ভুত উক্তি তাঁহার স্বীয় ধর্ম্মসম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে। তাঁহার জানা উচিত যে ভারতীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মতের মূল্য কিছুই নহে। যীশু তাঁহার যোগশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—মানুষ অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহারই অনুসরণ করিবে, এবং আত্মত্যাগের ক্রুশ ধারণ করিবে। 'আরো চাই' 'আরো চাই' করার কথা দূরে থাকুক্, সঞ্চয়ের পর্য্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন, আগামী কল্যকার কথা ভাবিতেও নিষেধ করিয়াছেন; ক্ষেতের লিলি ফুল যেমন শ্রমও করে না, সূতাও কাটে না,—তেমন নির্লিপ্তভাবে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। ফল দাঁড়াইল, তাঁহার পদানুসরণ করিতেছেন এই বিশ্বাসে শত শত পুরুষ ও নারী সংসার ত্যাগ করিয়া কঠোরতম তপস্যা আরম্ভ করিলেন:—সাইমন ষ্টাইলাইট্‌স্‌ একটি স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া জীবন কাটাইলেন, হীন্‌রিচ্‌ সুজো বহু বৎসর যাবৎ স্বীয় দেহকে কত যন্ত্রণা দিলেন, জোসেফ লেবার স্বীয় দেহকে ধূলিকর্দ্দম ও ক্রিমি-কীটের আধার করিয়াছিলেন, শীডামের ব্লেসেড লিড্‌ওয়াইন কুষ্ঠ রোগীদের ক্ষতাদি ধৌত করিয়া সেই রক্তপুঁজাদিমিশ্রিত জল পান করিতেন। এই সব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলেও তাহা হইতে জানা যায় যীশুর শিক্ষা তথাকার মানুষকে কত কঠোরব্রতী করিয়া তুলিয়াছিল। মিঃ আর্চ্চার ভারতীয় সন্ন্যাসীদিগকে—'ছাইভস্ম মাখা কদর্য্য ঘৃণিত জীবগুলি'—বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাদের অধিকাংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; প্রাতঃস্নানের পরেই ভস্মলেপন করিয়া থাকেন। কতকগুলি ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী মলিনভাবে থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ভণ্ড না হইলেও কেহ কেহ যে প্রকৃত

সন্ন্যাসী নহে, তাহা ঠিক। কেহ কেহ যে আবার প্রকৃত ধার্ম্মিক তাহাতেও সন্দেহ নাই। অনাসক্তিকে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক নহে বলায় মিঃ আর্চ্চার যে উহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই তাহাই বুঝা যায়। ভারতের কোন্ বিষয়ই বা তাঁহার নিকট তেমন জ্ঞান-মূলক ? সকলই ত তাঁহার মতে 'সামান্য, ভীরুতাব্যঞ্জক অতিরঞ্জন', 'সমাজনীতির বিরুদ্ধ', 'যুক্তিহীন' সামঞ্জস্যহীন', 'অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া দেওয়া' ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অনাসক্তিও তাঁহার অনধিগম্য। অনাসক্তির অর্থ সংসার হইতে দূরে থাকা নহে, সংসারের সকল কার্য্য, সমাজসেবাদি পর্য্যন্ত করিয়াও অনাসক্ত থাকা যায়। ইহার অর্থ যাহা কিছু করা হয় নিঃস্বার্থভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া করা। নিজের কোন লাভের প্রত্যাশা না রাখিয়া যিনি সদুদ্দেশ্যে কাজ করেন তাহা হইতে যিনি নামযশের বা স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় সৎকাজ করেন তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। পাশ্চাত্য সন্ন্যাসীদের ন্যায় ভারতেরও যাঁহারা সংসারত্যাগ করেন তাঁহারা তাঁহাদের বৈরাগ্যবশতঃই করেন, পাশ্চাত্য ভাবে বা গ্রন্থকারের উক্তি অনুসারে কাহারো উপর কিছু চাপাইবার জন্য নহে। এক এক ব্যক্তি এক এক রকমের শক্তিবিশিষ্ট, এক একরূপ উদ্দেশ্য লইয়া চলে। সুতরাং কেহ কেহ যে সংসারের ভয়ে বা দুর্ব্বলতাবশতঃ সন্ন্যাসী সাজে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সন্ন্যাসসম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল বটে, কিন্তু সত্যকার কঠোর সন্ন্যাস সর্ব্বত্রই দুর্ল্লভ। মানুষ এতই সুখ-প্রত্যাশী এবং দুঃখের ভয়ে এতই শঙ্কিত যে সন্ন্যাসধর্ম্মে সংসার উৎসন্ন যাইবে এই দুর্ভাবনায় অস্থির হওয়ার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। অন্যান্য যুগের তুলনায় বরং বর্ত্তমান যুগে একেবারেই নাই। সে যাহা হউক, এইক্ষণ আসুন, বণিক্‌নীতির বিরুদ্ধ হইলেও জীবনযাত্রার প্রণালী সহজ করিয়া লইতে সকলকে প্ররোচিত করি।

উদার ও স্বাধীন ভাবে নিরীক্ষণ করুন, বুঝিবেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে তৌল করিয়া অন্য কোন ধর্ম্ম দেখে নাই। ইহার নীতিসমূহ কৃত্রিম সন্ন্যাসের বিরোধী। পুরুষার্থবাদ, আশ্রমতত্ত্ব এবং জীবনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের পার্থক্যবিচারেই ইহা সুস্পষ্ট।। প্রবৃত্তিমার্গের ত্রিবর্গের—অর্থাৎ ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের দ্বারা ধর্ম্মসঙ্গত ইচ্ছা ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে পূর্ণ করা যায়। সংসারাশ্রমীকে এই ত্রিবর্গ লাভের জন্যই উৎসাহিত করা হয়। প্রথম দুই আশ্রমে ব্রহ্মচারী ছাত্ররূপে এবং বিবাহিত গৃহস্থরূপে জীবনযাপনের নিয়ম। পূর্ব্বে ক্বচিৎ দু'একজন ব্যতীত সকলেই বিবাহ করিত। পুরুষার্থের চতুর্থ স্তর মোক্ষ। তজ্জন্য মানুষকে বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু আশ্রম অবলম্বনে জীবন-যাপন করিতে হইত। এই স্তরে মানুষ নিজস্ব কিছুই রাখিতেন না, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে করিতে যাঁহা হইতে সমস্ত নির্গত হইয়াছে তাহাতে বিলীন হওয়ার জন্যই অগ্রসর হইতেন। প্রথম দুই আশ্রমে মানুষ ভোগমার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন; ধর্ম্মসঙ্গত ভোগের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিতেন। শেষ দুই আশ্রমী নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া বিশ্বাতীত পরমাত্মায় বিলীন হওয়ার জন্যই অগ্রসর হইতেন। বিশ্বসৃষ্টি লইয়া যে আত্মা ঘুরিতেছেন তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিবার জন্য উনি ব্যগ্র হইতেন না। দু'একজন প্রথম স্তর হইতেই (গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া) অসাধারণ আত্মবিকাশের ফলে একেবারে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতেন; তদ্ব্যতীত অপর সকলকে আশ্রমের পর আশ্রম ঘুরিয়া যাইতে হইত। এই প্রাচীন আদর্শ কত মহোচ্চ সৌন্দর্য্যপূর্ণ এবং কেমন যথাযথ তৌলকরা কে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? যাঁহারা বর্ণাশ্রমের তত্ত্ব অভিনিবেশপূর্ব্বক অনুধাবন করেন নাই, ইহার ভিত্তি যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে নীতি সমগ্র জগৎকে ভগবানের সহিত সমসূত্রে একেরই মধ্যে বিরাজিত দেখে

তাহার সুগভীর তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য যাঁহারা যত্ন করেন নাই তাঁহারা ইহা জানিতে পারিবেন না। অপর বিষয়ের ন্যায় এই মহোচ্চ গৌরবেরও অধিকাংশ চলিয়া গিয়াছে। তথাপি ইহার যে অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য বিরাজমান রহিয়াছে যথার্থ সভ্য জাতি ব্যতীত অন্যের পক্ষে তদ্দর্শন ও তদনুরূপ আচরণ সম্ভবপর নহে।

এই জীবনের মূলাধার যিনি তাঁহার সহিত সম্যক্‌রূপে মিলাইয়া, সন্ন্যাসের সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া যে জীবনযাত্রার প্রণালী সুনির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে শাক্তগণ তাহাই সমর্থন করেন। শাক্তমতে বিভিন্ন আকারের কর্ম্মশক্তি ও তাহাদের প্রসূতি নিরাকারা শান্তিময়ী মহাশক্তি অভিন্ন। কুলার্ণবতন্ত্র বলেন, যোগ এবং ভোগ এক—যোগো ভোগায়তে, সংসার মোক্ষলাভের ক্ষেত্র—মোক্ষায়তে সংসারঃ। এই নীতি মানবকে শিক্ষা দিয়াছে,—সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই. সংসারে থাকিয়াই নিজের মধ্যে চরম সত্য উপলব্ধি করা এবং পরমাত্মার সহিত তাঁহারই অভিব্যক্তি এই জগৎপ্রপঞ্চের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা সম্ভব। এতদপেক্ষা কোন্ অধুনিক পাশ্চাত্য শাস্ত্র শ্রেষ্ঠতর নীতি আবিষ্কার করিয়াছে কেহ তাহা দেখাইতে পারিবেন কি? এই ভাবের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার দেশ, তাঁহার পরিবার, এবং সমস্ত সংসার একই জগজ্জননীর বিভিন্ন রূপ। তাহাদের সেবা করিলেই তাঁহার সেবা করা হয়। আত্মা ও দেহের মধ্যে যে সংঘর্ষ তাহা এই শাস্ত্রমতে আশ্চর্য্যরূপে মীমাংসিত। যখন সমস্তই পরাশক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিবে তখন এই সমস্তের কিছুরই জন্য আর বাসনা থাকিবে না। কঠোর সন্ন্যাস ছাড়াও বাসনা চলিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইবে। ভারতীয় শাস্ত্রমতে জীবনের কোন মূল্য নাই বলা নিরেট মূর্খতাব্যঞ্জক। মানবজীবন দুই ভাবেই অতিশয় মূল্যবান;—প্রথমতঃ ইহা অসীম পরমাত্মার সসীম অভিব্যক্তি, দ্বিতীয়তঃ সেই অসীমের

সহিত মিলিত হইবার সুযোগ মাত্র এই জীবনেই ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহা অতিশয় মূল্যবান। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, মানবজীবন অতি দুর্লভ। উন্নতিলাভের প্রয়াসে লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর আত্মা এই মানবজীবন লাভ করিয়াছে। তাই শাস্ত্র বারম্বার সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কেহ যেন এ জীবনে উন্নতি সাধনের সুযোগ না হারায়, হারাইলে সে আত্মঘাতী হইবে। এই জীবন নিজের হিসাবে, এবং মানবের চরম লক্ষ্যে উঠিবার সোপান হিসাবে—দুই ভাবেই মূল্যবান।

এই জীবন যে বাস্তব তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় ধর্ম্মমতের দোষপ্রদর্শক অন্যান্যদের ন্যায় মিঃ আর্চ্চারও বাস্তবতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতবাসী জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাস করে না।' বস্তুতঃ ভারতের যাহা মূল নীতি তাহাকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে তিনি বেশ পটু। সেই ভাবেই তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বাস্তব বস্তুর দায়িত্ব ভারতীয় হিন্দুদের হাতে ন্যস্ত করা অত্যন্ত মারাত্মক হইবে। তিনি এমনই 'অদৃষ্টবাদী' যে নিজের ভুল কখনো সংশোধন করিবেন না, তাঁহার 'সন্ন্যাসধর্ম্ম' ও 'অমঙ্গলবাদ' তাঁহাকে বলিবে যে এতদ্বিষয়ে আর মাথা খাটাইবার প্রয়োজন নাই। ইহাও কি বলিয়া দিতে হইবে যে বাস্তবতার জ্ঞান জগতের সর্ব্বত্র যেমন জন্মে ভারতীয়দের অন্তরেও তেমনই জন্মে? ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য ও বেদান্ত—ভারতের এই তিন দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রথম দুইটি সুস্পষ্টভাবেই জগতের বাস্তবতা ঘোষণা করেন। 'বৈদান্তিকেরাও ইহাকে বাস্তব বলেন। কেবলমাত্র বেদান্তের মায়াবাদমতে 'জগৎ মিথ্যা'। কিন্তু তাহাও কোন্ অর্থে?

'বাস্তব' কথাটা তাহার সংজ্ঞানুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে। যাহা পরিবর্ত্তনশীল অন্যান্যের নিকট তাহা যথার্থ বিবেচিত হইলেও বেদান্তমতে

যাহা ছিল, যাহা আছে এবং যাহা থাকিবে, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন-কালেই যাহা অপরিবর্ত্তিত তাহাই প্রকৃত বাস্তব। অর্থাৎ একমাত্র ভগবানই বাস্তব। খৃশ্চান ধর্ম্মশাস্ত্রও বলেন,—'সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে যাহা আছে, এবং অবিনাশীরূপে নিত্য যাহা থাকিবে তাহা বাস্তব।' বেদান্তও এই অর্থেই 'জগৎ মিথ্যা' বলিয়াছেন, অন্য অর্থে নহে। জগৎ যতদিন বিদ্যমান আছে ততদিন তাহা আমাদের নিকট সত্য, ইহার পার্থিব কারণ বা মায়াশক্তি আমাদের নিকট অনির্ব্বচনীয় রহস্য,—তাহাকে সত্যও বলিতে পারি না, অসত্যও বলিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন যে একদিন এই জগৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে; কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন না যে ঈশ্বর যেমন সত্য, জগৎও তেমন সত্য। বেদান্তের 'জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য'—এই মতের প্রধান সমর্থক শঙ্করও বৌদ্ধদের বাহ্য-জগতের সত্যতা অস্বীকারকে স্পষ্টরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। বহির্জগৎকে অন্তরস্থ মনই অনুভব করে, সুতরাং মন যেমন সত্য, বহির্জগৎও তেমনই সত্য। মন এবং বহির্জগৎ উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্ট। আমাদের এই সমতল ক্ষেত্রে দুইটিই সমান্তরালভাবে বিদ্যমান, বহির্দৃষ্টিতে সেই পরা চিৎশক্তি দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া মনে হয় বটে, বস্তুতঃ তাঁহার ভিতরও নাই, বাহিরও নাই। জগৎকে স্বপ্ন বলা হয় বটে, কিন্তু কাহার পক্ষে? সাধারণ মানুষের পক্ষে নহে, যে চিৎশক্তির সৃষ্টি কল্পনা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহারই পক্ষে। এমন কোন ভ্রান্ত দার্শনিক মত নাই যাহা বোধ-শক্তির অগম্য কোন পদার্থ আছে বলিয়া স্বীকার করে।

অবশেষে কর্ম্মবাদ ও সংসারধর্ম্ম। ভারতবাসীকে খৃশ্চান করার পক্ষে ইহাই বিষম অন্তরায় বলিয়া খৃশ্চান মিশনারীরা মনে করেন। মিঃ আর্চ্চারও ইহাকেই রাষ্ট্রনৈতিক অন্তরায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতের উৎকট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অন্যান্য ইংরেজ লেখকেরাও ভারতের দার্শনিক

তত্ত্বসমূহ ভারতবাসীর উপর নিতান্ত অমঙ্গলকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আবার ভারতেরও কেহ কেহ ঐ সমস্ত উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এই সমস্ত মতবাদ ভারতবাসীর ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতার, উদ্যমহীনতার ও উন্নতিসাধনে অনিচ্ছার কারণ, এবং তাহারই জন্য মিঃ আর্চ্চারের আদর্শানুরূপ পাশ্চাত্য 'উদার' রাষ্ট্রনীতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিতেছে না। মিঃ আর্চ্চার বলেন, "ভারতবাসীর এই সমস্ত ধর্ম্মমতই তাহাদের আলস্যময়তার মূল,—তাহারা মনে করে যে, জীবন সীমাহীন প্রান্তরের মত। এক একটা যুগ মধ্যসমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তাহাতে নিরালম্ব ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে উঠিতেছে ও পড়িতেছে; ব্যক্তিগত জীবন একেবারে পঙ্গু ও অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে।" পরন্তু এই জন্যই ভারতবাসীরা তাঁহার মতে আধ্যাত্মিক নহে। তিনি বলেন,—"এই সমস্ত স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতির কল্পনা হইতে গৃহীত। এসব অন্তঃসারশূন্য, ইহাদের আবিষ্কার বা তিন হাজার বৎসর পর্য্যন্ত এসব লইয়া বসিয়া থাকায় তাহাদের বিশেষ কোন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।" ইহা বলিবার সময় 'বর্ব্বরদের কল্পিত' কথাটা অবশ্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে ভারতবাসীর ভিতর যথেষ্ট গোঁড়ামি আছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি ভারতীয়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন যদি তাঁহাদের এই মতবাদ কেহ অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন। কারণ, চিন্তাশীল ধর্ম্মভীরু লোকেরা এই দুঃখযন্ত্রণাময় সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মধারণের ভয়েই যে শঙ্কিত। তাঁহাদের বক্তব্য এই ঃ—"আমাদের ধর্ম্মমত অপেক্ষা অধিকতর সত্য মত যদি কিছু থাকে তবে দেখাও, প্রমাণ কর।" খৃশ্চানধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম কিম্বা অন্য লোকেরা তাঁহাদের নিকট যেসমস্ত মত উপস্থিত করেন তাঁহাদের যুক্তির নিকট তৎসমস্ত অগ্রাহ্য। তাঁহাদের মত শুদ্ধ

বা অশুদ্ধ হউক, পরের ঐ সমস্ত মত অগ্রাহ্য করায় তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় না। স্থবিখ্যাত দার্শনিক হিউম ও কাডওয়ার্থ মনে করেন— আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে পুনর্জ্জন্মবাদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত। অধ্যাপক উইলিয়ম নাইট বলেন, "জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে যেসমস্ত মতবাদ উপস্থিত করা হয় সেইগুলিই অধিকতর দুর্বোধ্য জটিল।"

কর্ম্মবাদের সত্যতা নির্দ্ধারণ, অথবা এ সম্বন্ধে মিঃ আর্চ্চার প্রভৃতির ভ্রমপ্রমাদ খণ্ডন করিতে আমি ব্যস্ত নহি। স্বীকার করা যাইতে পারে যে ইহাতেও অনেক জটিল সমস্যা আছে। কোন্ মতেই বা নাই? ভারতবাসীর ধর্ম্মমতকে যাঁহারা জটিলতাপূর্ণ বলেন তাঁহাদিগকে যদি বলা হয়,—'আপনারা আগে আপনাদের মতবাদ বিশ্লেষণ করুন,' তবে দেখা যাইবে যে তাঁহাদের মতবাদ আরো অধিক জটিলতাপূর্ণ। কার্ডিনেল নিউম্যান একজন বিখ্যাত সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'খৃশ্চান ধর্ম্মে এমন কোন মত নাই যাহা জটিলতাপূর্ণ নহে,' এবং তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি তাহার কোনটাই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। যেসমস্ত মতবাদ এত জটিল সেগুলিকে যুক্তিমূলক বলা যাইতে পারে কি? ভারতীয় কর্ম্ম ও সংসারবাদ পুনর্জন্ম-তত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিতে পারুক আর নাই্‌ই পারুক ইহাতে যে সত্য নিহিত আছে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যেরাও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। অধিকন্তু যে কোন নিরপেক্ষ চিন্তাশীল লোক যুক্তির দিক্ দিয়াও বুঝিতে পারিবেন যে অন্যান্য মত অপেক্ষা হিন্দুমত কত কম জটিল।

এতদ্বিষয়ে হিন্দুর মত ঠিক হউক, বা নাই হউক, মিঃ আর্চ্চার যে বলেন, ইহা নিতান্ত 'অগভীর',—তাহা কখনো নহে। অধ্যাপক উইলিয়ম নাইট বলেন,—যদি কোন মতের অনুবর্ত্তী লোকদের সংখ্যা ধরিয়া তাহার

গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হয় তবে পুনর্জন্মবাদের প্রতিই তাহা প্রযোজ্য।"+ এক সময়ে সমস্ত সভ্য জাতিই জন্মান্তরবিশ্বাসী ছিলেন, এখনও পৃথিবীর দ্বিতৃতীয়াংশ লোক তাহা বিশ্বাস করেন। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে দেখা যায় প্রাচীন ও বিদ্বান ব্যক্তিরা তাহাই বিশ্বাস করিতেন। যদিও প্রাচ্যদেশে ইহার উদ্ভব এবং অচ্ছেদ্য ভাবে ইহা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে পাশ্চাত্য দেশে খৃশ্চান-ধৰ্ম্ম প্রচারের পরেও স্থানে স্থানে ইহার বিস্তার হইয়াছে দেখা যায়।। প্রাচীন ইজিপ্টবাসী, প্রথিতনামা এম্পিডোকেল্স্, পিথাগোরস্ প্লেটো প্রভৃতি গ্রীস দেশের বহু লোক, নিওপ্ল্যাটোনিষ্ট সম্প্রদায় লাটিন গল ড্রুইড্স্ এবং ইড্ডামতাবলম্বীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন। খৃশ্চানধর্ম্মের প্রাথমিক যুগে খৃশ্চানেরা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিতেন; 'ওরিজেনে' তাহার উল্লেখ আছে। রেভারেণ্ড জে এম প্রাইজ তাঁহার "দি ইন্কারনেশন্ ইন্ দি নিউ টেষ্টামেণ্ট" নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে খৃশ্চীয় প্রত্যাদেশসমূহের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিলে তাহা জন্মান্তরবাদেরই সমর্থন করে। খৃশ্চীয় মধ্য যুগেও স্থানে স্থানে তাহা দেখা দিয়াছে। 'সেমিটিক 'জুডাইজম্' (কাব্বালিষ্টেরা নহেন) ও তাহার দুই শাখা—খৃশ্চানধর্ম্ম ও মুসলমানধৰ্ম্ম জন্মান্তরবাদের বিরোধী হইয়াছে। খৃশ্চানধর্ম্ম পরের উপর আক্রমণ ও অত্যাচারের নীতি অবলম্বন করাতেই ইউরোপ হইতে জন্মান্তরবাদ বিদূরিত হইয়াছে এবং ইউরোপবাসীর তদ্‌গ্রহণে বাধা পড়িয়াছে। মুসলমানধৰ্ম্মও এসিয়ার কতিপয় স্থানে (অর্থাৎ যে যে স্থানে মুসলমানধৰ্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে) তেমন করিয়াছে। সে যাহা হউক, ইউরোপে জন্মান্তরবাদ কখনো সৰ্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয় নাই। ইদানীং বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিই ইহার অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে ইহা কিরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে তাহা যাঁহারা অবগত নহেন তাঁহারা মিঃ ই, ডি, ওয়াকারের "রি ইন্কারনেশন" গ্রন্থ দেখিবেন।

রেভারেণ্ড ডবলিউ, আর, অল্‌জার 'ভবিষ্যৎ জন্ম' সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তদবলম্বনেই মিঃ ওয়াকারের গ্রন্থ রচিত। মিঃ আর্চ্চার যাহাকে 'অগভীর বলেন' তাহার সমর্থকদের মধ্যে সুবিখ্যাত ইটালিয়ান দার্শনিক জিয়ার্ডানো ব্রুণো অন্যতম। এই মত অবলম্বনের অপরাধে খৃশ্চানেরা তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছিল। তৎপর জার্ম্মণ দার্শনিক শেলিং, ফিস্‌টে, লিব্‌নিজ্‌, সপেনহয়ার; কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে গেটে হার্ডার, লেসিং, ইংলিশ খৃশ্চানদের মধ্যে ডাক্তার হেন্‌রি মুর প্রভৃতি; দার্শনিকদের মধ্যে কাড্‌ওয়ার্থ এবং হিউম; ফরাসী ও ইংলিশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ফ্লেমারিয়ণ, ফ্লিগুয়ার, ব্রুস্‌টার; আধুনিক খৃশ্চান-ধর্ম্মবিজ্ঞান লেখক জুলিয়াস্‌ মুলার, ডর্নার, আর্নেষ্ট রুকার্ট, এডওয়ার্ড বীচার এবং ডবলিউ আর অল্‌জার প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতন্মতাবলম্বী আরো বহু প্রসিদ্ধ লোকের নাম এই সমস্ত লেখকদের গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থকারদের মধ্যে অধ্যাপক মেক্‌টেগার্ট দেখাইয়াছেন, আত্মা যদি অবিনাশী হয় তবে জন্মান্তর স্বীকার করিতেই হইবে। রেভারেণ্ড অলজারের ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মান্তর সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ লিখেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—জন্মান্তর সত্য বলিয়া দেখায় বটে, কিন্তু ইহা ভ্রান্তিময়, বিশ্বাসের অযোগ্য।" কিন্তু পনর বৎসর পরে সুচিন্তিত গভীর গবেষণার ফলে ঐ গ্রন্থের ২য় সংস্করণে তিনি জন্মান্তরবাদকেই বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

এদেশের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিঃ আর্চ্চার যে অনেক অযৌক্তিক ও পক্ষপাতদুষ্ট ভাব পোষণ করেন কর্ম্মবাদকে 'অগভীর' বলা তাহার অন্যতম প্রমাণ। অপর খ্যাতনামা বহু লোক ত আছেনই, জগৎপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদেবের কথাই ধরুন। ইঁহারা কেহই 'অশিক্ষিত বর্ব্বর' ছিলেন না,

'অগভীর' চিন্তাশীলও ছিলেন না। তাঁহাদের গৃহীত ও প্রচারিত মতবাদ যদি অগভীর হইত, তাঁহারাও তেমনই হইতেন। বস্তুতঃ মিঃ আর্চ্চার ও অপর কতিপয় সমালোচক এই সমস্ত তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম; কারণ যেসমস্ত নীতির উপর কর্ম্মবাদ প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা সেইসমস্ত যথারীতি অনুধ্যান করেন নাই। কর্ম্মবাদ মনোবিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞ লোকের সাধারণ অভিজ্ঞতার ফল নহে। কতিপয় পাশ্চাত্য লেখক ইহাকে পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে বিচার করিতে চাহেন, তাহা নীতিবিরুদ্ধ। কর্ম্মবাদকে তাঁহারা নীতি এবং স্বাধীন ইচ্ছারও বিরোধী বলিয়া দেখাইতে চাহেন। বস্তুতঃ এতদপেক্ষা ভ্রমাত্মক আর কিছুই দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ন্যায় পাশ্চাত্য আদর্শবাদীরা সকলেই বলেন, সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব কর্ত্তা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে হইবে। কর্ত্তা এবং কর্ম্ম স্বতন্ত্র বলিয়া কর্ত্তার উপর কর্ম্ম কর্তৃত্ব করিতে পারে না; অর্থাৎ আত্মা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেও কর্ম্মের সমপদস্থ নহে, কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র। কাণ্ট যে জ্ঞানগম্য বিষয় ও সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়ে পার্থক্য করিয়াছেন আমরা এতৎপ্রসঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া দেখিতে পারি। ভারতীয়দের ন্যায় পাশ্চাত্য সংশয়-বাদীরাও আত্মাকে স্বাধীন বলেন। কিন্তু যাঁহারা বলেন, কর্ম্মসূত্র অখণ্ডনীয়, অর্থাৎ বিধির নির্ব্বন্ধ অনুসারে মানুষ যন্ত্রবৎ চালিত হইতেছে তাঁহারা কর্ম্মবাদের মূল তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। মুক্তির সম্ভাবনা ভারতীয় সকল ধর্ম্মমতেরই স্বীকার্য্য। কর্ম্ম যদি অনতিক্রম্য হয় তবে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? মুক্তিই মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার প্রমাণ। কর্ম্মবাদ এই মাত্র বলে যে মানব যে কাজ করে তাহার ফলভোগ তাহাকে করিতেই হয়। হয় ত সে কখন কি কাজ করিয়াছে

তাহা স্মরণ না থাকিতে পারে। কোন শিশু জন্মকালে যদি আঘাত পায় জ্ঞানের বা স্মৃতিশক্তির ত্রুটিবশতঃ সে ফলভোগ হইতে অব্যাহতি পায় না। পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে আমাদের যদি বর্ত্তমানে দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে তবে বর্ত্তমানে উত্তম কর্ম্মের দ্বারা নৈতিক উন্নতি সাধন করতঃ ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বীজ রোপণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। পাপকর্ম্মের ফলভারে দুর্ব্বল হওয়ায় আমাদের পক্ষে তাহা কষ্টসাধ্য হইলেও ইহা কিছু অসম্ভব নহে, কারণ যে আত্মা কর্ম্ম করেন তিনি যে স্বাধীন। খৃশ্চানধর্ম্মেরও মত এই যে জন্মগ্রহণের সময় মানব যে কোন দুরবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাহার যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে যাহার অনুশীলন দ্বারা সে সমস্ত প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে। কর্ম্মবাদ অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধতা স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার পরিবর্ত্তে মানবকে স্বয়ংই তাহার অদৃষ্টনিয়ামক হইতে বলে। মানুষ বর্ত্তমানে যেমন আছে সে নিজেই তাহা গড়িয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে এখন তাহাই গড়িতেছে।

কেহ কেহ বলেন, উত্তম ও মন্দ কর্ম্মে যে গুরুতর পার্থক্য আছে কর্ম্মবাদের নীতিসূত্রসমূহ তাহা দেখায় না। ইহাও নিতান্ত ভ্রমাত্মক। নিষ্কাম উত্তম কর্ম্ম কখনো বন্ধনের কারণ হয় না এবং প্রকৃত সাত্ত্বিক-ভাবে করিলে তাহা মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। সকাম উত্তম কর্ম্ম মানুষকে ইহজগতে সুখদান করে, মৃত্যুর পর তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া সেখানেও সুখ দেয়। সকাম মন্দ কর্ম্ম মানুষকে ইহকালে দুঃখযন্ত্রণা দেয়, এবং মৃত্যুর পরেও তাহাকে নরকস্থ করে এবং তাহার অশেষ দুঃখের কারণ হয়। সুতরাং তিন রকমের কর্ম্মে তিন রকমেরই ঘোরতর পার্থক্য রহিয়াছে দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—"কর্ম্ম উত্তম হইলেও তাহা যদি এই সংসারের কাহারো জন্য করা হয় তবে তদ্দ্বারা সংসার-বন্ধন ঘুচিবে না। যে স্বীয় বাসনার দ্বারা সংসারের সহিত আবদ্ধ থাকে

সে কিরূপে সংসার হইতে মুক্ত হইবে? যে পর্য্যন্ত মানুষ অন্তরে নিতান্ত সঙ্গত স্বার্থবাসনাও পোষণ করে সে পর্য্যন্ত সে সর্ব্বোচ্চ স্তর লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মবাদের উপর এমন দোষারোপও করা হয় যে সমাজ-সেবা এবং পরোপকারের স্থানও না কি ইহাতে নাই। সম্ভবতঃ খৃশ্চানদের ন্যায় যেসমস্ত ভারতবাসী নিজের শাস্ত্রসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতেই এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। ইঁহারা বলেন, যে যন্ত্রণা পাইতেছে তাহার যন্ত্রণা হ্রাস করা উচিত নহে, কারণ সে কর্ম্মফলই ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাঁহারা তাহা জানেন কিরূপে? তাঁহারা ত কর্ম্মফলদাতা নহেন যে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার উপযুক্ততা বুঝিতে সক্ষম হইবেন? তাহার দুঃখ হ্রাস হইবে না দণ্ডদাতার এমন কোন বিধান আছে কি? বস্তুতঃ তাহার যন্ত্রণা লাঘবের সর্ত্তও ত থাকিতে পারে। অধিকন্তু যিনি এইভাবে অন্যকে সাহায্যদান করিতে অস্বীকৃত হন, তজ্জন্য তিনিই প্রত্যবায়ভাগী হইবেন কি না, ইহাই প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব এই সমস্ত অযথা আপত্তি উত্থাপনের পরিবর্ত্তে তিনি সমাজসেবায় ও পরোপকারে ব্রতী হউন। বেদান্ত কর্ম্মবাদ স্বীকার করেন এবং বলেন,—যিনি পরের সেবা করেন, তিনি স্বীয় আত্মারই সেবা করেন। বেদান্ত সুদৃঢ় যুক্তির দ্বারা পরোপকার ও পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন সমর্থন করেন। প্রাগুক্ত অশ্রদ্ধেয় অভিযোগ খণ্ডন করিতে গিয়া ডাক্তার ডুসেন বলেন,—"সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র নৈতিক জ্ঞানই বেদান্তের প্রত্যক্ষ ফল। খৃশ্চানধর্ম্মের ভাগবতী কথাতে আছে 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভাল বাসিবে', ইহা খুব উচ্চ নৈতিক ধর্ম্মের কথা বটে।—আমি তাহা করিব কেন? প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সুখদুঃখের অনুভূতি আমার মধ্যেই, আমার প্রতিবেশীর মধ্যে ত নহে? বাইবেল ইহার

উত্তর দেন নাই। বেদের মহাবাক্যে তিনটিমাত্র শব্দে তাহা পাওয়া যায়,—'তৎ+ত্বম্+অসি'—সেও হও তুমি। ইহাতে মনোবিজ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞান উভয়েরই সার সত্য নিহিত রহিয়াছে।—তেমনই অন্য একটি বাক্য আছে "পরোপকারো হি পরমোধর্ম্মঃ"। এইরূপ মহদ্বাণী প্রচারক হিন্দুদের কত বিরাট লোক যে চলিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দুসমাজের স্তম্ভস্বরূপ থাকিয়া তাঁহারা তাহার গৌরববর্দ্ধন করিতেন। জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন,—শঙ্করাচার্য্যই সন্ন্যাসধর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়া সন্ন্যাসীদের মঠস্থাপনপূর্ব্বক মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমি মনে করি আরো একটু অতীতের দিকে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় বৌদ্ধেরাই সন্ন্যাসকে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়াছিলেন।। আমার নিজের মত এই যে ভারতের প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং ক্যাথলিকদের প্রকৃত মঙ্ক ও নান কেহই অপ্রয়োজনীয় নহেন।। ঘোর সাংসারিক দৃষ্টিতেই সন্ন্যাসীদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে। সন্ন্যাসীরা সংসারক্লিষ্ট জনসাধারণের উপর যে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেন তদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতিই উন্নত হয়। সে যাহা হউক বেদান্তে সমাজ-সেবার বিরুদ্ধে কিছুই নাই, এবং উপনিষদের সার যে গীতা তাহাতেও নাই; সংসারে নিঃস্বার্থ কর্ম্মবাদই গীতার উপদেশ। তেমনই শাক্ত বেদান্তমতে এই সংসারই মুক্তিক্ষেত্র। সত্য কথা এই, যাঁহারা ইহাতে বা অন্যান্য মতে দোষ আছে বলেন, এই সমস্তে দোষ আবিষ্কারই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

এইক্ষণ দর্শনশাস্ত্রের কথা রাখিয়া কার্য্যতঃ কি হইতেছে দেখা যাক্। ভারতের লোক কি একেবারে অকর্ম্মণ্য? তাহাদের কি কোন ইচ্ছা বা আশা নাই? ভারতের যে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ফলে মিঃ আর্চ্চার একটা গ্রন্থ লিখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা কি? যেসমস্ত

সামাজিক সংস্কার মিঃ আর্চ্চার ও অন্যান্যেরা সমর্থন করেন সেগুলি কি ? তাঁহারা যেসকল আন্দোলনের নিন্দা করেন সেই সকল রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া তাঁহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইতেছে বলিয়া নহে কি ? ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আবার মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে, আবার তাহার ধমনীতে জীবনী-শক্তির সঞ্চার হইতেছে, যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, ইত্যাদি বলিয়া মিঃ আর্চ্চার যাহার প্রতি উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কি ? বস্তুতঃ অন্য কোন ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় যুক্তিপূর্ণ নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যুক্তিহীন হইলে বেদই গ্রাহ্য হইত না।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যেই কর্ম্মবাদকে মেসার্স আর্চ্চারেরা আত্মাবসাদক, ইচ্ছাপনোদক ও সমাজধ্বংসকর বলেন,—পাশ্চাত্য প্রভাব এদেশে আসিবার বহু পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারত তাহা লইয়াই বাঁচিয়াছিল, এখনও বাঁচিয়া আছে, এবং যাহার জন্য আর্চ্চার প্রভৃতির এত উদ্বেগ—'সে এখনও মাথা খাড়া করিতেছে।' এই শক্তি সে কোথা হইতে পাইল ? আর্চ্চারেরা বলিতেছেন, ভারতের ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে তাহার আত্মস্থ থাকিবার দৃঢ় ইচ্ছাকে বিনষ্ট করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। আর একজন পাশ্চাত্য সংবাদপত্র-লেখক লিখিয়াছেন,—"বিফল হইয়াছে বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম রহিয়াছে।" ভারতের চিন্তাশীল লোকেরা মনে করেন এই সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই, বৈষয়িক উন্নতিই ইহাদের আদর্শ। হৈ চৈ সোরগোল ধ্বস্তাধ্বস্তি, আত্মপ্রচার ইত্যাদিকেই ইহারা উন্নতি বলে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরা আত্ম-ঘোষণা হইতে দূরে থাকিয়া সুদৃঢ় ইচ্ছাবলে নীরবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং তাঁহাদের সেই নীতিই যুগযুগান্ত ধরিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

ব্রাহ্মণ্য

(১০)

ব্রাহ্মণ্যই ভারত-ধর্ম্মের মূল, তাহার ভিত্তি বেদ। ইহা বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত। এক এক শাখা এক এক রূপে এবং এক এক প্রকার আচারপদ্ধতি অনুসারে ভগবানের অর্চ্চনা করে। কতিপয় মূল বিষয়ে সকলেরই মত একরূপ। কোন কোন বিষয়ে—যেমন পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধে সুতরাং মোক্ষলাভ সম্বন্ধে—এক এক সম্প্রদায়ের মত এক এক রূপ। এই সমস্ত পার্থক্যের সহিত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক অতি কম। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা ঐ সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদীদের সমুচিত উত্তরস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। এস্থলে সংক্ষেপে তেমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি :—

ভারতবর্ষ বহির্জগতের দৃশ্যমান বিষয় এবং ইন্দ্রিয়াদির নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। যদি না করিতেন তবে তিনি নিন্দার্হ হইতেন। বস্তুতঃ এই সকল বিষয় অবজ্ঞাত হইতে পারে না। সেই অনুভূতি শুধু ইন্দ্রিয়াদির শক্তিতে নিবদ্ধ নহে, আধ্যাত্মিক উপায়েও অনেক কিছু অনুভব করা যায়। বেদে তৎসমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ লোকেরা স্ব স্ব শক্তি অনুসারে সেই সব উপায় লাভ করিয়াছেন। সাধনাবলে মানব অতীন্দ্রিয় সত্যকে জানিতে পারেন। তৎসমস্ত সত্য বেদবিহিত উপায়েই জানা যায়। পরন্তু সেগুলি যুক্তি-বিরুদ্ধও নহে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্য কোন দেশ যুক্তির উপর অধিকতর

নির্ভর করে নাই। ভারতবর্ষের উপদেশ—যুক্তিযুক্ত হইলে বালকের বাক্যও গ্রহণ করিবে।

শাক্তাগমবিহিত তন্ত্রসমূহ বেদান্তের মর্ম্মানুসারে শিক্ষা দেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, এবং সমস্তই ব্রহ্ম—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই জগৎকে যে মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অন্য কথা। দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ অভিজ্ঞতার ফলে ঐরূপ মতভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু একের সহিত অন্যের বিরোধ নাই। এই বিষয় আমি অপরাপর প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি কিরূপ কার্য্যকরী নীতির উপর গ্রথিত এস্থলে কেবল তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম্ম, লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা যাহাতে লাভ হয় তেমন ভাবেই তাহার সমাজ সংঘটিত হইয়াছে। তজ্জন্য এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে, ইংরেজ পাঠকদের হয়ত মনে হইতে পারে যে ইহার সহিত সেই সমস্তের কোন সংশ্রব নাই। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত ভারতীয় চিন্তা সর্ব্বদা বস্তুর মূলেই লক্ষ্য রাখে।

শাক্তমতে এই জগৎ মহাশক্তির অভিব্যক্তি। যিনি সর্ব্বমঙ্গলময় শিব, বা পরমাত্মা তাঁহা হইতেই ইহার বিকাশ। ইনিই মহাদেবী অথবা বিশ্বজননীরূপে ব্যক্ত। বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান উভয়েই এক। শিব পরমাত্মার স্থির অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ, শক্তি গতিশীলা। শক্তি অসীমকে ত্যাগ করত সসীম মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন; পূর্ণ তাঁহারই অংশরূপে সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ হন। সৃষ্টিকে নিষেধ-ব্যাপাররূপা শক্তি অথবা অসীম পূর্ণের সসীম অংশ বলা হয়। অসীম চিৎশক্তি সীমাবদ্ধ অবয়ব গ্রহণ করেন। শিব ও শক্তির স্বরূপে বিশ্রামভোগের অবস্থায় আত্মাতেই আত্মা বিশুদ্ধ চিদানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। উহা নিরতিশয়

প্রেমাস্পদত্ব ও আনন্দত্বের অবস্থা। সেই অসীম ও অরূপ চিদাত্মাই আবার স্বীয় শক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ বিশ্বে প্রকটিত হন। বিষয়ানুভূতির পূর্ব্ব সংস্কারই তাহার কারণ। উহা পূর্ণ চিৎশক্তির নিম্ন স্তরে অবস্থিত, তাহাই কালবশে পূর্ণতা লাভ করিয়া বর্ত্তমান জগতের মনোময় ও অন্নময় কোষে পরিণত হয়। এইখানেই ভগবান তাঁহার স্বাভাবিক এবং অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দময়ত্বের কোনরূপ ব্যতিক্রম না করিয়াই মানব বা অন্যান্য সচেতন জীবরূপে সুখ ও দুঃখ উপভোগ করেন। চিদাত্মা প্রথমতঃ বিষয়ে জড়িত হইয়া পড়েন, তৎপর তাহা হইতে নির্গত হইয়া যান। এই বিবর্ত্তন প্রণালী বৃক্ষ-লতা কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী ও মানবরূপে চলিতেই আছে, ক্রমশঃ এক স্তর হইতে অন্য স্তরে অন্তরতম শিবের বা চিদাত্মার অধিকতর বিকাশ হইতেছে। মানুষ ও পশুর আত্মার পার্থক্য প্রকারভেদে নহে, স্তরভেদে। আত্মা মানবের সহিত ধর্ম্মজ্ঞানের স্তরে প্রবেশ করে। এইরূপে শিব জগতের আত্মা, এবং তিনিই শক্তিরূপে জগৎ। দেহ মন ও আত্মার সমবায়ে মানব দেবতা। কারণ, দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির সমস্তই ঐশ্বরিক, ঈশ্বরব্যতীত কিছুই নাই। "মানবই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড"। সমগ্র বহির্জগতে যাহা আছে এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই আছে। বিশ্বসারতন্ত্র বলেন,—"যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তদ্‌কচিৎ"। এই দেহে যাহা আছে জগতের সর্ব্বত্র তাহাই আছে, এই দেহে যাহা নাই অন্য কুত্রাপি তাহা মিলিবে না। ভগবানকে পাওয়ার জন্য স্বর্গরাজ্য ঘুরিবার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষ আত্মারূপে ঈশ্বর, দেহ ও মনরূপে তাঁহারই শক্তি। এইরূপে মানুষই ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া মানুষ এবং বিশ্বজগৎ উভয়ই সত্য। জগৎ যদিও পরিবর্ত্তনশীল এবং চিরস্থায়ী নহে তথাপি তাহা সত্য। এ জগৎ জীবসমূহের আকারে ঈশ্বরেরই আত্মানুভূতির বিকাশ ; ঈশ্বরানুভূতি কখনো অসত্য হইতে পারে না।

উত্তম মাত্রেই সত্য। মানুষ স্বীয় অদৃষ্টনিয়ন্ত্রণে স্বাধীন প্রভু বলিয়াই উত্তম সম্ভব। এখানে অদৃষ্টলিপি বলিয়া কিছুই নাই। মানুষ আজ যে অবস্থায় আছে সে নিজেই তাহা গড়িয়াছে, আজ যেভাবে নিজকে গড়িতেছে তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতি তদনুসারেই হইবে। উত্তম কিরূপ হওয়া উচিত? তাহা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে যেন তদ্দ্বারা উত্তম কর্ম্ম সাধিত হয়, এবং বিশ্বরূপী কর্ম্মরত আত্মা হইতে মানুষ যে অভিন্ন এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রত্যেক উত্তম আরম্ভ করিতে হইবে। জীবনকে যিনি এই বীরভাবে দেখেন তাঁহার দৈহিক প্রত্যেক কর্ম্ম এবং মানসিক প্রত্যেক চিন্তা ভগবদুদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ। প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বস্তু মূর্ত্ত জগন্মাতা। এই ভাবে যে মানব সামান্য অশন বসনে তৃপ্ত হইয়া সংযত জীবন যাপন করেন, তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই; অবশ্য যিনি প্রকৃত সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি অনায়াসে তাহা করিতে পারেন। কোন কোন পদ্ধতি অনুসারে উপাসনার পূর্ব্বে উপবাস করার রীতি আছে; কেহ কেহ ইহাকেও দোষাবহ মনে করেন। বলেন, দেহকে কষ্ট দিয়া যে উপাসনা করে কালিকা দেবী তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। "কারণ, শিব এবং জীব যখন এক, তখন জীবকে কষ্ট দিবে কেন?" কুচিন্তা এবং কুকর্ম্ম ব্যতীত কিছুই ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। জীব এবং বস্তুমাত্রেই যখন মূর্ত্তিময়ী জগন্মাতা তখন মানুষ ত্যাগ করিবে কাহাকে? এই জ্ঞান লইয়া যাহাকে ত্যাগ করিবে তাহাতেই ত জগন্মাতাকে ত্যাগ করা হইবে। স্ত্রীপুত্রাদির পরিপালনে, জ্ঞাতিবর্গের সুখ দুঃখে সহানুভূতি-প্রকাশে, অসহায়কে সাহায্যদানে, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় জগন্মাতারই সেবা এবং অর্চ্চনা করা হয়। তৎসমস্তের সেবায় পরমাত্মারই সেবা। উত্তমের পরিণাম কি? সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি। মন ও বস্তুর সহযোগে আত্মা মনুষ্যাকারে বিদ্যমান, এবং মানুষ আত্মস্থ কর্ম্মরত

শিবের সহিত সমবায়ে জগৎ প্রপঞ্চের বিকাশ করিতেছে; এই পরম তত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে নিরাকার বিশ্বোত্তীর্ণ পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া সাকারময় সংসার হইতে চরম মুক্তি বা মোক্ষলাভই উদ্যমের পরিণাম। জগৎপ্রপঞ্চে আবদ্ধ আত্মাকে ক্রমশঃ মুক্ত করাই প্রকৃত আত্মোন্নতিসাধন। যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির ও তাহার সম্প্রদায়ের আপাত প্রয়োজন ও চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধি অর্থাৎ ভুক্তি এবং মুক্তি উভয়ই লাভ হয় তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। ভারতীয় সমাজ সঙ্ঘটনের লক্ষ্য ছিল সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল বিধান। তদনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায় স্বীয় সমাজকে সুপরিচালিত করিয়া আসিতেছে। ইহাতে অবসাদজনক দুঃখ-বাদের কিছুই নাই; কারণ আনন্দসম্ভোগের ব্যবস্থা সমস্ত কার্য্যেই আছে। যে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন মনে করে না তাহাকে সন্ন্যাসী হইতে কেহ বলে না; কারণ, ভোগেই যে মুক্তির ব্যবস্থা আছে। অদৃষ্টলিপি বা ইচ্ছার অভাবের কথাও নাই; কারণ মানুষই তাহার অদৃষ্টনিয়ামক এবং সে নিজেই তাহার অতীত ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। ইহাকে সমাজ-বিরোধী বলিবারও উপায় নাই, কারণ ইহাতে জীবন সম্যক্‌রূপে উপভোগ করা যায়; স্বজাতীয় মানবগণ ও অপরাপর জীবজন্তু সকলই একই মায়ের অভিব্যক্তি—এইভাব লইয়া মানুষকে চলিতে হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এই উপদেশ সকলেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করুক, আর নাই করুক, ইহা যে অতি মহৎ এবং সর্ব্বরকমের মতবাদের স্থান ইহাতে আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

মিঃ আর্চ্চার তাঁহার অন্য এক গ্রন্থে মিঃ এইচ, জি, ওয়েল্‌সের 'God the invisible King' (অদৃশ্য রাজা ভগবান) নামক পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছেন, "মিঃ ওয়েলস্ অনেকটা ভারতীয় ধর্ম্মভাবের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এইরূপ কিছু একটাকে পূজা করার আগ্রহ দেখিয়া

মনে হয় সুন্দর ইউরোপীয় বুদ্ধিতেও এসিয়ার ধার্ম্মিকতার বাতিক দেখা দিয়াছে। সম্ভবতঃ ধার্ম্মিকতার এই সংক্রামক ব্যাধি মহাযুদ্ধেরই একটা ফল।”—আর এক স্থলে লিখিয়াছেন,—“আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে, পাশ্চাত্য খৃশ্চানধর্ম্মের একটা মস্ত সুবিধা এই যে কেহই ইহাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে না। কেহই না, বলিলে অঙ্কশাস্ত্র মতে ঠিক না হইতে পারে, তবে প্রায়ই ঐরূপ। ধর্ম্ম জানিতে হইলে এসিয়ায় যাওয়া চাই, ততদূর যদি যাইতে না পারেন রুষিয়া পর্য্যন্ত গেলেই অর্দ্ধপথের খবর পাইবেন, কিন্তু ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব জানিতে হইলে ভারতবর্ষে যাইতে হইবে। সুয়েজ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে কোথাও খৃশ্চানরাজ্যের মত সবল নিরীশ্বরত্ব আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ওঁকারের দেশে স্বাধীন ভাব অতি বিরল ও অতি দুর্লভ। খৃশ্চানদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিকার কম বলিয়া যে এই পার্থক্য এমন নহে, আমি মনে করি, জাতীয় বংশপরম্পরাগত বদ্ধমূল সংস্কারের পার্থক্যই ইহার কারণ। আমরা পাশ্চাত্য আর্য্যদের মূলে গ্রীস ও রোমের সুবিমল গৌরবোজ্জ্বল যুক্তিবাদ রহিয়াছে। শৈশব হইতে আমরা বুঝিতে অভ্যস্থ যে মানসী-শক্তিসম্পন্ন দুই বিরাট সভ্যজাতি আমাদের সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; ধর্ম্ম যেমন আমাদের কাছে তেমনই তাঁহাদের কাছে মনোরম পরীর গল্প বই আর কিছুই ছিল না। এসিয়ার মুক্তিকামীরা যেমন পাপাধম অনুতপ্ত দীনাতিদীনের ভাব লইয়া চলে জগতের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করিতে গিয়া তেমন কোন ভাব প্রকাশ করেন না। গ্রীস ও রোমের প্রতিও ভক্তির ভাব এখন অনেকেরই নাই। সংসারে মাথা উচু করিয়া চলার এবং শিশুর ন্যায় ঈশ্বরের আঁচল ধরিয়া না চলার ভাবই অনেকের দেখা যায়।”—মিঃ আর্চ্চারের এই সকল উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা আবশ্যক। খৃশ্চানধর্ম্মে যে অনেকের আস্থা নাই

তাহা ঠিক। মিঃ আর্চ্চার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত পাশ্চাত্য অনেকেই যে সহানুভূতি দেখাইবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ্রীসের জ্ঞান গৌরব এবং রোমের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিকেরা ব্যতীত অন্যেরা তেমন সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন না, এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বা অন্য রকমের দীনতা যে ইংরেজ প্রভৃতির অসহনীয়, তাহাও ঠিক ; কিন্তু মিঃ আর্চ্চার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতেই গোল পাকাইয়াছেন। মিঃ ওয়েল্‌সের 'Veild Being' এবং 'God King' সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের কতকটা প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে ভারতীয় যে তত্ত্বজ্ঞানের উপর মিঃ ওয়েল্‌সের ভিত্তি বলিয়া মিঃ আর্চ্চার বলেন তৎপ্রতি তাঁহার ঐরূপ মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। বুঝিয়া দেখিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, ভারতের যে ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বোচ্চ চিন্তাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত তাহা মানবকে বিশ্বাতীত কোন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেয় না, একমাত্র নিজের ও আত্মার উপরই নির্ভর করিতে বলে, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ইহাও যুক্তি এবং মানব-প্রকৃতির স্বাধীনতাই সমর্থন করে, পাপাত্মা বলিয়া পরিতাপ বা হীন কাকুতিমিনতি ইহাতে নাই। এই ভাবের অভিযোগ খৃশ্চানদের, এবং ভারতের দ্বৈতবাদীদের সম্বন্ধে করা যাইতে পারে। কারণ, তাঁহারা ভগবানকে নিজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহারই পদে আত্মনিবেদন করেন। বস্তুতঃ খৃশ্চানেরাই ভারতীয় উচ্চ ধর্ম্মমতের নিন্দা করিয়া বলেন যে,—ইহারা আত্মপাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন না, ইহারা ভগবদ্বিরোধী, বৃথাভিমানে প্রমত্ত হইয়া নিজকেই ভগবান মনে করেন। মিঃ ওয়েল্‌সের মতানুসারে ঈশ্বররাজকে যিনি স্বীকার করেন না উঁহাকে তিনি 'প্রভুহীন মানুষ' বলেন। মিঃ আর্চ্চার জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন "আমাদের পাশ্চাত্যবুদ্ধিতে মানুষ প্রভুহীন হওয়া কি বাস্তবিক দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক ? তাহা যদি কাহারো পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয় তাহার জন্য রোমানক্যাথলিক গীর্জার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।" শাক্ত বেদান্ত-মতে মানুষ নিজেই নিজের প্রভু. আত্মাই আত্মার অর্চ্চনা করে ; জগতের যাবতীয় আনন্দোপভোগের কর্ত্তা আত্মা, তাঁহার শান্ত প্রকৃতিই মুক্তি। সংসারের দুঃখযন্ত্রণার ভয়ে বীর সাধক সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করেন না। তাঁহার ধর্ম্ম সমাজবিরোধীও নহে, কারণ তিনি জানেন যে ইহজগতের সমস্ত মানুষ ও যাবতীয় প্রাণিবর্গ সকলেই এক আত্মারূপিণী মহামায়ার অভিব্যক্তি এবং পরস্পর সম্বদ্ধ ; এইখানেই মানুষের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। আত্মাব্যতীত অন্য কাহারো আশ্রয় তিনি চাহেন না। তিনি সংসারকে করতলগত করিয়া তাহার রহস্য উদ্ভেদ করেন। ইহাতে অদৃষ্টলিপির কোন কথা নাই, ইচ্ছাশক্তির অভাবও নাই ; কারণ মানুষ নিজেই নিজের অদৃষ্টনিয়ন্তা, তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সে নিজেই দায়ী। আত্মজ্ঞানবিমূঢ় মানবসমাজ সংসারাবর্ত্তে ঘুরিতেছে, বীরসাধক সংসারের মায়াপাশ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই নিজের জ্যোতিষ্মান প্রভু, হয়ত ইহসংসারে আত্মশক্তির বিকাশ করিতেছেন, অথবা ইচ্ছামাত্র তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

'যুক্তিবাদী' মহাশয় হয়ত বলিতে পারেন এই সমস্ত ভারতবাসীর মনোবিজ্ঞানসম্ভূত স্বপ্নদর্শন। ভাল, তবে জিজ্ঞাস্য মিঃ আর্চ্চার ও তন্মতাবলম্বীরা তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে কি দিতে চাহেন ? উত্তরে বলিতে পারেন, 'তাহারা কেবল অভাবের মাত্রা বাড়াইতে থাকুক এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক উচ্চ আদর্শের অনুশীলন করুক'। কিন্তু সাধারণতঃ কি দেখিতে পাই ? অভাবের মাত্রা বাড়াইতে গিয়া মানুষ উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হয়, তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতা যে হীন পার্থিব ভোগের

প্রচুর সম্ভার যোগাইয়া থাকে তাহাতেই ডুবিয়া পড়ে। অতঃপর উপায় কি? উত্তর,—"তাহা হইলে মানবজাতির প্রতি তাহার শ্রদ্ধার ভাব জন্মাইতে হইবে।" কিন্তু যে মানবজাতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইব তাহা কি? মানবগণ যেসময় পরস্পরে স্বাভাবিক ঐক্য হারাইয়াছে সেই সময় হইতে তাহারা একে অন্যের শত্রু হইয়াছে। অবশ্য যাহারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। মিঃ আর্চ্চার বলেন,—"মানুষের অন্তরে ব্যক্তিগত এবং স্বীয় পরিবারের স্বার্থ হইতে উচ্চতর কোন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য।" যাহাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এইখানে সেই মনোবিজ্ঞানেই যে তিনি স্বয়ং অতি সাংঘাতিকভাবে জড়াইয়া পড়িলেন। ঐ 'কোন বিষয়' কি? তাহা কি ভাবে চাহে? যে চাহে তাহাকে কোন বিষয় বলেন কেন? তাঁহার বিদ্যমানতা কিরূপে জানিব? মিঃ আর্চ্চার কোন্ নিশ্চয়তা বলে বলিতে চাহেন যে উহা স্বয়ং আমরা নহি? কেন মনে করেন না যে উহা আমাদেরই জ্ঞানবিশিষ্ট একটা উচ্চস্তর? যে চাহে তাহার স্বরূপ কি? এবং কেনই বা চাহে? আমরা তাহার আদেশ মানিব কেন? না মানিলে ফল কি দাঁড়াইবে? এই সমস্ত তাঁহার চিন্তায় স্থান পায় নাই। এইরূপ অপরিপক্ক চিন্তাশক্তি লইয়া ভারতের মহোচ্চ দর্শনশাস্ত্রের দোষপ্রদর্শন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র মতে সমস্ত প্রাণিজগৎ এক পরমাত্মারই অভিব্যক্তি, প্রত্যেকেই ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ, এবং তদনুসারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ন্যায়ানুগ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হইতেছে। পরমাত্মা ও মানুষের অন্তরাত্মা এক; ব্যক্তিগত স্বার্থ সীমাবদ্ধ আত্মারই অভিব্যক্তি, তাহা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে, কেন না যে পরমাত্মা সমস্ত মানবের ভিতরে আছেন এবং বিভিন্ন মানবরূপে বিকাশ

পাইতেছেন তিনি এক। সুখ এবং দুঃখ আত্মারই অনুমোদিত; এই দৃশ্যমান জগতের মূল সুবিমল শান্তিপূর্ণ। জাগতিক সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ও শান্তি উহারই প্রতিবিম্ব। তাহার সহিত ঐক্য রাখিয়া চলিলেই সুখ, তদ্বিরোধী হইলেই দুঃখ। এই সমস্তের প্রমাণ কি? প্রত্যেক মানবের সাংসারিক অভিজ্ঞতা। সকলেই জানেন যে মন্দ কর্ম্মের পরিণাম দুঃখ। তদ্ব্যতীত আমাদের মহাপুরুষেরা এবং জগদাত্মার অবতারগণ উচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফলে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন।

আত্মপ্রকাশ

(১১)

ভারতীয় সভ্যতার মহত্ত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য নানা কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাও সত্য যে ভারতীয়েরা বৈদেশিকদের শাসনাধীন। এই পরাধীনতা তাহাদের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞতার পরিচায়ক নহে বলিয়াও বলা যাইতে পারে। কারণ, যাহার প্রেরণায় মানুষের অন্তরে স্বাধীন আত্ম-নির্ভরতার ভাব জন্মে এবং সেইভাব মানুষকে সতত সাহস, তেজস্বিতা ও স্বীয় জাতির আদর্শানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করে প্রবৃত্তি মার্গে উহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সংক্ষেপতঃ সম্যক্ স্বাধীন মানবতাই যথার্থ ধর্ম্ম। যাহারা রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতায় পরের অধীন তাহাদের সেই ধর্ম্মজ্ঞান থাকিতে পারে না। পরন্তু স্বাধীনতা যথার্থ আধ্যাত্মিকতারও পরিচায়ক। হিন্দুশাস্ত্রের সুমহৎ 'স্বরাজ্যসিদ্ধি' শব্দেই—জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রে নিজে নিজকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার ভাব নিহিত রহিয়াছে। এই মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ শুধু পাশ্চাত্যভাবের রাজনৈতিক ও জাগতিক স্বাধীনতার দ্যোতক নহে, আত্মার স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তিও ইহার অন্তর্নিহিত।

ভারতবাসীর মধ্যে এই পার্থিব ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব ঘটিল কেন? মিঃ আর্চ্চার এবং অপরাপরেরা বলেন, 'তাহাদের পরাধীনতাই তাহাদের ধর্ম্ম-হীনতার প্রমাণ;—তাহাদের ক্রমবিকাশের গতি বন্ধ হওয়ায়, পাপপূর্ণ ভিত্তিতে তাহাদের সভ্যতা গঠিত হওয়ায় এবং তাহারা কৃত্রিম আদর্শ অনুসরণ করে বলিয়া তাহাদের এই অধঃপাত ঘটিয়াছে।' তেমনই, যে

খৃশ্চানধর্ম্ম জগতে শান্তির অগ্রদূত বলিয়া কথিত কেহ কেহ তাহাকেও নররক্তে ধরাবক্ষ প্লাবনের ও ঘৃণিত ঐশ্বর্য্যস্তূপের কারণ বলেন। যে ক্ষেত্রেই হউক দোষ নীতির নহে, তৎপ্রতি তাচ্ছীল্যে ও অপব্যবহারে। ঐ নীতি অনুসারে চলেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা সেই নীতির ভাব যথাযথ ব্যক্ত করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম বলিয়াই এইরূপ অধঃপাত ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার হেতু সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, উত্থান পতন কর্ম্মপ্রবণতা ও বিশ্রাম ইত্যাদির তাল ও লয় অনুসারে সমগ্র বিশ্ব যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে সকল জাতিকেই তেমনভাবে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হয়। হিন্দু-ভারত কিছুকাল সেই চক্রনেমীর নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে,—হয়ত এইখানেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহার চরম প্রলয় ঘটিবে ; অথবা নিত্যপ্রলয় বা প্রাত্যহিক সুষুপ্তির ন্যায় ইহা তাহার ক্ষণিক অকর্ম্মণ্যতা, ইহা কাটিয়া গেলে সে নব-দিবসের সুপ্রভাতে নব-শক্তি লইয়া উত্থিত হইবে। যদি প্রথমটি অর্থাৎ তাহার মৃত্যুই অবধারিত হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার প্রচারিত সত্য গ্রহণের জন্য পাশ্চাত্য রাজ্য এবং প্রাচ্য রাজ্যের নূতন সভ্যতা প্রস্তুত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাহার জীবন নির্দ্দিষ্ট ছিল, আর যদি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ক্ষণিক অকর্ম্মণ্যতারূপ সুষুপ্তি হয় তবে তাহা হইতে উত্থিত হইয়া ভারত তাহার মৌলিক শক্তির দ্বারা নূতনভাবে নূতন সময়ের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবে। তজ্জন্য তাহার সমাজ-অবয়বের বাহ্যিক পরিবর্ত্তনও যথাসম্ভব হইবে। যেরূপেই হউক জগতের চরম প্রলয় পর্য্যন্ত ভারত তাহার মূল প্রভাব লইয়া বিদ্যমান থাকিবে। ভারত বলিতে এখনও ভারতের যেসমস্ত বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি।

প্রথম রকমের পরিণাম অর্থাৎ ভারতের শেষ প্রলয় উপস্থিত,—এইরূপ

সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান অবস্থার কারণ কি এবং তাহা দূর করা সম্ভব কি না তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। অবগত হইতে পারিলে ভারতীয় সভ্যতার ত্রুটিতে এই অধঃপতন ঘটিয়াছে কি না বিচার করা যাইবে। বর্ত্তমান অবস্থার কারণ ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ও পরে দুই স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর,—ভারতের অধঃপতন বা অকর্ম্মণ্যতা, যাহার ফলে ভারতের দ্বার মুসলমান আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল; দ্বিতীয় স্তরে সেই অধঃপতন ও অকর্ম্মণ্যতার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলে ভারতের জীবনী-শক্তি নূতন তেজে উদ্দীপিত হইতেছে।

এইক্ষণ চাই শক্তি। দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় মানুষের মূল ভগবান,—এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচ্যে প্রতীচ্যে সর্ব্বত্র শক্তি-বোধ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। ভারতবাসীর বর্ত্তমান আচরণ যাহাই হউক, যদি জগতে কেহ আত্মনির্ভরতার শাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকে তবে একমাত্র ভারতবাসীই করিয়াছে। আজ ভারতের সকলে কার্য্যতঃ আত্মনির্ভর নহে; তাহার কারণ দৈহিক দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা এবং গুণগ্রাহিতার অভাব। ইহা বড়ই কৌতুকজনক যে, যে পাশ্চাত্যজাতিসমূহের ধর্ম্মশাস্ত্র নম্রভাবে থাকিতে, নিজকে ক্ষুদ্র মনে করিতে ও পরনির্ভর হইতে শিক্ষা দেয় তাহারাই এইক্ষণ কার্য্যতঃ আত্মনির্ভর, আর যে ভারতের মহোচ্চ ধর্ম্ম মানুষকে স্বীয় অদৃষ্টনিয়ন্তা হইতে, নিজকে বিশ্বের প্রপঞ্চশক্তির সহিত একীভূত মনে করিতে এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভই (স্বরাজ্যসিদ্ধি) তাহার চরম লক্ষ্য মনে করিতে শিক্ষা দেয় সেই ভারতবাসীরা আজ আত্মনির্ভরতা হারাইয়া বসিয়াছে। কারণ, পরাৎপরা মাতৃশক্তির ঐরূপ বিশুদ্ধ উপাসনা-প্রণালী যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাক্তধর্ম্মেই আছে, ভারতবাসী আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

শক্তি ত্রিবিধা ঃ—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শাক্তধর্ম্ম মতে মানুষই সকল শক্তির ভাণ্ডার। শাক্ত-সাধক বলেন, প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে শক্তিরূপিণী মা বিরাজমানা রহিয়াছেন। কিরূপে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করা যায়, তাহাই প্রধান সমস্যা। জনসাধারণের মধ্যে স্থূলদেহের ব্যাপার লইয়াই সর্ব্বাগ্রে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈহিক দুর্ব্বলতা। ভারতীয় জনসাধারণের বিষম দারিদ্র্যই ইহার কারণ। তাহারা অন্নাভাবগ্রস্ত। অন্নই শক্তি, কারণ তাহাই দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎস। অন্নই ব্রহ্ম, অতএব সর্ব্বাগ্রে অন্নকেই বন্দনা করি। পুষ্টিহীনতা হইতে রোগের উৎপত্তি হয়। যেই সময়ে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সেই সময়ে প্রতি সপ্তাহে ভারতের ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার লোক প্লেগে মারা পড়িতেছে ১০ হইতে ১২ হাজার মরিতেছে ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া রোগের অন্ততঃ একটা কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—রেলওয়ে রাস্তা-সমূহের দ্বারা দেশের স্বাভাবিক প্রয়ঃপ্রণালীগুলি বন্ধ হওয়া এবং নদীতে চড়াপড়া। ভারত গবর্ণমেণ্টের সেনিটারী কমিশনার ১৮৯৮ ইংরেজী সনের জুলাই হইতে ১৯১৮ ইংরেজীর জুন পর্য্যন্ত ২০ বৎসরের প্লেগের রিপোর্টে দেখাইয়াছেন যে গড়ে প্রতি বৎসর ১২॥ লক্ষ লোক এই রোগে মারা গিয়াছে। যক্ষ্মারোগের প্রভাবও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। জনৈক ইংরেজ ডাক্তার বলিয়াছেন, ইদানীং যক্ষ্মারোগই কলিকাতার ছাত্র ও দরিদ্র জনসাধারণকে ধ্বংস করিতেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত রোগের সংহারলীলা চলিতেছে। কার্য্যও আবার তাহার কারণের সৃষ্টি করে; মৃত্যু ও দুর্ব্বলতা মানুষকে এতই অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে যে তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি পালন করিয়া চলিতে পারে না। বর্ত্তমানে যেমন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রও তেমনভাবে নিরূপণ করিয়া দিত দেশের

লোকের সেদিকে মনোযোগ নাই। দরিদ্রেরাই অধিক পরিমাণে রোগ ভোগ করে এবং অধিক পরিমাণে মারা যায়, তাহাই দরিদ্রতার সহিত রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ। খাদ্যের অভাব ঘটিলে, দেহ রোগজীর্ণ হইলে মন দুর্ব্বল হইবেই। খাদ্যের দ্বারাই মন পুষ্ট হয়। দেহ সুস্থ ও বলসম্পন্ন না থাকিলে জড়তা ও অবসাদ জন্মে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও উদ্যমশীলতা থাকে না। ভারতকে আগে খাইয়া পুষ্ট হইতে দাও, তারপর দেখ, তাহার এই সমস্ত জড়তা অবসাদ, উদ্যমহীনতা ইত্যাদি দূর হয় কি না। মিঃ আর্চ্চার প্রভৃতি যে বলেন,—কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসধর্ম্ম ইত্যাদিই এদেশের লোককে অকর্ম্মণ্য করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে; অন্নাভাব ও তজ্জাত প্রবল ব্যাধিসমূহই তাহার মূল কারণ। আগে দেহকে সবল করিয়া তোল, তবেই সবল দেহে মনোবল স্ফুরিত হইবে।

মনই অন্তঃকরণ, তাহার উপরেই দেহ নির্ভর করে। মানুষের অন্তঃকরণ যদি বিনষ্ট হইয়া যায় তবে তাহার সর্ব্বস্ব যায়। ভারতবাসীর অন্তঃকরণ এখনও সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু সেই আশঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌ও নহে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত লর্ড মেকলের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অধ্যাপক সিলি লিখিয়াছেন,—"ইহা হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কখনো আলোচিত হয় নাই। আমরা ভারতবাসীকে সভ্য বানাইবার জন্য তাহাদের শিক্ষাদাতারূপে যে অগ্রসর হইয়াছিলাম,—ইহাই অশেষ মহত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার। মেকলের সেই মন্তব্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক বিরাট স্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়া আছে,—কারণ ইহা সভ্যতার প্রতিষ্ঠান। একদিন রোম ইউরোপে যাহা করিয়াছিল, আমরাও আজ এসিয়ায় তদ্রূপ ব্যাপারের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি!"

ইংরেজের ভারতকে শিক্ষা দেওয়া এবং সভ্য করার কথা স্বজাতীয় মহত্ত্বসম্বন্ধে যাহার কণামাত্র আত্মজ্ঞানও আছে তেমন ভারতবাসীর পক্ষে

যে বিষম মর্ম্মন্তুদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের জাতি যেসমস্ত সত্য শিক্ষা করিয়াছে তাহার নিগূঢ়তম কয়েকটী ভারতই শিক্ষা দিয়াছেন, সেই ভারতকেই 'শিক্ষিত করা'! ভারতের স্বীয় ভাবধারা ও পরম্পরাগত সংস্কার যদি সুরক্ষিত না হয়, ভারতের প্রাণবল যদি হ্রাস হইতে থাকে, তবে ভারতবাসী পরাশ্রয়ী হইবেই। ভারতকে সভ্য করার সঙ্কল্প লইয়া যেসমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন বিষয়ে ভারতের মঙ্গল হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অমঙ্গল ও বিপদের দিক্‌ও আছে। ইহা ভারতবাসীকে নূতন জীবন দিয়াছে এবং ভারতবাসীর চোখ খুলিয়াছে,—এই হিসাবে মঙ্গল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে ভারতীয়দের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা মনে করিত যে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই ভাল; তাই তাহার প্রাচীন যাহা কিছু তৎসমস্তকেই অগ্রাহ্য ও তুচ্ছ করিত। এখনও তেমন কতকগুলি লোক আছে। আত্মার প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হওয়ায় ইহারা পরানুকরণপ্রিয় হইয়াছে, পরের ভাবানুসারে চলে, তাহাদের নিজের কিছুই নাই। এইরূপেই আত্মা দুর্ব্বল হইয়া যায়। অপরেরা যত বড়ই হউক না কেন তাহাদের আত্মার সাহায্যে আমরা কখনো শক্তিশালী হইতে পারিব না। ঘুমন্ত মানুষকে জাগাইয়া দিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার আত্মকর্ম্ম স্বীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি অনুসারেই চলিবে, কথাবার্ত্তা বলা ও চলাফেরা সে তাহার স্বীয় শক্তি অনুসারেই করিবে। পৃথিবীর একভাগ অন্যভাগ হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে। ভারত যেসময়ে আলস্য অকর্ম্মণ্যতায় আচ্ছন্ন ছিল সেই সময়ে পাশ্চাত্য দেশ যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে সে তাহা ভারতকে শিক্ষা দিতে পারে। পরন্তু ইংরেজী সভ্যতার প্রকৃত কাজ হইবে অকর্ম্মণ্য ভারতের উপর ব্লিষ্টার প্রয়োগদ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন।

আমার অভিমতকে কেহ 'নিরতিশয় অমঙ্গলবাদ' বলিয়াছেন।

যেসমস্ত পাশ্চাত্যবাসীর লক্ষ্য ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ভাবকে জাগ্রত করা নহে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তদুপরি প্রতিষ্ঠিত করা, তাহাদের পক্ষে এইরূপ মন্তব্য স্বাভাবিক। অন্যের সাধনা অগ্রসর হইতেছে দেখিলে আমার আনন্দই হয়। ইহাতে অমঙ্গলের কিছুই ত দেখি না। বিভিন্ন জাতি যদি আত্মসাধনার দ্বারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে তবে সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল হইবে। তেমনই যাহাতে কিছু গুরুত্ব আছে তাহাকে যদি চাপিয়া রাখা হয়, এবং সে যদি পরানুকরণে গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসিতে থাকে তবে জগতেরই অমঙ্গল হইবে। ভারতের ন্যায় আমিও স্বধর্ম্মে বিশ্বাস করি। তুমিও বাঁচ, আমাকেও বাঁচিতে দাও। প্রত্যেকে আপনার মঙ্গলসাধনে অবহিত হও। অপর এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, —"আপনি বরাবর পার্থক্যের ভাব লইয়াই কথা বলেন"। হাঁ, আমি তাহাই করি। কারণ, পার্থক্য যে রহিয়াছে। বর্ত্তমানের পার্থক্যমূলক ব্যাপারই ত আমার আলোচ্য বিষয়। স্বয়ং প্রকৃতিরাজ্যেই পার্থক্য বিদ্যমান, এজন্য আমি সাধনায় বা অন্য বিষয়ে খিচুড়ি পাকাইতে চাই না। এই সমস্ত বিভিন্নতার পশ্চাতে যে একতা আছে, বিভিন্নরূপ অভিব্যক্তি যে একেরই বিকাশ তাহাও আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসানুযায়ী যদি আমরা চলি, তবে অপরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ বা অত্যাচার না করিয়াও আমরা স্বীয় স্বীয় আত্মপ্রকাশের কার্য্য লইয়াই থাকিতে পারি। তাহা হইলে সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ক্রমশঃ পার্থক্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাইবে। আমার বিশ্বাস, একদিন এই সমস্ত পার্থক্য চলিয়া যাইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য স্বীয় ধর্ম্মানুসারে নিজকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা, যেন ভবিষ্যতে যে সুসভ্য একতার সময় আসিবে তাহাতে সকলে স্ব স্ব যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারি। কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে কিম্বা আধ্যাত্মিক জগতে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখনই তাহাদের মধ্যে

ঘনিষ্ঠতা জন্মে ; যতদিন অবিকশিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর অসংলগ্ন থাকে ততদিন তাহাদের মধ্যে তেমন সুসভ্যোচিত ঘনিষ্ঠতাস্থাপন সম্ভবপর নহে। এজন্য যখনই আমি দেখি যে ভারতের মনোরম আভিজাত্য ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইতেছে, অভিজাতগণ নিজেদের অতীত গৌরব ও সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া হিতাহিত জ্ঞানবর্জ্জিত বৈদেশিক অনুকরণে মত্ত হইয়াছে (গুণের জন্য নহে শুধু বৈদেশিক বলিয়া), নানা কৃত্রিম ও মিথ্যা আচরণ আরম্ভ করিয়াছে তখন আমার অন্তরে ভয়ঙ্কর ক্রোধ জন্মে। ব্রিটিশ ও আইরিষ জাতি তাহাদের জাতীয় আদর্শের প্রতি যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবান তাহাদের কাছে সেইটুকু ভারতীয়দের শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। ব্রিটিশ ও আইরিষেরা আত্মনির্ভর ও আত্মনিষ্ঠ। তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহারা পরের দিকে তাকাইয়া থাকে না। পর হইতে অতি সামান্যই গ্রহণ করে, যাহা করে তাহাও নিজের স্বাধীন ভাবানুসারেই করে, পরানুগত্যের ভাবে নহে। সহস্র সহস্র ভারতবাসী ত ইংরেজ সাজিয়াছে, তাহাদের তুলনায় কয়টি ইউরোপীয় অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে ? ইহাতে এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে হিন্দু সভ্যতা অপেক্ষা ইংরেজী সভ্যতা শ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র প্রমাণ হয় যে বর্ত্তমানে হিন্দু অপেক্ষা ইংরেজেরা অধিক শক্তিমান। কোন জাতি যে নিজের ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া বৈদেশিক ভাষাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে, স্বজাতীয় আচার ব্যবহারকে, স্বজাতীয় 'অতীত গৌরবময় সাধনাকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্য করিয়া পরের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিবে, আত্মনিষ্ঠ কোন পাশ্চাত্য ব্যক্তি তাহা ধারণাও করিতে পারে না। ভারতে কিন্তু তাহাই হইয়াছে। ভারতের বহুলোক ব্রিটনের মানসপুত্র সাজিয়াছে। তাই ইহাদের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের এতই অভাব। ব্রিটিশ জাতি রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে সকলের শিরোমণি,

সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাদের চিন্তাপ্রণালীর অনুসরণ প্রয়োজন হইলেও ভারতবাসীকে ভারতের আদর্শ এবং ভারতের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অপর সকল বিষয়ের ন্যায় এতদ্বিষয়েও ভারতের অতীত ইতিহাস, তাহার স্বভাব, তাহার যোগ্যতা এবং ভারতীয় জনসাধারণের অভাব সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিতে হইবে। জনৈক নেতৃস্থানীয় ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আপনি কেন ইংরেজের অনুকরণ করেন?' তিনি উত্তর দিলেন,—'কারণ ইংরেজী শিখিয়াছি।' —বস্তুতঃ অন্য কোনরূপ চিন্তাই যে তিনি করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্রনীতি কলুষিত বলিয়া বিবেচিত, কারণ অনেক সময় তাহাই দেখা যায়। তথায় রাষ্ট্রীয় নেতারা স্বজাতীয়দের সেবার পরিবর্ত্তে তাহাদের সাহায্যে নিজেদের জীবনযাত্রার ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। ভারতের মহোচ্চ জ্ঞান ভারতের গুরু ব্রাহ্মণকে অর্থপিপাসা ও ভোগবিলাস হইতে দূরে রাখিয়াছিল। বারাণসীর শ্রীযুক্ত ভগবান দাস এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—প্রাচীন ভারতে সম্মান, ক্ষমতা ও অর্থ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যথাক্রমে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতিতে তেমন বিভাগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রথম রোগোপশম চাই অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা, পরে তদ্দ্বারাই সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্যান্য বিষয়ক কর্ম্মতৎপরতা ধর্ম্মভাবে পূত হওয়া চাই। তৎপর ভারতের সাধনা যাহাতে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থার আবশ্যক। 'স্বাধীনভাবে অগ্রসরের' কথা বলিতেছি, কারণ আত্মবিকাশের জন্য, স্বীয় সাধনার উপাদান নির্ণয়ের জন্য, কোনরূপ বাধ্যতার চাপে না পড়িয়া প্রত্যেকেই যেন স্বাভাবিক ভাবে চলিতে পারে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই যেন ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া উঠে, এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

ভারতীয় নীতিসমূহের চর্চ্চা করিতে করিতে যেমন ব্যক্তি তেমনই

রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে সমষ্টিভাব বিকাশ পায় ব্যক্তি তাহারই অংশমাত্র। বাহ্যিক আকার পরিবর্ত্তনে বিশেষ কিছু আসে যায় না। যেসব কর্ম্মী সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন করেন তাঁহাদের উপরই ফল নির্ভর করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যাঁহারা পরিচালন করিবেন তাঁহাদের নৈতিক বল এবং বুদ্ধিবলের উপরই উহাদের সফলতা নির্ভর করিবে। তৃতীয়তঃ ভারতীয় সাধনার বীজ সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিলে তজ্জাত বৃক্ষ ভারতীয়ই হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রের বাহ্যিক্ ব্যাপারেও তাহার আন্তরিক ভাবেরই বিকাশ দেখা যাইবে।

আত্মা যদি ভারতীয় হয় তাহার গৃহীত আকারও ভারতের উপযোগী হইবে, এবং তাহা ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা, মানসীশক্তি এবং পার্থিব ব্যাপারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই করিবে। ভারতের অতীত যুগে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্প ও শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা ছিল, সমস্ত সজীব বস্তুর মত ভারতেরও আত্মসংরক্ষণ ও প্রয়োজন হইলে পুরাতন ত্যাগ করিয়া নূতন গ্রহণ করিবারও শক্তি ছিল। তখন ভারত পরের কাছে কিছুই ধার করিত না, পরের ইঙ্গিতে চলিত না। যে ভারত অতীতে এমন সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে আজ তেমন পারিবে না বলা যায় কি? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, কারণ নূতন কিছু করিবার শক্তি তাহার নাই, অতীতে যে-শক্তি শক্তিবলে ভারত আপনাকে গড়িয়াছিল তাহারই প্রেরণায় এখনও সে চলিতেছে।

যদি তাহাই হয়, তবে ভারতের সর্ব্বোত্তম কার্য্য হইবে পাশ্চাত্য রাজ্যে যেসমস্ত অধ্যাত্ম শক্তি তথাকার জনসাধারণের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য

ব্যগ্র হইয়াছে তাহাদের আনুকূল্য করা। তাহা হইলে তাহার অন্তিমকালে অন্ততঃ এই শান্তি ও স্বস্তি লইয়া যাইতে পারিবে যে তাহারই নীতি অনুসারে চলিয়া অন্যেরা উপকৃত হইতেছে। কিন্তু আমরা সে চিন্তা করিতে চাই না। মৃত্যুর চিন্তা করা, আর মরিতে আরম্ভ করা একই কথা ; মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন মৃত্যু-চিন্তাই সর্ব্বাগ্রে তাহার মনে উদিত হয়। জীবনের আশা ত্যাগ পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে মরি না।

ভারতবাসী কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, "এই সব কথা ত বেশ, কিন্তু আপনার কার্য্যোপযোগী সিদ্ধান্ত কি ? সাধারণ নীতি যতই উত্তম হউক না কেন, তাহাই ত চূড়ান্ত নহে, সেগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে কি ভাবে ?"—এইরূপ প্রশ্ন দুর্ব্বল রোগজীর্ণ ব্যক্তিরই উপযোগী। সজীব বলবান ব্যক্তির নিকট এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপনমাত্রই সে উত্তর দিবে প্রাণ নিজের সমস্যা নিজেই সর্ব্বদা পূরণ করে। প্রাণবন্ত জীবের সম্মুখে যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাকে লইয়াই সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। তেমন কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা এই গ্রন্থের লক্ষ্য নহে। তেমন লক্ষ্য হইলেও ভারতীয়েরা নিজে যখন তাহার মীমাংসা করিবে তখনই তাহা যথার্থ কার্য্যকরী হইবে। তাহারা যদি তাহাদের নিজের অভাব কি তাহা না জানে, কি উপায়ে তাহা দূর করিবে তাহাও না জানে, তবে অন্যে কিরূপে তাহা করিয়া দিবে ? বৈদেশিকদের উদ্দেশ্য যত সাধুই হউক না কেন, ভারতের বিশেষ প্রয়োজন কি তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন ? তাঁহারা স্ব স্ব নীতি অনুসারেই ত চলিবেন। তথাপি ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান স্বভাব এবং যেসমস্ত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তাহার গৌরবমণ্ডিত অতীত সমাজ গঠিত হইয়াছিল, নিবিড়ভাবে তৎসমস্ত অনুধাবন করিলে তাহার প্রয়োজন কি তাহা বুঝিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ভারতবাসীরা স্বয়ং চেষ্টা করিলেই বিশেষ সফলকাম হইবেন।

চেষ্টা করিলে তাঁহারা ভারতের মূল নীতি কি এবং কিরূপে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে তাহা জানিতে পারেন। কিন্তু কয়জন তাহা করেন? দু'একজন ব্যতীত ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার—বিশেষভাবে যেসমস্ত ইংরেজ ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালন করেন তাঁহাদের রীতিনীতির বিষয়ই ধ্যান করেন; কারণ উঁহাদের অনুগ্রহভিক্ষাই যে তাঁহাদের লক্ষ্য। তেমনই ব্যবহারশাস্ত্র [আইন] সম্বন্ধে। ভারতের বিশুদ্ধ মূলনীতি অনুসারে কোন আইন প্রণয়নের চেষ্টা যে কেহ করিয়াছেন আমি তাহা অবগত নহি। ভারতের শিক্ষিত আইনজ্ঞেরা অষ্টিন, বেন্থাম, সেভিগ্‌নি প্রভৃতির বা মার্কিণ আইনজ্ঞদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, বা কোন্ নীতি অনুসারে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি প্রণীত ও সমাজ গঠিত হইয়াছে তাহা অধ্যয়ন করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। অবশ্য কয়েকটি বিশেষ বিষয় লইয়া হিন্দু-আইন প্রণীত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবহার-শাস্ত্রের বিশ্লেষণ দ্বারা যে বর্ত্তমান প্রচলিত আইনসমূহ প্রণীত হয় নাই আমি তাহাই বলিতেছি। আমার দৃঢ় প্রতীতি, ভারতীয়েরা যদি নিজেদের সাধনায় নিয়োজিত থাকে এবং ভারতবাসী যাহারা স্বীয় আত্মাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহারা যদি তাহা পুনর্লাভ করে তবে সেই ভারতাত্মাই ভারতের প্রত্যেক সমস্যার ভারতীয়ভাবে যথোচিত সমাধান করিয়া দিবে। সে আত্মা আধ্যাত্মিক হইবে, তাহার ইচ্ছাশক্তি সম্যক্‌রূপে আত্মরক্ষার্থ প্রযত্ন করিবে, এবং তাহাই সকল দিকে সফলতা আনয়ন করিবে। পরের ভাব লইয়া চিন্তা করিলে তাহারই ছায়ায় পরিণত হইতে হয়; ছায়া অন্যের উপর নির্ভর করে, অন্যের অনুগামী হয়। আমাদের স্বীয় প্রকৃতি যাহা চাহে একমাত্র আমরা নিজেই তাহা দিতে পারি। স্থূল কথা, ভারত নিজেই তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবে। যদি সে

আত্মস্থ ও সুদৃঢ় হয় তবে রাষ্ট্রনৈতিক স্বরাজ্যলাভের ইচ্ছাও করিবে, এবং অনতিকালমধ্যেই হউক, বা কিছুকাল পরেই হউক তৎসমস্তই লাভ করিবে।

ধর্ম্ম এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় চিৎরাজ্যের ব্যাপারেও সেই পরানুকরণ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপনিষদের প্রশংসা করিয়াছেন, তাই ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয়েরাও তাহার ভক্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একজন উপনিষদের নিন্দাবাদ করিলে অপর একজনের প্রশংসাবাদ দ্বারা তাহা খণ্ডন করা যায়, কিন্তু উপনিষদের গুরুত্ব তাহার সত্যে, কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের প্রশংসায় নহে। সামান্য সামান্য বিষয়েও ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয়দের এইরূপ পর-প্রত্যয়িত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক ইংরেজীভাবাপন্ন বাঙ্গালী আমেরিকা হইতে আনীত 'পাপ্‌ট্ রাইস্' নামক এক নূতন দ্রব্য খাওয়াইবার জন্য অপর এক বাঙ্গালী ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইনি দেখিলেন যে উহা আর কিছুই নহে, এদেশের সাধারণ 'মুড়ি'। পার্থক্য এই—আমেরিকা হইতে আনীত মুড়িগুলি বাসী, এবং দেশীয়গুলি টাট্‌কা। তেমনই এদেশের 'দই'। ইংরেজীভাবাপন্ন ভারতীয়েরা দইকেও ইংরেজের ন্যায় ঘৃণা করিত, কিন্তু প্রফেসার মেচিন্‌কফ্ যেদিন দইয়ের ভিতর স্বাস্থ্যবর্দ্ধক 'বুলগেরিয়ান বেচিলাস্' আবিষ্কার করিলেন সেইদিন হইতে তাহা উপাদেয় বলিয়া আদৃত হইতেছে। এইরূপে ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, সামাজিক প্রথা ও আচারব্যবহার যাহা কিছু সমস্তই 'পাপ্‌ট্ রাইসের' ন্যায় বিদেশীয়দের ছাপমারা হইলেই ইংরেজীশিক্ষিতেরা পরমোপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করেন। মিঃ লরেন্স 'হাউস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন,—"ভারতের স্থির করিতে হইবে,—তিনি কি আত্মস্থ থাকিবেন, না অপরের ছায়ায় পরিণত হইবেন।

ভারতের আন্দোলন কি ভারতকে ইউরোপীয় রুচি অনুসারে গঠিত কতক-গুলি লোকের আবাসস্থানে পরিণত করিবার জন্য ? ভারত কি এইক্ষণ নিজকে জানিতে ব্যগ্র, না অন্যকে ? তিনি কি আপনার, না অন্যের আত্মাকে পাইতে চাহেন ?—এই সমস্ত সমস্যা ভারতকেই সমাধান করিতে হইবে।”

ভারতবাসী পুরুষানুক্রমে যে সাধনার অধিকারী হইয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণ তাহা হইতেই তাহাদের মানসীশক্তি লাভ করিবে। অধ্যাত্ম-শক্তি সম্বন্ধেও তাহাই। যাহারা কোন ধর্ম্মকে শুধু ভারতের ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়া আছে, অথচ তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, আমি তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। তদ্দ্বারা মানবপ্রকৃতিতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তাহাকেই কলুষিত করা হয়। প্রকৃত ধর্ম্মের মূল সত্ত্বতা। যাহারা খৃশ্চানধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, এবং স্বীয় সন্তানেরা খৃশ্চান হউক ইহাও ইচ্ছা করে না, অথচ সুলভ বলিয়া বা তেমন শিক্ষার দ্বারা আর্থিক সুবিধা হইবে ভাবিয়া উহাদিগকে খৃশ্চান মিশন স্কুলে সমর্পণ করে, আমি তাহাদেরও বিরোধী। ইহার ফল হইয়াছে, কতিপয় ইংরেজীশিক্ষিত ভারতবাসীর মন ধর্ম্মসম্বন্ধে নানামতের গোল পাকাইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এমন কদর্য্য খিচুড়ি আর কিছুরই হয় না। ইহা অতি সুস্পষ্ট এবং সকলেরই স্বীকৃত বিষয় যে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি না হইলে এবং ধর্ম্ম সহায় না হইলে কোন শক্তিই যথার্থ শক্তি নহে,—তাহা হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান, পজিটিভিষ্ট বা যে কোন ধর্ম্মই হউক। যদি 'সাহেব' সাজিবার ভাব মনে না থাকে, তবে খৃশ্চান হইয়া খৃশ্চানধর্ম্মের মূল নীতি অনুসারে চলিয়াও ভারতীয় থাকা যায়। ভারতে বহু রকমের ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে দ্বৈতবাদীদের ধর্ম্মের সহিত খৃশ্চানধর্ম্মের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় ধর্ম্ম বলিতে অনেকে একমাত্র অদ্বৈতবেদান্তমূলক ধর্ম্মই মনে করেন। আবার অনেকে ভারতীয় সাধনার বাস্তব ব্যাপার ও নীতি

বুঝিতে ভুল করেন, বা বুঝিতে চাহেন না। আমি ত দেখি যে ভারতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও রীতিনীতির সহিত ক্যাথলিক খৃশ্চানধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে। তৎসম্বন্ধে আমি আমার "শক্তি ও শাক্ত" গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। খৃশ্চান মিশনারীরা হিন্দুধর্ম্মের যেসমস্ত উপদেশ ও আচরণ তাঁহাদের ধর্ম্মের অনুকূল সেই সমস্ত অবলম্বন করত তাঁহাদের ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সর্ব্বদা হিন্দুধর্ম্মকে কেন আক্রমণ করেন, স্নানাধারের জল ফেলিতে গিয়া তৎস্থিত শিশুকে কেন বিসর্জ্জন দেন, তাহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। 'পাষণ্ড' 'অন্ধকারে আছে' ইত্যাদি গালাগালি দিয়া ইহাদের ক্রোধ উদ্রেক্ করার পরিবর্ত্তে কিছু কাজ হইতে পারে যদি মিশনারীরা প্রাগুক্ত উপায় অবলম্বন করেন, এবং তাঁহারা যথার্থ সাধু হন। এখনও দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, ভারতীয় খৃশ্চানেরা হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও জাতিভেদ প্রথা মানিয়া চলে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে খৃশ্চানধর্ম্মের মূলে যে 'সেমিটিক' ভাব রহিয়াছে তাহা আর্য্যদের নীতি ও সভ্যতার বিরোধী। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে 'জুডা' ধর্ম্ম হইতেই খৃশ্চানধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, ওল্ড টেষ্টামেণ্টের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ধর্ম্মের ব্যত্যয় না ঘটাইয়াও খৃশ্চান-ধর্ম্মের নব্য সংস্কার হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য বা অন্য কারণে পুরাতন ধর্ম্মপুস্তকের ভীষণ উক্তিগুলি ব্যবহৃত হইলেও ইদানীং সেগুলির প্রতি জনমত তেমন আকৃষ্ট নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য খৃশ্চানী প্রভুত্ব এড়াইতে পারিলে ভারতীয় খৃশ্চানদের ধর্ম্ম হয়ত তাহার নূতন ব্যাখ্যা প্রকাশ করিবে, এবং তাহা ভারতীয় রূপই গ্রহণ করিবে। আমার মনে হয় সম্ভবতঃ এই আশঙ্কাতেই ভারতীয় কেহ বিশপের পদ পাইলেও একজন ইউরোপীয়কে তাঁহার সহকারীরূপে রাখা হয়, পাছে তিনি ইউরোপীয় রীতি হইতে স্খলিত হন! হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অপর সকল

ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিবার যে অদ্ভুত শক্তি আছে খৃশ্চান মিশনারীরা তাহাকেই বিশেষ ভয় করেন; তাঁহাদের মতে তাহার যথার্থ হেতুও আছে। কেহ কেহ অন্যান্য দেশবাসীকে ইউরোপীয়দের ন্যায় গড়িবার কথা বলেন। তৎসম্বন্ধে নাইগেরিয়ার ক্যাথলিক ভাইকার এপষ্টলিকের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—আফ্রিকাবাসীদিগের জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়াই রোম তাহাদিগকে খৃশ্চান করিতেছিল। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছিলেন,—আফ্রিকার পৌত্তলিকেরা ইউরোপীয় সভ্যতা অবলম্বন করিতে গিয়া তাহার একটি গুণও গ্রহণ করিত না, কেবল দোষসমূহই অনুকরণ করিত। তাই আফ্রিকাবাসীদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতেই পাদ্রী ও নান তৈয়ারী করা হইত; অর্থাৎ আফ্রিকাবাসীরা যেভাবে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত তেমন ভাবেই তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে তেমন ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই আছে, শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যাহার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকু অনায়াসে পাইতে পারে। যাহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে ধর্ম্মের আচরণ করিয়া গিয়াছেন তাহার পক্ষে তাহাই সর্ব্বোত্তম। যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী তাঁহারাও যদি সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন হন, তবে স্বীকার করিবেন যে একেবারে ধর্ম্মহীন হওয়া অপেক্ষা যে কোনরূপ ধর্ম্ম লইয়া থাকা শ্রেয়ঃ। তাহা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে যদি কোনরূপ জ্ঞান ও বিশুদ্ধভাব লাভ করা না যায় তবে তাহাকে ত্যাগ করতঃ অন্য কিছু গ্রহণ বা নূতন কিছু উদ্ভাবন করা যাইতে পারে।

ডবলিউ ই এস্ হল্যাণ্ড নামক জনৈক খৃশ্চান মিশনারী সম্প্রতি 'ভারতের লক্ষ্য' (Goal of India) নামক এক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ভারতীয় কংগ্রেসের ইংরেজী ভাষায় রচিত যে উদ্বোধন সঙ্গীত

উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার ভাষা এইরূপ ঃ—"Oh most gracious God and Father হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে 'Providence' 'Thy unworthy servants' 'Thy Holy name, spirit and will'. Glorify Thy name,' অবশেষে amen' শব্দে সমাপ্ত। তৎপর তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন ইহারা ত খৃশ্চানই হইয়াছে, একেবারে প্রকাশ্যে খৃশ্চান-ধর্ম্ম অবলম্বন করে না কেন ?" মিঃ হল্যাণ্ড ভুল বুঝিয়াছেন। প্রকৃত কথা, ঐ সঙ্গীতরচয়িতা ও গায়কেরা যে খৃশ্চানধর্ম্মে বিশ্বাস করেন তাহা নহে। বর্ত্তমানে ভারতের কতিপয় লোক যেমন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ও সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করিতেছেন তেমনই পাশ্চাত্য ধর্ম্মপুস্তকের ভাষারও অনুকরণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, খৃশ্চানধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলেও তাহাদের অনেকে খৃশ্চানী প্রভাবে প্রভাবান্বিত, অনেকে পোষাক পরিচ্ছদ ও আচারে ব্যবহারেও খৃশ্চান সাজিতেছে, এমন কি তাহাদের স্বজাতীয় যাঁহারা তাহাদের পন্থানুসরণ করেন নাই তাঁহাদেরে ইহারা অবজ্ঞা করে। একজন ঐরূপ ভাবাপন্ন বাঙ্গালী আমার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে 'হিন্দু বালকেরা বয় স্কাউট্‌স্ হওয়ার উপযোগী নহে, কারণ তাহারা লিঙ্গ-পূজার কথা ভাবে, তাহাদের মধ্য হইতে ঐ অপবিত্র ভাব দূর করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।'—এইরূপ ঘৃণিত ও হাস্যস্কর উক্তি খৃশ্চান মিশনারীদের তরফ হইতেই আসিয়াছে। যাঁহারা লিঙ্গপূজা করেন, তাঁহারা উহাতে কোনরূপ অশ্লীলতা দেখেন না। খৃশ্চান মিশনারীরা এবং কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকই তেমন দেখেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—'ভারত যদি ইংরেজ সাজেন তবে তাঁহার মৃত্যুই হইল বুঝিতে হইবে।' তাহাই যদি হয় তবে যেসকল ব্যাপার সেই পরিণামের মধ্যবর্ত্তী স্তর স্বরূপ হইবে তৎসমস্তই দুর্ব্বলতার

পরিচায়ক। ভারতবাসী উত্তম আহারে পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া স্বীয় সাধনার ধারানুসারে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া যদি বিফল হয় তবে তখনই আলোচনা করিবার সময় আসিবে যে ইহার সাধনার প্রণালীসমূহ তজ্জন্য দায়ী কি না, যদি হয় তবে কোন্ সম্বন্ধে এবং কি পরিমাণ।

সম্প্রতি কিছু দিন হইতে স্বীয় সভ্যতার দিকে ভারতীয়দের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ, তাহাদের মধ্যে জাতীয় বিবেক-বুদ্ধি জাগিয়াছে এবং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি গলদ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এইক্ষণ অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—"বৈদ্য, আগে নিজে আরোগ্য হও।" একথাও অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন.—রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে গিয়া যদি জাতির আত্মা বিনষ্ট হয় তবে সেই চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। পক্ষান্তরে বলা যায়,—সাধনার গুরুত্ব রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব অপেক্ষা ন্যূন নহে। হয়ত এমন প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হইবে, পূর্ব্বে যেমন কতকগুলি লোক অবিচারিত ভাবে পাশ্চাত্য সাধনাকে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিল অদূর ভবিষ্যতে তেমনই ঘৃণার সহিত তাহাকে ত্যাগ করিবে। এইক্ষণ ভারতীয়েরা তাহাদের যাহা কিছু তাহারই উচ্চ প্রশংসা করিতেছে। তাহা যদি অতিরিক্ত হয় তাহাও মন্দের ভাল। হীন পরানুকরণ ও পরপ্রত্যয়িত বুদ্ধি অপেক্ষা অন্য যাহা কিছু শ্রেয়ঃ। ভারতবাসীর পক্ষে গৌরব ও আনন্দের কথা এই যে তাঁহাদের মধ্যে স্বাধীন ভাবের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, মিঃ আর্চ্চার কিন্তু তাহারই বিরুদ্ধ। তিনি বরাবরই বলেন,—ভারতীয়েরা নির্ব্বোধ দাম্ভিক, তাহাদের বর্ব্বরতাকেই তাহারা উচ্চ সভ্যতা বলিয়া বৃথাভিমান করে। হিন্দুরা বা অন্য কোন জাতি যে ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত তাহাও তিনি স্বীকার করেন না।

কার্য্যতঃ দেখাইতে না পারিলেও নিজকে অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করার দুর্ব্বলতা যে কেবল ভারতীয়দের আছে এমন নহে। ইংরেজেরাও বিদেশীকে (এমন কি ইউরোপের অন্য প্রদেশবাসী হইলেও) নিজ হইতে হেয় মনে করেন। একটা কৌতুকজনক ব্যাপার মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে ঘটিয়াছিল। জনৈক ইংরেজ মহিলা জার্ম্মণ দেশে গিয়াছিলেন। সেখানে বিদেশীয়দের সম্বন্ধে পুলিশের খুব কড়াকড়ি নিয়ম আছে। উক্ত মহিলা তাহাতে খুব বিরক্ত হইয়া আমার জনৈক বন্ধুকে তাহা বলেন। তাঁহাকে যখন বলা হইল 'বৈদেশিক মাত্রেরই সম্বন্ধে এই নিয়ম', তখন তিনি বলিলেন,—'আমি বিদেশী নহি, আমি ইংরেজ রমণী।' জার্ম্মণ রাজ্যে গিয়াও তিনি যে নিজকে বিদেশী মনে করিতে পারেন নাই ইহাতেই বিদেশীর প্রতি তাঁহার ঘৃণা যে কত প্রবল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজের দেশ ও নিজের সভ্যতা সম্বন্ধে অধিকাংশ ইংরেজই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁহারা জগতের 'নৈতিক গুরু' বলিয়া দাবী করিতেও শুনা যায়। অধিকাংশ ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রকাশিত হইতেছে, কেহ কেহ ত প্রভুত্বের ভাবই প্রকাশ করেন। জার্ম্মণেরা বলেন,—'জার্ম্মেণিই সর্ব্বোপরি।' টিউটন জাতির আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধে এত নিন্দাবাদের মধ্যেই মিঃ এ সি হিল নামক এক ব্যক্তি "খৃশ্চান প্রভুত্ববাদ" নামক এক পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্যই ব্রিটিশ জাতির আবির্ভাব এবং প্রমাণ করিতে চাহেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ধর্ম্মপ্রাণতার দ্বারাই অনুশাসিত। তিনি ব্রিটিশ জাতির চরিত্রকে গৌরবোজ্জ্বল প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিখিয়াছেন,—"ব্রিটিশ জাতি ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত এবং জগতে মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য সৃষ্ট।" "ব্রিটিশ জাতির জীবনযাত্রার প্রণালী যীশুখৃষ্টের অনুমোদিত।" "খৃশ্চান-ধর্ম্মের নৈতিক গুরুত্ব ব্রিটিশ জাতির

মত অন্য কেহ উপলব্ধি করে নাই।" "চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অবগত আছেন ইংলণ্ডের সাহিত্যই জীবনের সারতথ্যস্বরূপ, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এইরূপ গর্ব্ব ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশের লোকেরা করেন। এংলো-স্যাক্সনেরা বিরাট জাতি, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, স্বীয় জাতীয়তা জ্ঞান এবং তাহার আদর্শের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবলেই বর্ত্তমানে তাঁহারা এত শক্তিশালী হইয়াছেন। তাঁহারা আরো বড় হইবেন যখন তাঁহারা অপর জাতিসমূহের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে তৎপ্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিবেন। জননী এবং জন্মভূমির পূজার যেমন সার্থকতা আছে জাতির পূজারও আছে। অবশ্য তাহা অনুচিত হইতে পারে, অন্যের নিকট তাহার বিবরণ কটুও লাগিতে পারে; তথাপি আমি তাহাকে ভাল বলিব, কিন্তু যাহারা পরহিতৈষণার ভান করিয়া পরের প্রতি তাহাদের আন্তরিক ঘৃণার ভাব গোপন করতঃ কেবলই নিজেদের স্বার্থ খোঁজে তাহাদের ব্যবহারকে আমি ভাল বলিতে পারি না। ভারতবাসীর ভিতর দাম্ভিকতা থাকিতে পারে, অন্যান্য জাতির ভিতরও কম নাই।

অন্যান্যের ন্যায় ইংরেজেরাও বহু বিষয়ে বিজয়লাভ করতঃ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেমের দাবী অত্যন্ত অতিরিক্ত বিবেচিত হইলেও তাঁহাদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কার্য্যতঃ তাঁহারা যাহা দেখাইতেছেন তাহাই তাহার প্রমাণ। প্রাচ্য জাতির সহিত তুলনায় তাঁহারা নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। যদিও উদ্যমশীলতার জন্য এবং প্রাচ্য জাতির উপর তাঁহারা অধিকার বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া সে দাবী করিতে পারেন তথাপি ঐরূপ মনোভাব তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মম্ভরি ও সঙ্কীর্ণ করিয়াছে, এজন্য অপর সভ্যতার পরিমাণ করিতে তাঁহারা অসমর্থ। ভারতীয় লেখকেরা বরাবর দেখাইয়া

আসিতেছেন যে পাশ্চাত্যেরা নিজের আদর্শকেই প্রামাণিক মনে করেন এবং অন্তের আদর্শ যদি তেমন না হয় তবে তাঁহারা মনে করেন যে হয় তাহা নিকৃষ্ট অকিঞ্চিৎকর, অথবা অশ্রদ্ধেয়। নিরপেক্ষভাবে অন্য সভ্যতার বিচার করিতে পারেন এমন লোক অতি বিরল। জাতীয় অহঙ্কারদৃপ্ত এই বিচারমূঢ়তা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক বিরোধের কারণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে জাত্যভিমান অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতের বহু লোক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করিয়াও শাস্ত্রজ্ঞতার বাহাদুরী করে, নিজেরা বিষয়-মোহাচ্ছন্ন হইয়াও পাশ্চাত্য বিষয়বুদ্ধির নিন্দা করে, যেন পাশ্চাত্যেরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। জনৈক ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিষয়ান্ধতার ফলেই বর্ত্তমান যুদ্ধ ঘটিয়াছে। "মডারণ্ রিভিউর" জনৈক লেখক সেই উক্তি উদ্ধৃত করত লিখিয়াছেন,—"প্রত্যেক বিষয়ী ভারতবাসীর ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব করিবার জন্য ইহা উদ্ধৃত করি নাই। জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদর্শ লইয়া সেই জাতির সকল লোকের বিচার করা যায় না। প্রত্যেকের স্বীয় কার্য্য দেখিয়াই বিচার করিতে হয়। আমাদেরও অনেকেই বিষয়ী। পার্থক্য এই, আমরা দুর্ব্বল, আমাদের বিষয়ের গণ্ডী ক্ষুদ্র; পাশ্চাত্যেরা উদ্যমশীল বিষয়ী, তাহারা বিরাট ব্যাপার লইয়া চলে। মূল কথা, যেভাবে বৈষয়িক ব্যাপারে সফলতা লাভ করা যায় আমরা তেমন ভাবে চলি কি না? ইহাও দেখিতে হইবে পাশ্চাত্য আদর্শস্থানীয় লোকেরা যেভাবে নিজের দোষ স্বীকারপূর্ব্বক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন আমরা তেমন করি কি না।"— পক্ষান্তরে বলা যায়, যেমন এদেশে তেমনই পাশ্চাত্য দেশেও অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ লোক আছেন। ধর্ম্ম না থাকিলে কোন সভ্যতাই টিকিতে পারে না।

ইহাও সত্য যে ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত লোকও আছেন, অসাধারণ শক্তিশালী লোকও আছেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে গ্রীস দেশের লোকেরা চমৎকার কলাবিদ্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে, ভারতের লোকেরা ধর্ম্মে ও গভীর তত্ত্বপূর্ণ মনোবিজ্ঞানে এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা অন্যান্য বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সংস্কার

(১২)

হিন্দুর বিশ্বাস, মনের শূন্যাবস্থা লইয়া কোন মানব জন্মগ্রহণ করে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসংখ্য জন্মের অতীত অভিজ্ঞতার বহু ইতিহাস মনের ভিতর যে ভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে মন সেই সকলকে সঙ্গে সঙ্গেই লইয়া আসে। তৎসমস্তকে সংস্কার বলা হয়। সংস্কার অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি গঠন করে। ইউরোপীয়েরা যাহাকে সহজ জ্ঞান ও আন্তরিক ভাব বলেন সেই দুইটিই সংস্কারের অন্তর্গত। সংস্কার যেমন ব্যক্তিগত, তেমনই জাতিগত। এক এক জাতীয় লোকদের মনোবৃত্তি প্রায়ই এক একটা বিশেষ রূপ ধারণ করে। সংস্কারের বিকাশ দ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে ইনি ইংরেজ, ইনি ভারতীয়, ইনি ফরাসী, ইত্যাদি। সংস্কার ব্যক্তির বা জাতির মূল উপাদান সংঘটন করে। কারণ উহা বিগত জন্মজন্মান্তরের ভাব ও কর্ম্মসমূহের সারাংশ এবং তাহাদের সাধারণ পরিণামস্বরূপ। বস্তুতঃ সংস্কারের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। মানব যে সংস্কার লইয়া দেহ ধারণ করে তাহার প্রবৃত্তি, ভাব ও কর্ম্মেই সেই সংস্কারের বিশেষ প্রকৃতি বিকাশ পায়। সংস্কারকে ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে মানবের বীজ বলা যাইতে পারে। সংস্কারের ফলেই এক এক ব্যক্তি বা এক এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। যেমন প্রাণময় কোষে অবিচ্ছিন্ন ধারায় জীবাণুসমূহ বিরাজ করে তেমনই জাতির মনোময় কোষে তাহার সাধারণ আত্মা নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, অন্নময় কোষে দৈহিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার স্তর আছে, তৎসমস্তের সংস্কারের ধারা কোন কোনটা স্বতন্ত্র ভাবে, কোন

কোনটা বা পরস্পর সহযোগে ক্রমাগত চলিতেছে ; তাহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয়। ভারতের বর্ত্তমান সমষ্টিগত সংস্কার অতীত সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত। যদিও যুগে যুগে তাহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি তাহা যেমন সমভাবে চলিয়া আসিতেছে পাশ্চাত্য রাজ্যে তেমন দেখা যায় না। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে পড়েন নাই এমন যেসমস্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু আজও যথার্থ জাতীয় ভাবে চলিতেছেন তাঁহারা অতীত-কালের হিন্দুর মতই রহিয়াছেন। একই মানুষ যেন যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরেজ পুরুষ ও রমণীরা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তি-গণ হইতে অনেক পৃথক্। তাঁহাদের সংস্কার অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তদ্দরুণ তাঁহাদের প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চিত্রাদিতে প্রাচীন জন বুলের আকার ও প্রকৃতির যে আভাস পাওয়া যায় বর্ত্তমান ইংলিশম্যানদের ভিতর তাহা নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতেও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারাই সংস্কার জন্মে, ভাবের ক্রিয়াও এই কর্ম্মসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন,—"মানুষ যেমন চিন্তা করে তেমনই হইয়া যায়"। যে সর্ব্বদা অর্থচিন্তা করে এবং অর্থসঞ্চয়েই আনন্দ পায় সে কৃপণ হইয়া থাকে। এই হেতু বিশুদ্ধ স্বভাবগঠনের নৈতিক ব্যবস্থাসমূহ সর্ব্বত্র একই ভাবাপন্ন। যাঁহারা তেমন নীতি অনুসারে চলেন তাঁহারা জানেন সামান্য একটি মন্দ কর্ম্মও অপর মন্দ কর্ম্ম করিতে মানুষকে প্ররোচিত করে। একটি মন্দ কর্ম্ম করিলে আরো অধিকতর মন্দ কর্ম্ম করিতে প্রলোভন জন্মে, এবং এইরূপে মন্দ কর্ম্মের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ এত বর্দ্ধিত ও দৃঢ়মূল হইয়া যায় যে তাহাকে বিদূরিত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য দেশের অতিরিক্ত মদ্যপায়ীদের কথা ধরুন। মদ্যপায়ীর যাবতীয় কদর্য্য প্রভাব তাহার আত্মার উপর অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাই সংস্কার। তাহার মৃত্যুর পর তাহার

আত্মা নূতন দেহ ধারণ করিলেও তাহার গত জীবনের সংস্কার অনুসারে চলিতে চেষ্টা করে। অবশ্য সংযম দ্বারা তাহাকে দমন করা যায়। ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি এযাবৎ ধর্ম্মমূলকই চলিয়া আসিতেছে। কারণ, আবহমান কাল ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষদের ধারা অনুসারে ভারতীয় শিশুরা জীবনকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিতে এবং গুরুজনের নিকট বিনীত ও ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হইতে শিক্ষা করে। ফলে তাহাদের অন্তর আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। ইংরেজী শিক্ষিত বহু ভারতীয় পরিবারে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা যদি ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তবে ভারতের এই বিশেষ সংস্কার চাপা পড়িয়া যাইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে এমন এক অবস্থা আসিবে যখন বালকবালিকারা শ্রদ্ধাহীন হইবে, গুরুজনের শাসন অগ্রাহ্য করিবে, অবাধ্য হইবে, ইহকালের সাময়িক বিষয় লইয়া যুক্তিবাদী হইবে, ভগবানে অবিশ্বাসী হইবে। ক্রমাগত কয়েক পুরুষ যদি এইভাবে চলে তবে ইহাদের মধ্যে এমন এক দানবপ্রকৃতি জন্মিবে যখন তাহারা নিজেরা কাটাকাটি করিয়া মরিতে থাকিবে।

মনে রাখিতে হইবে, সংস্কার বলিতে যে ব্যক্তিতে তাহা প্রকাশ পায় তাহাকে বাদ দিয়া কোন একটা বিশেষ বস্তু, ভাব বা কার্য্যকে বুঝায় না। ইহা অতীতের বহু বিশেষত্বের সার, এবং ভবিষ্যতে তাহাই আবার সেইরূপ বিশেষত্ব উৎপাদন করে। ইহাও সত্য যে কোন বিশেষ সংস্কারের ভিতর এমন বিশেষত্বের ও কর্ম্মের বীজ রহিয়াছে যে উহা সেইরূপ বিশেষত্ব ও কর্ম্মই উৎপাদন করে। আমরা তেমন সংস্কারের মূল উপাদান হইতে তাহার পরিণামকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারি, যেমন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার হিন্দুতে একরূপ, খৃশ্চানে অন্যরূপ আত্মপ্রকাশ করে। এতদবস্থায় খৃশ্চান মিশনারীরা যদি তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন তবে ভারতবাসীর স্বকীয় ধর্ম্মসংস্কারে যেন আঘাত

না লাগে তেমন সাবধানতার সহিত অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে তাহাদের সংস্কারের উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা যে ধর্ম্মভাব তাহাদের মধ্যে দিতে চাহেন সেই দিকে তাহাদের মন চালিত করিবেন। সংক্ষেপতঃ তিনি এইমাত্র বলিবেন,—তোমাদের ধর্ম্মভাব রক্ষা কর, কিন্তু আমি যেমন দেখাইয়া দিতেছি তেমন কর, তোমাদের লোকেরা যেমন করে তেমন করিও না। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সংস্কারে এতদপেক্ষাও কম হস্তক্ষেপ করিয়া কাজ করা যাইতে পারে। যেমন একজন হিন্দুসংস্কারক সাধারণভাবে হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র ও প্রথাকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে কোন কোন বিষয়ে লোকের বিশ্বাস ও আচরণ ভারতের প্রাচীন বিশ্বাস ও আচরণ হইতে স্খলিত হইয়াছে। তিনি একটি বালককে শিক্ষা দিতেছেন। ছাত্রটি তাহার চিরাগত সংস্কার অনুযায়ী হইলে শিক্ষকের কাছে যাহা পাইবে তাহা এবং তিনি যাহা ত্যাগ করেন তাহাও গ্রহণ করিবে। অধ্যাপক ছাত্রটির সকল সংস্কারেরই পুষ্টিসাধন করিবেন, কেবল করিবেন না যাহা তিনি সংস্কার করিতে চাহেন তাহার। তৃতীয়তঃ অধ্যাপক যদি গোঁড়া হিন্দু হন এবং ছাত্রটি তাঁহার অনুযায়ী চলে তিনি তাহার সমস্ত সংস্কারকেই পুষ্ট করিয়া তুলিবেন। অবশেষে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনপ্রয়াসীর অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতাকে বিতাড়িত করিয়া তৎস্থলে আর একটা কিছু বসাইতে যাঁহারা বদ্ধপরিকর তাঁহাদের কথা। তেমন চেষ্টা করিতে গেলে অনেক বেগ পাইতে হইবে। কারণ, ভারতবাসীর শত শত বৎসরের সংস্কার তাহাতে বাধা দিবে। সংস্কার সহজে দূর করা যায় না, অন্য একটার দ্বারা তাহাকে নির্ম্মূলও করা যায় না। অবশ্য ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা অনেকটা অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু সংস্কার এক আশ্চর্য্য বস্তু, শতাব্দীব্যাপী নিষ্পেষণেও তাহা বিনষ্ট হওয়ার নহে। তাই দেখিতে পাই, এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও

এদেশের প্রাচীন সংস্কার মাথা খাড়া করিয়াই আছে, এবং তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য মিশনারীরা ও অন্যান্য লেখকেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছেন। বৈদেশিক প্রভাব যেসমস্ত ভারতবাসীর উপর পড়িয়াছে ইহা তাহাদের সম্বন্ধেই বলা হইল। ভারতের জনসাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের অধিকাংশ এখনও পাশ্চাত্যপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা দূরে আছে। স্বাধীন ভাবে ভারতীয় সংস্কারের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহাতে বরাবর বাধা পড়িতেছে। বৈদেশিক প্রভাব উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ প্রয়োজন, এই সমস্ত বাধা অপসারিত করা। তাহা হইলে প্রাচীন ভারতীয় ভাব স্বতঃই বিকাশ লাভ করিবে। ইহাই প্রকৃত আত্মপ্রকাশ।

উন্নতিবাদীরা হয়ত বলিবেন যে তাঁহারা এইরূপ ইচ্ছা করেন না, তাহার সহিত কিছুঁ যোগ না করিলে চলিবে না। তেমন না করিলে, তাঁহাদের আশঙ্কা, ভারতে উন্নতির প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহাদের সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মানুষ বাধা না দিলে প্রকৃতি নিজেই নিজের উপায় দেখে এবং বরাবর দেখিবে। ভারত অতীতে তাঁহার নিজের প্রয়োজনমত ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন, সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার-প্রণালী প্রভৃতি সমস্তেরই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যতদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন তাহাই করিবেন। কেবলমাত্র প্রয়োজন, তাঁহার সংস্কারের উপর বাহিরের যাহা আপতিত হইয়াছে, যাহাকে তিনি আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই, পরন্তু যাহা তাঁহার সংস্কারকে গলা টিপিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে উহা হইতে তাহাকে মুক্ত করা। এই সংস্কারই ভারতীয় সভ্যতার বীজ। ইহা হইতে উহার প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সবই জন্মায়। এতদ্বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই, আমার স্বপক্ষের স্বার্থরক্ষার কথাও বলিব না। ভারত কোন্ পথে যাইবেন তিনিই তাহা বলিবেন।

আমার বক্তব্য, যাহা মূল্যবান তাহা যেন অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত কাহারো ইচ্ছার কথা নহে, যাহার সম্বন্ধে আলোচনা তাহার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহাই বিচার্য্য। ভারত যদি স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার ভবিষ্যৎ এমন একটা অভিনব কিছু হইবে যাহার সহিত তাঁহার অতীতের কোন সংশ্রব থাকিবে না। আমি চাহি, ভারতের যাহা প্রয়োজন এবং তাঁহার যাহা প্রকৃতি তদনুসারে আত্মবিকাশের সম্পূর্ণ অধিকার তিনি লাভ করুন। আত্মস্থ ভারত হয়ত তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ খৃশ্চানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, বৌদ্ধধর্ম্মও অবলম্বন করিতে পারেন, অথবা মুসলমানও হইতে পারেন। পক্ষান্তরে তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা লইয়াও চলিতে পারেন, কিম্বা আধুনিক অর্থনীতি, শিল্পনীতি ও বুদ্ধিবিচক্ষণতা অনুযায়ী জীবনযাত্রার নূতন পদ্ধতি গ্রহণের জন্যও নিজকে উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন। সম্ভবতঃ সকল ধর্ম্মই এতদিন যাহা করেন নাই অতঃপর তাহা করিবেন, অর্থাৎ একই ব্রহ্মের সক্রিয়ভাবের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। এই সমস্ত বিষয়ের কোনটারই সহিত আপাততঃ আমার সম্পর্ক নাই। আমার একমাত্র কামনা,—ভারতের সংস্কারসমষ্টির মধ্যে তাঁহার যে প্রাণশক্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনিই স্বাধীন ভাবানুসারে কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ করুন। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারত যদি আত্মোৎকর্ষ সাধনের সম্পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ লাভ করেন তবে তিনি তাঁহার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক ও উপযোগী তাহাই উদ্ভাবিত করিবেন, এবং অতীতে তিনি যেসমস্ত মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মনে হয় ভবিষ্যতে তিনি যাহা করিবেন তাহাও মহৎ হইবে এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। মিঃ আর্চ্চার তাঁহার "ভারত ও ভবিষ্যৎ" (India

and the Future) গ্রন্থে ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন যে তাহারা যেন তাহাদের অতীত গৌরবের মোহ ভুলিয়া পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও আচার-প্রণালী গ্রহণ করে। তেমন করিলে ভারতবাসীর বা জগতের কোন কল্যাণই হইবে না। এই ভাবে জীবন পরিপুষ্ট হয় না। আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। আত্মস্থ হও ; আত্মস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী চলে, আপনাকে প্রকাশ করে, পরকে নহে। একটি বাঁচিবার পথ, অপরটি মৃত্যুর। চীনের টেওয়িষ্ট ধর্ম্মের মূল নীতিও বলে 'প্রকৃতিস্থ থাক'। হিন্দুধর্ম্ম এই স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছেন। স্বধর্ম্মের স্বরূপ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন· বিশ্বের আত্মবিকাশের যে বিশাল প্রবাহ চলিতেছে তন্মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে স্বকীয় ধারা তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। গীতা বলিয়াছেন,—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।" নিজ্সের জিজ্ঞাস্য, 'তোমার বিবেক কি বলে ?'—উত্তরে বলিলেন—"তুমি যাহা নও তাহা হইও না। তোমার প্রকৃতির বহির্ভূত ধার্ম্মিক সাজিও না।" তাঁহার বক্তব্য, যাহার যেমন প্রকৃতি তাহার তদনুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের চেষ্টা করা উচিত। বস্তুতঃ প্রারম্ভে স্বাভাবিক শক্তির অতিরিক্ত কিছু করিতে যাওয়া উচিত নহে, তাহাতে সফলতা লাভ করা যায় না, বিফলকাম ও হতাশ হইয়া পড়ে এবং তৎপর আর উন্নতি লাভের চেষ্টা করে না। স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া যদি আমরা পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করি তবে সহজে তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারিব, সেই স্তরে উঠিলে প্রকৃত উন্নতির দিকে আরো অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে।

এইক্ষণ কর্ত্তব্য কি ? প্রথমতঃ বৈদেশিক ভাব ও আচরণ যাহা এদেশের লোকের প্রকৃতির সহিত মিলে নাই, জাতীয়তার অংশরূপে

পরিণত হয় নাই, কেবল বহিরাবরণের মত হইয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভারতের প্রাণশক্তি পুনরায় সতেজ হইবে, এবং তখন তাহার উপযুক্ত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তারপর স্বদেশী বা বিদেশী যে কোন আহার্য্যই স্বীয় শক্তি অনুসারে গ্রহণ করিবে এবং তাহা পরিপাকও করিতে পারিবে। বৈদেশিক হইলেই যে কোন দ্রব্য মন্দ হইবে এমন কোন কথা নাই, পক্ষান্তরে তাহার অনেক কিছুই ভাল এবং ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয়। বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে, ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলেও নিজকে কাচের বাক্সে আবদ্ধ রাখিয়া বলিতে পারিবে না,—'আমাকে স্পর্শ করিও না।' পাশ্চাত্য দেশ যেসমস্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে তাহা হইতে ভারতের নিজ প্রয়োজন মত কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই নিজের কাজে লাগাইবে। কিন্তু কথা এই,—সেগুলিকে বহিরাবরণের মতন পরিধান করিলে চলিবে না, সেগুলিকে নিজের মধ্যে সমীকৃত করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতিই এইরূপে অন্যের নিকট ঋণী। শক্তিশালী জাতি পরের কাছে ধার করে না, নকলও করে না। পরেরটা আনিয়া নিজে গ্রাস ও পরিপাক করিয়া ফেলে, পরিপাক হইলেই তাহা নিজের হইয়া যায়। যেমন, গ্রীস প্রথমতঃ ইজিপ্ট হইতে কলাবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে এমনভাবে নিজের করিয়া ফেলিল, এবং তাহার এত উন্নতি করিল যে তাহাতে ইজিপ্টের কোন চিহ্ন রহিল না। ভারত সম্বন্ধেও তেমনই হওয়া উচিত পাশ্চাত্য দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী যাহা পাওয়া যায় ভারত তাহা গ্রহণ করুন এবং তাহাকে নিজের করিয়া লউন। তাহা হইলেই ভারতের প্রাচীন নীতিকে ভিত্তি করিয়া এক অভিনব সংস্কার বিকাশ লাভ করিবে। কিন্তু শুধু পরানুকরণ যেন না করেন, সে পথে জাতি কলের পুতুলের মত প্রাণহীন হইয়া যাইবে।

এই সমস্ত কারণে জাতীয় শিক্ষার গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন লোকও এদেশে আছেন, যাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, 'জ্ঞান আবার জাতীয় বা বিজাতীয় কি? দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করিলে সমষ্টি সকল দেশেই চার হইবে, ভারতে কি কিছু কম হইবে?' বস্তুতঃ ইঁহারা এমনই অন্তঃসারশূন্য যে জাতীয় শিক্ষার মর্ম্ম বুঝেন না। ভারতের জাতীয় শিক্ষার অর্থ ভারতবাসীকে সত্যকার ভারতবাসীর অনুরূপ গড়িয়া তোলা, ইংলিশম্যান বা অন্য কাহারো অনুরূপ নহে। ইহা বুঝাও কি কষ্টকর? কোন ইংলিশম্যানকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়,—'আপনার পুত্রকে ইংলিশম্যানের মতন গড়িয়া তোলার তাৎপর্য্য আপনি কি বুঝেন?—তবে তিনি হাসিবেন। কারণ, উহা তাঁহার জানা আছে। তিনি বলিবেন,—'আমাদের যাহা তাহাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বোত্তম। আমাদের বালকেরা ইংরেজদের মধ্যে বাস করিবে, ইংরেজদের আচার ব্যবহার লইয়াই থাকিবে, দেশের স্বজাতির রীতি নীতি শিক্ষা করিবে, ইংরেজ ভদ্রলোক যেরূপ জ্ঞান লাভ করে তাহারাও তেমনই করিবে। বৈদেশিক রীতি-নীতির সহিত আমরা কোন সম্পর্ক রাখি না, সেই সমস্ত আমাদের নহে।" এইরূপে ব্রিটিশ ও আইরিষদের জাতীয়তা জ্ঞান অতিশয় প্রবল, এই জন্যই তাহারা এত উন্নত, শক্তির এত উচ্চ শিখরে আরূঢ়। তাহাদের কর্ত্তব্য কি—তাহাদের স্বজাতি-প্রেমই তাহাদেরে বলিয়া দেয়। এদেশে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—'শুধু ভারতীয় শিক্ষায় হইবে না।"—ইহার অর্থ যদি এই হয়,—পাশ্চাত্য সমস্ত জ্ঞানগবেষণাকে বাদ দেওয়া উচিত নয়, তবে তাহা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে। ভারতবাসীর জাতীয় শিক্ষার সমর্থকেরও এই জ্ঞান আছে। তবে তাঁহার লক্ষ্য, ভারতবাসীর শিক্ষা ভারতের আদর্শ অনুসারে ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হউক, ভারতবাসী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করুন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্র,

কারুকার্য্য, সাহিত্য প্রভৃতিও শিক্ষা করুন। এযাবৎ সেই সমস্তকে অগ্রাহ্যই করা হইয়াছে। ভারতীয় ছাত্রকে ইউরোপ ও আমেরিকার দর্শনশাস্ত্র কেন শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তাহার নিজের দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে কেন অজ্ঞ রাখা হয় ? পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে কেন তাহাকে চিত্রশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার নিজের দেশের চিত্রসম্বন্ধীয় আদর্শ ও নীতি কেন অবজ্ঞাত হয় ? সর্ব্বোপরি তাহাকে তাহার ধর্ম্ম কেন শিক্ষা দেওয়া হয় না ? যাহারা ভারতীয় জ্ঞানগবেষণাকে একেবারে পরিত্যাগের যোগ্য হেয় বস্তু বলিয়া মনে করে তাহারাই এই সমস্তের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ মত যাহারা পোষণ করে তাহারা নিরপেক্ষ-তার দাবী করিতে পারে না। আধুনিক মতানুসারে যদি স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে জাতির যোগ্যতা তাহার জ্ঞানগবেষণার উপরই নির্ভর করে তাহা হইলে যাহাদের জ্ঞানগবেষণা নিম্নস্তরের এবং যাহারা আত্মোন্নতি সাধনে অসমর্থ তাহারা নিজের সংসার পরিচালনারও অযোগ্য। জাতীয় ভাবধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য জাতীয় শিক্ষারই প্রয়োজন। যদি যথার্থ শিক্ষাবিধান চাহেন তজ্জন্যও তাহারই প্রয়োজন। শিক্ষাদানের অর্থ অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহাকে বিকাশ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিশুর মধ্যে যাহা সম্ভাব্য অবস্থায় আছে তাহাকে বিকশিত করিয়া দেওয়াই তাহার প্রকৃত শিক্ষা। ভারতীয় শিশুর অভ্যন্তরে ভারতের সংস্কারই বিদ্যমান আছে, তাহাকেই বিকশিত করিয়া দিতে হইবে; শিক্ষনীয় প্রত্যেক উপকরণ দেশীয় হউক বা বিদেশীয় হউক যাহা সে পরিপাক করিতে পারে তাহাই তাহাকে দিতে হইবে, এবং তদ্দারা তাহার স্বীয় সংস্কারকে সুপুষ্ট ও সুদৃঢ় করিতে হইবে। প্রথমে এবং দুর্ব্বল অবস্থায় ভারতীয় উপকরণই তাহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম। আমার বন্ধুবর আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাভেলও ভারতীয় ছাত্রদের চিত্রবিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে এই অভিমতই ব্যক্ত করেন।

বিভিন্ন রকম জাতীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধন সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করেন। ডিজরেইলি বলিয়াছেন,—'সকলেই এক জাতি।' কাহারো এখনো তেমন বিশ্বাস আছে। অপরেরা তদ্বিরোধী। ডিজরেইলি পক্ষীয়েরা মনে করেন যে জাতিজ্ঞানটা পুরাতন অসভ্য সমাজের নিদর্শন, তাহা দূর করাই ভাল। তাঁহারা মনে করেন জাতিজ্ঞানই মানুষের মধ্যে ভিন্নভেদ ও বিরোধ উপস্থিত করে। সুতরাং সর্ব্বজাতি-সমন্বয়ই মানব সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জার্ম্মণ দার্শনিক নিজ্‌সে লিখিয়াছেন,— "জাতিয়তারূপ এই গো-মূর্খতার মূলে কি কোন ভাবাদর্শ আছে? এইরূপ বৃথা আত্মাভিমানকে উৎসাহিত করিয়া কি লাভ? ইদানীং সমস্ত বিষয়েরই লক্ষ্য বৃহত্তর ও সমষ্টিগত সাধারণ স্বার্থের দিকে; আধ্যাত্মিক পরনির্ভতার ও জাতীয়তার উচ্ছেদ দ্বারা বিভিন্ন জাতির অভ্যুন্নতি ও পরস্পর সম্মিলনের পথ পরিষ্কার হইতেছে,—ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার প্রকৃত মূল্য ও ভাব।"

আন্তর্জাতিক সম্মিলন ভবিষ্যতে হয়ত হইবে, কিন্তু এখন তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বিভিন্ন জাতিতে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ বর্দ্ধিত হউক ইহা ত আমি চাইই না, পরন্তু তৎসমস্ত বিদূরিত হউক ইহাই আমার কামনা। কিন্তু আমার ধারণা, প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা উত্তম উপাদান লইয়াই সংঘটিত হইতে পারে। যখন প্রত্যেক জাতি স্বীয় জাতীয় শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করিবে তখনই সেই সমস্ত উত্তম উপাদান পাওয়া যাইবে। ব্যষ্টি মানব যখন স্বধর্ম্মে পূর্ণতা লাভ করিবেন তখনই তিনি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যের উপযুক্ত অধিবাসী হইতে পারিবেন। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য কখনো সম্ভব হইবে কি না কে বলিতে পারে? বহু লোক এতই নিম্ন স্তরে আছে যে তাহারা আন্তর্জাতিকতার কল্পনাও করিতে পারে না। অকালে তাহাদেরে আন্তর্জাতিক সম্মিলনের জন্য কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে তাহারা উহার মূল ভাবই নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

উহার সফলতার জন্ম চাই মানুষের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, সহিষ্ণুতা এবং মানবজাতির সেবাধর্ম্ম প্রভৃতি উত্তম উপাদান। স্বজাতির প্রকৃত স্বার্থ সাধনের জন্ম যোগ্য হইতে হইলে মানুষকে প্রথমতঃ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বার্থরক্ষায় পটু হইতে হইবে। তারপর নিজের দেশ, সম্প্রদায় ও জাতির সেবায় অভ্যস্থ হইবে; ইহাতে যোগ্যতা লাভ করিলেই মানুষ বিশ্ব-মানব-সমাজের সেবার জন্ম অগ্রসর হইতে পারিবে। ইদানীং বিশ্ব-মানব-সমাজে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের বহু কথা শুনা যায়, কিন্তু কয়জন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন ? উর্দ্ধে উঠিতে হইলে সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন ধাপ হইতে কার্য্যারম্ভ করাই কর্ত্তব্য। প্রত্যেক দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকও আছেন, এবং সকল সময়ে তাঁহাদিগকে পাওয়াও যায়। তাঁহারাই যথাসময়ে অপর সকলকে পরিচালন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতসম্বন্ধে বিশেষ কারণ আছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল নীতি উচ্চ মূল্যের বলিয়া আমার বিশ্বাস। অপরাপর জাতির সভ্যতার প্রতি কোন-অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া আমি বলিতে চাহি যে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ করিলে সমগ্র জগৎ উপকৃত হইবে, হীন পরানু-কারী ভারতীয়দের স্থান আমরা পাশ্চাত্যদের মধ্যে কথনো হইবে না। যেসব বিষয়ে আমরা নিজেরাই গুরু তৎসম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য আমাদের শিষ্যদের কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। ' ভারতীয় সভ্যতাকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে যে ভারতশক্তি তাহার প্রসূতি তাঁহাকেই সুপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা জগতেরই কল্যাণের জন্য; অতএব জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই আসুন, সেই ভারতশক্তির সেবা করি,' এবং তদ্দ্বারা জগদ্বন্ধু-পদবাচ্য হই।

কতিপয় সিদ্ধান্ত

(১৩)

ভারতবর্ষের সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর সময় আসিতেছে তাহার তুলনা ভারত-ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেন এমন হইতেছে, ইহার উত্তর দিতে হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এস্থলে আমি তাহা করিব না। এদেশ এক ভয়ঙ্কর আর্থিক সমস্যারও সম্মুখীন হইবে। বিগত কিছুকাল হইতে ভারতের বিপণিসমূহ পাশ্চাত্যরাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে ভারতবাসীরা দরিদ্র হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ এই প্রথমবার সমগ্র জগতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সাধনা এবং সামাজিক বিপ্লবে নিক্ষিপ্ত হইবেন। তাঁহার অতীত শাসন-ব্যবস্থার ফলে এতদিন তিনি আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। আসন্ন বিপ্লবের প্রবাহে স্থির থাকিবার মত শক্তি কি তাঁহার হইবে? আমি আশা করি হইবে। তৎপর প্রশ্ন—তিনি কি এই বিপ্লবে স্থির থাকিতে পারিবেন এবং ভারতীয়ই থাকিবেন, অর্থাৎ তাঁহার বিরাট সাধনার মূল প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে পারিবেন? আমার আশা হয় পারিবেন। কারণ, আপনাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা এবং শক্তি তাঁহার আছে। আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের উচ্চ জীবনের আদর্শ বলিয়া যাহা কথিত তাহা আমাদের অভাব হ্রাস করিবার পরিবর্তে বৃদ্ধিই করিতেছে। আমরা চাই আমাদের অভাব আরো বৃদ্ধি হউক। যখন আমাদের নিজের ভাণ্ডার আমাদের অভাব পূরণ করিতে পারে নাই তখন আমরা অন্যের কাছে গিয়াছি। মিঃ লরেন্স হাউস্‌ম্যান লিখিয়াছেন,—"অর্থের

অনুসন্ধানে বাহির হওয়ার ফলে প্রত্যেক দেশই অল্পবিস্তর আত্মনির্ভরতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, অন্যান্য দেশকে নিজের অনুকূলে চালাইবার শক্তির উপরই তাহারা নির্ভর করে। যে দেশ আত্মোন্নতির জন্য, বা প্রচুর বস্তুজাতের জন্য স্বদেশের পরিবর্ত্তে যতই অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছে সে দেশ ততই তাহার আত্মরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং অবশেষে মানবেতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ সর্ব্বধ্বংসী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে।"—ইহার সহিত আমি যোগ করিতে চাই, এখনও তাহার হিসাব নিকাস শেষ হয় নাই। ভারতবর্ষ অতঃপর যদি নিজ জাতীয় আত্মার বিলোপ সাধনপূর্ব্বক অন্যের সহিত বিলীন হইয়া যাইতে না চাহেন তবে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। স্বীয় পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত সাধনা ব্যতীত আত্মরক্ষার শক্তি তিনি কোথায় পাইবেন? পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার মূল নীতিসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হইলে এবং তদনুসারে সকলে চলিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রাচ্য দেশই প্রধানতম ধর্ম্মগুরুদিগের জন্মভূমি। ভারতবর্ষ শিক্ষা দিয়াছেন, এই বিশ্বের মূল পরমাত্মা। এই দৃশ্যমান ভৌতিক জগৎ অবিনশ্বর আত্মারই অভিব্যক্তি—সময় ও স্থানে সীমাবদ্ধ। মানব হয় ত সেই আত্মপুরুষ অথবা তাঁহারই অংশ বা তাঁহারই অনুরূপ। এই বিশ্ব-জগৎ বিশুদ্ধ নীতি অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত, ইহাই ভগবানের সত্যিকার অভিব্যক্তির স্বরূপ। জীবনমাত্রেই পবিত্র ; সন্নীতিই মানবধর্ম্ম। মানবধর্ম্ম নিজেই নিজের নিয়ন্তা, নিজে যাহা বপন করে নিজেই তাহার ফল চয়ন করে ; এই বিশ্বের একটা নৈতিক লক্ষ্য আছে ; সমাজব্যবস্থা তদনুযায়ীই হওয়া আবশ্যক। এইরূপ আরো বহু সত্য ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছেন, তৎসমস্তই তাঁহার মহোচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক, সেই সব সত্য এখনও

কেবল ভারতের নহে, জগতের সর্ব্বত্র শুভ ফলদান করিতে সমর্থ এবং তাহা হইলেই ভারতবর্ষের কর্ম্মভূমি বলিয়া যে দাবী তাহা সার্থক হইবে।

প্রত্যেক মানব এবং প্রত্যেক জাতি যদি আত্মস্থ হইয়া চলে, তবেই তাহার জীবন সার্থক হয়, নতুবা তাহার কোন মূল্য নাই। হিন্দুজাতি ধ্বংস হইতে পারে না, যতদিন ইহা মাতৃরূপা মহাশক্তির উপাসনা করিবে। শক্তিসাধকের মাতৃশক্তি 'মহতো মহীয়সী, অণোরণীয়সী ;'—অর্থাৎ সর্ব্বত্র অভিব্যক্তা। তিনি দুঃখের প্রতিমা নহেন। মা আনন্দময়ী, মণিরত্নভূষিতা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, কোটীসূর্য্যকরোজ্জ্বলা। তিনি একহস্তে সর্ব্বপ্রকার বরদান ও অন্য হস্তে সমস্ত ভয় বিদূরিত করিতেছেন। হিন্দু নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিয়াছেন যে ভয় পশুরই ধর্ম্ম, মানুষের ভিতরে যে পশুভাব আছে তাহারও ধর্ম্ম। নির্ভীকতা গুণেই জাগতিক সমস্ত উদ্যম সফলতা লাভ করে, নির্ভীকতাই দিব্য জ্ঞানীর পরিচিহ্ন।

যে কোনরূপেই হোক্, বাঁচিতে হইলে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা আবশ্যক, তেমনই ভারতেরও নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে হইবে। ভারতের শাস্ত্র বলেন, সত্যই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; ইহার মর্ম্ম,—সকল বিষয়ে সততার সহিত চলা। গোঁড়াই হউন, আর সংস্কারকই হউন, দেশের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক বলিয়া সরলভাবে বিশ্বাস করেন তাহা কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বীয় জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে চলেন তাঁহাদের কেহই মন্দ করেন না। উদ্দেশ্য ও তৎসাধনোপায় সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, যাঁহারা সততার সহিত বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করেন তাহা ভগবানের সার্ব্বভৌম উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ করে। সরলতাই সকলকে একতায় সম্বদ্ধ করিবার সূত্র হইতে পারে। যাঁহারা সরল বিশ্বাসে মনে করেন যে কোন একটা কার্য্য করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন ফল পাওয়া যাইবে না আশঙ্কা

করিয়া তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। ফল যে পাওয়া যাইবে না ইহা নিশ্চয়তার সহিত তাঁহারা কিরূপে জানিবেন ? জানিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ভগবানের এমনই ব্যবস্থা, যাহা হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ তাহাই হইবে। বাধা বিঘ্নও তাঁহারই বিচারানুসারে ব্যবস্থিত। পরাজয়ের কথা আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা তেমন চিন্তা করে তাহাদের পরাজয়ই আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি জয়লাভের জন্য যদি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি তবে পরাজয় বলিয়া কিছুই নাই। চেষ্টা করিব, তাহার ফল সামান্য হইলেও তাহাই বিজয়লাভ। আমরা প্রত্যেকে যদিও স্বাধীন তথাপি পরমাত্মার সার্ব্বভৌম উদ্দেশ্য সাধনের কার্য্যেই নিয়োজিত এবং সেই অবিনশ্বর আত্মার কিঞ্চিৎ সময়, স্থান ও ভৌতিক পদার্থ লইয়া আমরা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশমান। * যে পরমাত্মা বিশ্বের সমস্ত সাকার পদার্থরূপে বিরাজমান, যিনি বিশ্বের প্রাণশক্তি, অথচ নিরাকারভাবে সকলের অতীত, মানুষ তাঁহাকে যে নামেই অভিহিত করুক আমরা সেই পরমাত্মার চরণে প্রণাম করিতেছি।

এই পরিবর্ত্তনের যুগেও পাশ্চাত্য প্রভাবে এদেশের কাহারো কাহারো মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয় জন্মিয়াছে ; ফলে তাঁহারা তেমন কোন ঐশীশক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা পাশ্চাত্য বিষয়ান্ধ লোকদের মতই হইয়াছেন, অথচ উহাদের ন্যায় কার্য্যতঃ বিষয়নিপুণ নহেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়া তাহা

* কিঞ্চিৎ সময়—অনন্তকালের বিন্দুবৎ কয়েকটি বৎসর আমাদের পরমায়ু। কিঞ্চিৎ স্থান—বিপুল বিশ্বরাজ্যের অতি ক্ষুদ্র স্থানই এই দেহের জন্য প্রয়োজন। কিঞ্চিৎ ভৌতিক পদার্থ—বিরাট ভৌতিক জগতের কণামাত্রই ত এই দেহ। অথচ আমরা এক একজন অতি সুন্দরভাবে বিরাজমান। [অনুবাদক]

প্রাচ্য জাতিসমূহের পক্ষে হলাহলস্বরূপ। ভারতের যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়াছে তাহারা মনে করে যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; তাহাদের মতে ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেই ভারতের মঙ্গল হইত। সম্প্রতি যেসমস্ত কাণ্ড (ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ) ঘটিয়াছে তাহা হইতে তাহারা কিছুই শিক্ষা করে নাই। ঐ সমস্ত ব্যাপার বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া দেখাইয়া গেল যে আঁধারের পথে চলিতে চলিতে ইহারা কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জালের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা এতদিন ভারতীয় প্রাচীন গৌরবের সংরক্ষক ছিলেন তাঁহারা এই সতর্কীকরণ সত্ত্বেও যদি সেই গৌরবকে অবজ্ঞা বা পরিত্যাগ করেন তাঁহারা নিজেই ধ্বংস হইবেন, এবং ধ্বংস হওয়াই তাঁহাদের উচিত হইবে। অথবা তাঁহাদের অদৃষ্টে আরো অধিক দুর্গতি ঘটিবে,—তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মহত্ত্ব তাঁহাদের জন্য জগতে যে উচ্চাসন গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহা হইতে তাঁহারা চিরতরে অপসারিত হইবেন। তাঁহারা দেহধারণ অবশ্যই করিবেন, কিন্তু তাহা কিরূপ এবং কি ভাবে?

এই শোচনীয় অধঃপাত হইতে আত্মরক্ষার অনুকূলে ভারতবাসীরা তাঁহাদের ইতিবৃত্তের দুইটী ব্যাপার হইতে উৎসাহ লাভ করিতে পারেন। প্রথম,—বর্ত্তমানে হিন্দু সভ্যতা যে আকারে বিদ্যমান তাহা তাহার অন্যান্য সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিবারই ফল। ইহাই প্রমাণ যে হিন্দু সভ্যতা অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারে। জনৈক মার্কিণ লেখক মিঃ প্রাইস কলিয়ার ইহা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার "প্রতীচ্যে প্রাচ্য" (The East in the West) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "হিন্দুসভ্যতার সংস্রবে অন্য যে কোন সভ্যতা বা ধর্ম্ম আসিয়াছে হিন্দুসভ্যতা তাহাকেই গ্রাস করিয়াছে। অতএব ব্রিটিশ জাতি যে তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকে, ভালই করে। এই ভাবেই ব্রিটিশেরা আপনাদের নিজত্ব ও প্রভুত্ব রক্ষা করিতে

পারিবে।" দ্বিতীয়—এলাহাবাদের "লীডার" পত্র আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে "ভারতের সংস্কারকেরা যেসমস্ত পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন শাস্ত্রানুসারেই। প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের আক্রমণের ফলেই যে এই নব্য সংস্কারের উদ্দীপনা আসিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু যেভাবে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইতেছে তাহা বিশুদ্ধ ভারতীয় নীতি ও আচারপ্রথার বিরুদ্ধ নহে।"

হিন্দু সমাজের উপর যে অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার জন্যই হয়ত হিন্দু-চিৎ-শক্তির অন্তরতম স্তর হইতে এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস, যাহা প্রকৃত মূল্যবান তাহা কখনো নষ্ট হইতে পারে না। হিন্দুর মূল তত্ত্বসমূহ কখনো বিনষ্ট হওয়ার নহে। অবিনশ্বর বেদের ন্যায় তৎসমস্ত হয় বর্ত্তমানে, নয় ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করিবেই। তাহা হইলেও আমি স্পষ্টই দেখিতেছি আর্য্য-ধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ আপতিত হইতেছে অতীত যুগযুগান্তরে কখনো তেমন ঘটে নাই। অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। বর্ত্তমান হিন্দু জাতি ও তাঁহাদের সাধনার তত্ত্বকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু জাতির অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ভাবিত মূল তত্ত্বসমূহ পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাই গ্রহণ করিতে পারে ও করিবে। বর্ত্তমান হিন্দুদের নবজীবনলাভের প্রয়াস ও প্রাচীন হিন্দুত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাকেও পৃথক্‌ভাবে দেখিতে হইবে। হিন্দুত্ব অবিনশ্বর। নব্য হিন্দুদের আসুরি প্রকৃতি বা সাময়িক স্বার্থান্ধতা দূর হইলে তাহাদের মধ্যেও হিন্দুত্ব সজীব হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পরস্পরে এমন ভাবে সংযোজিত হইতেছে যে তাহাদের মধ্যে অতীতে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল তাহা প্রায়ই বিনষ্ট হইয়াছে।

এইক্ষণ কোন একটা সভ্যতার বিশুদ্ধ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ জাতিগত ও ভৌগলিক অন্তরায়সমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া এক সাধারণ মানবজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া সকলেরই নৈতিক বুদ্ধিকে একই লক্ষ্যে অগ্রসর করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধনার সংঘর্ষ ভবিষ্যতে ক্রমশঃ সহযোগিতায় পরিণত হইতে থাকিবে। অনেকের নিকট সেই আদর্শ এখনও স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা বটে, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার কারণ নাই। যদি সেই কল্পনা কখনো কার্য্যে পরিণত হয় তবে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসী-শক্তির পারস্পারিক সহযোগিতার ফলেই হইবে। আমি বর্ত্তমানের কথাই ভাবিতেছি, বর্ত্তমানই ভবিষ্যৎ গড়িবে। বর্ত্তমান হিন্দুরা যদি সমস্ত বিপদ্ কাটাইয়া বাঁচিয়া উঠেন এবং শ্রীসম্পন্ন থাকেন তবেই তাঁহাদের সাধনা বিস্তার লাভ করিবে এবং অন্যেরা তাহা গ্রহণ করিবে।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে, হিন্দুরা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন কি না। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক নিজত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে। যাঁহারা হিন্দুগৌরবের সংরক্ষক পদবাচ্য তাঁহারাই হয়ত অন্য সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিবেন। যেসমস্ত সামাজিক রীতিনীতি হিন্দুসমাজকে সুসংঘটিত করিয়া রাখিয়াছে তৎসমস্ত ক্রমশঃ এত শিথিল হইয়া যাইতে পারে যে তাহার ফলে হয়ত এই সমাজ আর টিকিবে না। প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার ধারা যেমন অল্প কয়েকজনের মধ্যে নিবদ্ধ, ভারতের ধর্ম্ম দর্শন এবং কলাশিল্পাদিও হয়ত তেমনই কয়েকজন প্রাচীনপন্থী লোক রক্ষা করিবেন, তদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য অথবা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী পাশ্চাত্যভাব ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতির বিরাট শিল্পব্যাপারসমূহের নিম্ন স্তরের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে। তাহা হইলে ভারতের সুব্যবস্থিত সমাজ-বৈশিষ্ট্য আর থাকিবে না। পক্ষান্তরে এমনও হইতে পারে ভবিষ্যতে

বৈষয়িক পরিবর্ত্তন যতই হউক বা বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থারও যতই পরিবর্ত্তন ঘটুক না কেন তাহার মূলশক্তি অটুট থাকিবে এবং যে কোন নূতন অবস্থা আসুক না কেন তাহার সংঘর্ষে ভারতশক্তি বলশালিনী হইয়া উঠিবেন। ভারতশক্তির বীজ রক্ষাই প্রধান কথা। ভারতীয় বীজ হইতে অন্য রকম বৃক্ষের উৎপত্তি হইলে তাহাও ভারতীয়ই হইবে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কেহই তাহা বলিতে পারেন না। যাঁহারা প্রাচীন ভাব ও আদর্শকে মূল্যবান মনে করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাহা রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার যত্ন করা।

যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন ভারতের প্রধান ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের মূল তত্ত্বসমূহ ধ্বংস হওয়ার নহে। ভারতীয়েরা তৎসমস্তের প্রতি একনিষ্ঠ থাকুন, বা নাইই থাকুন, প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণ তাহা গ্রহণ করিয়া নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবেন। তাহার মূলতত্ত্ব চিরকাল অবিকৃত থাকিবে। কারণ, ইহা প্রকৃত মহতী সভ্যতার অঙ্গ; ইহা মানুষকে ধর্ম্মের পথে চালিত করে।

পরিশিষ্ট—(১)

"Is India Civilized" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সার জন উড্রফ যে পূর্ব্বাভাষ সংযোজিত করিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ ঃ—

ভারত কি সভ্য ?—এইরূপ প্রশ্ন যুক্তিহীন ও অশ্রদ্ধেয়। ভারতকে যাঁহারা অবজ্ঞা করেন, বা ভারতসম্বন্ধে যাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে ভারতের একটা সভ্যতা আছে ; অবশ্য তাঁহারা বলিতে পারেন, ইহা ভিন্ন রকমের। ইহার গুরুত্বসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রশ্নটি তুলিয়াছেন মিঃ উইলিয়ম আর্চ্চার। তিনি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যসমালোচক। সম্প্রতি তিনি "ভারত ও ভবিষ্যৎ" (India and the Future) নামক এক গ্রন্থ লিখিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ভারত এখনও অসভ্য বর্ব্বরের অবস্থায় রহিয়াছে। জনৈক ভারতবাসী আমাকে বলেন যে "মিঃ আর্চ্চারের তেমন বলায় কি আসে যায় ? এই দেশকে ও ইহার সভ্যতাকে গালাগালি দিয়া অনেকেই ত মিথ্যা কাহিনীপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তিনিও না হয় আর একজন আসিয়া জুটিলেন।"—তাহা ঠিক, এবং ইদানীং ভারত ও তাহার সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করেন এমন লোকের সংখ্যাও পাশ্চাত্য দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তথাপি এইরূপ অবহেলা দোষাবহ। এই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে যে কোনরূপ দোষারোপের উত্তর না দিয়া নীরব থাকা সঙ্গত নহে। তাহার কয়েকটি কারণ আমি এই গ্রন্থে দেখাইয়াছি। বিজাতীয় লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার ইদানীং অস্ত্রবলেই সম্ভব হইয়া থাকে, অবশ্য বিশেষ কোন অবস্থাগতিকে তৎপ্রয়োগের প্রয়োজন না হইতেও পারে। কিন্তু পরের উপর আধিপত্য

বিস্তারকে এইক্ষণ কেহ কেহ দেখাইতে চাহেন যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা বলেই তাঁহারা ঐরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে তাঁহাদের শাসনাধীন প্রজাবর্গকে ধর্ম্ম নীতি ও মানসী-প্রতিভায় তাঁহাদের স্তরে উত্তোলন করা। এই কর্ত্তব্যবোধেই মিঃ আর্চ্চার ভারতকে বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

ভারতসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ মিঃ আর্চ্চার তাহার সভ্যতার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার কোন মূল্য না থাকিলেও ইহাতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। অন্যান্য সমালোচকদের যুক্তির মূল খৃশ্চান ধর্ম্মমত; মিঃ আর্চ্চারের ভিত্তি যুক্তিবাদ। তিনি ভারতীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গের—ধর্ম্ম, মানসীপ্রতিভা, কলাবিদ্যা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্তেরই মূল নীতির উপর অত্যুগ্র আক্রমণের এক নূতন ধারা উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ উগ্রতা অনেকেরই মনে আঘাত দিবে। আমি মনে করি সহানুভূতির ভান করিয়া বা হিতৈষীর মূর্ত্তি ধরিয়া কপটাচরণ অপেক্ষা সরলভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা বরং ভাল। সহানুভূতি শব্দ অন্তরে যে মনোরম ভাবের উদ্রেক্ করে, তাহা কি আর এখন আছে ? তাহার অপব্যবহারই ত হইতেছে।

'ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ফিউসার' গ্রন্থের অধিকাংশই অন্যান্য সমালোচকদের সমালোচনার পুনরুক্তিমাত্র। সুতরাং ইহার উত্তরে অন্যান্য সমালোচক-দেরও উত্তর প্রদত্ত হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার লইয়াই যে মিঃ আর্চ্চার ভারতের সভ্যতাকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার পরামর্শ সরল ভাষায় এইরূপ দাঁড়ায়:—"তোমাদের নিজস্ব ত্যাগ কর, আমাদের মত হও, তেমন হইলেই আমরা তোমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহায় হইব, যদি তোমাদের অসভ্যতা লইয়া থাক, তবে আমাদের কোন সাহায্য পাইবে না।"—এই ভাবেই মিঃ আর্চ্চার ভারতের

বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা আমার লক্ষ্য নহে। আমি কেবল ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব এবং দেখাইব যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার ধারাকে আক্রমণ করার মূলে জাতীয় স্বার্থ, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রহিয়াছে; এবং ঐসমস্তের সহিত জড়িত বলিয়া দার্শনিক তত্ত্বের সমালোচনাও নিরপেক্ষ এবং বিশুদ্ধ যুক্তিমূলক হয় নাই। কোন একটা সভ্যতার বিচার করিতে গেলে উহার মূলনীতিসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

ভারতের ভাবধারা সাধারণতঃ অতি গভীর, ইহাতে স্বেচ্ছাচারমূলক ভিন্নভেদ নাই। ইহা যেমন দর্শনশাস্ত্রকে ধর্ম্মমূলক মনে করে, তেমনই ধর্ম্মকেও দর্শনশাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া জানে। পাশ্চাত্য লেখকেরা ইহার সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকৃতিই লক্ষ্য করেন, ইহার ঐ মূল নীতির সহিত তাঁহারা পরিচিত নহেন। আমরা সেইটিই দেখিব। এই সমস্ত নীতির যাথার্থ্য ফলের দ্বারাই বিচার্য্য, যেমন আয়ুর্ব্বেদ বলেন 'ফলেন পরিচীয়তে।' ফলের মধ্যেও ভালমন্দ তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। একটা হইতে অন্যটা যদি অধিক দোষযুক্ত হয় তবে তাহার মুল নীতিতে অধিক দোষ আছে কি না দেখিতে হইবে। যেহেতু অন্য কারণও থাকিতে পারে। ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ভারতে বাস করিয়া আমি ইহার আদর্শের এবং ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য ভালরূপেই অবগত হইয়াছি। ভারতসম্বন্ধে যিনি যত বেশী জানিতে ইচ্ছা করেন তিনিই তত বেশীভাবে তাহা লক্ষ্য করেন। আদর্শে এবং আচরণে পার্থক্য সম্বন্ধে অভিযোগ সকল জাতির বিরুদ্ধেই অল্পবিস্তর আছে। মূল ও সারবান যাহা তাহার সহিত তাহার অকর্ম্মণ্য বহিরাচ্ছাদনের পার্থক্যও দেখা উচিত। আবার এক এক জাতির ভিতর এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহা তাহাদের জাতীয় বিভিন্ন গঠন-

প্রণালীর পার্থক্যহেতু একেরটি অন্যের মনে অশ্রদ্ধার উদ্রেক্ করে। কোন জাতির সামাজিক গঠনপ্রণালীর মধ্যে যদি পরস্পর সামঞ্জস্য না থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার নৈতিক এবং মানসিক বৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত নহে, এবং এই যুগে কোন মানুষ স্বজাতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। তাহাকে সমগ্র জাতির অংশরূপে ও একতমরূপেই চলিতে হয়।

ভারতীয় সভ্যতার মূল্য শুধু পণ্ডিতোচিত আলোচ্য বিষয়ের ন্যায় নহে। তাহার সহিত ভারতের ও জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমি প্রত্যহ এই দেশসম্বন্ধে ভাবি, এবং ইহার ভবিষ্যৎ কি হইবে সেই প্রশ্নও করি। ভারত কি তাঁহার মূল প্রকৃতি, অর্থাৎ সাধনার ধারা রক্ষা করিতে পারিবেন ? আমি মূল বলিলাম, কারণ যে শাশ্বত নীতিকে ভিত্তি করিয়া ভারত এতদিন চলিয়া আসিতেছেন আমি তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছি। এমনও কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছে যাহাতে মনে হইতে পারে যে হয়ত ভারত আত্মপ্রকৃতি রক্ষা করিবেন না। যেমন,—এই পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের পর ভারতের কোন নেতা আখ্যাধারী ব্যক্তির বক্তৃতা পড়িলাম ; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—"ইংরেজের অনুষ্ঠানসমূহই আমাদের আদর্শ এবং তদনুসারেই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নির্দ্ধারিত (set) হইয়াছে।"— যিনি এরূপ কথা বলেন, তাঁহার জাতির গৌরবসূর্য্যই অস্তমিত (set) হইয়াছে। অন্যের দৃষ্টান্তে এবং প্রভাবে আমরা সকলেই উপকার লাভ করিতে পারি। কিন্তু কোন নেতৃস্থানীয় ইংরেজ বা আইরিষের কথা দূরে থাকুক, তথাকার সাধারণ লোকের মুখেও এমন কথা বাহির হওয়া অসম্ভব। কোন ইংরেজ বা আইরিষ নেতা ফ্রান্স দেশকে যতই প্রশংসা করুন, বা তৎপ্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হউন না কেন, তিনি কখনো বলিবেন না যে 'ফরাসী অনুষ্ঠানই আমাদের আদর্শ।' তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় আদর্শ এবং অনুষ্ঠানসমূহ অনুসারেই তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত ভারতীয় নেতা যেরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তেমন ভাব লইয়া মানবতার উচ্চ গৌরবের অধিকারী হওয়া কাহারো পক্ষে সম্ভব কি? এখনও যে দাসমনোভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই, ঐরূপ উক্তি তাহারই পরিচায়ক। আমার খুবই আশা হইতেছে যে সেই যুগ চলিয়া যাইতেছে, মহত্ত্ব শৌর্য্যবীর্য্য ও উচ্চ মানবতালাভের যুগ আসিতেছে। "আর্য্য" পত্রিকা এই পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছেন যে "ঐ কথাটা আমার গ্রাহ্য না করাই উচিত ছিল। যেসমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক নেতা ঐরূপ দাসমনোভাব লইয়া চলেন তাঁহারা ব্যতীত অন্যেরা তেমন কথা বলেন না, পরন্তু উঁহাদের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রনীতির দিকেও বিশেষ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে।"—ইহা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এই মর্ম্মন্তুদ বিষয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু বলা আমারও অভিপ্রেত নহে।

এইক্ষণ প্রশ্ন, প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করার ফলে যে এক একটা জাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ভারতও সেই পথে যাইবেন, না আপনার সভ্যতাকে নব জীবন দান করিবেন? মনে রাখিতে হইবে সর্পবিষ সর্পকে নষ্ট করে না, কিন্তু অন্যকে সংহার করে। এই যুদ্ধের (১৯১৪-১৮ সনের ইউরোপীয় মহাসমর) অবসানে সমগ্র এসিয়া মহাদেশের সভ্যতাকে বিনষ্ট করিবার জন্য আয়োজন হইবে না, কে বলিতে পারে? ভাবগতিক ত তেমনই দেখা যাইতেছে। অধিকন্তু ভারতীয়দের মধ্যেও এমন একটা শ্রেণী আছে যাহারা ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রবেশ করাইতে লালায়িত। এই শ্রেণীই হয়ত প্রস্তাবিত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার ফলে প্রবল হইবে, এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার সুযোগ পাইবে। যেদিক্ দিয়াই দেখা যাক্ হিন্দুসভ্যতার উপর এ পর্য্যন্ত যত

আক্রমণ আসিয়াছে তৎসমস্তের সহিত তুলনায় যে আক্রমণ সম্মুখে আসিতেছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ হইবে।*

আমরা সকলেই আশা করিতে পারি যে ফল হয়ত ভালই হইবে। কিন্তু যে ভয়াবহ সময় উপস্থিত তাহার পরিণতি কি দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না। যেসব ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য লালায়িত মিঃ আর্চ্চার এই সন্ধিক্ষণে তাহাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়া বলিতেছেন,—"হাঁ তোমরাই ঠিক অগ্রসর হইতেছ।" আর যাঁহারা প্রতীচীর নব নব ভাবস্রোতে সজোরে বাধা দিতেছেন তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন; কারণ আর্চ্চারের মতে তেমন না করিলেই ভারতের মঙ্গল হইবে। ভারতীয়েরা বাধা দিবেন না কেন? প্রতীচ্য সভ্যতার নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব কখনো ত তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। অধিকন্তু মিঃ আর্চ্চারের গ্রন্থ যদিও যুদ্ধের সময় প্রচারিত হইয়াছে তাহা রচিত হইয়াছিল যুদ্ধের পূর্ব্বে; এই যুদ্ধের ব্যাপারে প্রতীচ্যসভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ না বলিবার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই পর্য্যন্ত লেখার পরেই পর-লোকগত মানবসমাজতত্ত্ববিৎ মিঃ বেঞ্জামিন কিডের শেষ গ্রন্থ আমার হাতে আসিয়া পড়ে। তাহাতে মিঃ কিড মিঃ জর্জ পিলের "ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ" (The Future of England) নামক গ্রন্থ হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করত লিখিয়াছেন,—"ইউরোপের ইতিহাস ও নরহত্যার বিবরণের মধ্যে পার্থক্য নাই, এবং তথায় খৃশ্চানধর্ম্মের ক্রমোন্নতির

*মনীষী উড্রফ প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন আজ তাহা কি অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে না? পবিত্র ধর্ম্মভাব, সদাচার, পল্লীসমাজের সর্ব্ববর্ণের মধ্যে দৃঢ় একতা ও আন্তরিকতা প্রভৃতি এই অল্পদিন মধ্যে কি ভীষণভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিতেছেন কি? আকুল ক্রন্দনে প্রাণ জিজ্ঞাসা করে, আর কত দূর?—হিন্দু, তোমার অধঃপতনের শেষ কোথায়? [অনুবাদক]

অর্থও শুধু নরহত্যার স্রোত, যাহার তুলনা জগতের অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; আর কেবলই বৈষয়িক বিজয়লাভের প্রয়াস। এখনো ইউরোপে সভ্যতা আসে নাই, তাহার বর্ত্তমান সভ্যতা বাহ্যিক্ চাকচিক্যময় বর্ব্বরতা মাত্র।”—নরহত্যাতেই ইহার কলঙ্কের শেষ নহে। কারণ শান্তির সময়েও ইউরোপে যেসব ব্যাপার ঘটে তাহার তুলনায় নরহত্যা বরং নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্কপট। মিঃ আর্চ্চার ও তাঁহার ন্যায় যাঁহারা এদেশবাসীকে উপদেশ দিতে আসিবেন তাঁহাদিগকে ভারতের লোকেরা বলিতে পারেন,—“বৈদ্য! আগে আপনাকে সামলাও।” সে যাহা হউক, ইউরোপীয় সভ্যতাও আদিযুগে উৎকৃষ্ট ছিল, এবং এ যাবৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় কার্য্যতঃ প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপ্লবের অবসানে তেমন পারিবে কি না বলা যায় না। যে কোন অবস্থাতেই হউক, ভারতীয় সাধনার নীতি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপকে অনুকরণ করা ভারতবাসীর পক্ষে কখনো সঙ্গত নহে। অবশ্য যাহারা নিজকে ইউরোপীয়দের অপেক্ষা হীন মনে করে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

এজগতেই যে ভুক্তি ও মুক্তি দুইই লাভ করা যায়, এবং জগৎ ও জীবাত্মা যে একই পরা শক্তির দ্বৈতলীলা, শাক্তাগম মতে বেদান্ত তাহাই আশ্চর্য্য-রূপে সুবিন্যস্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, আমি তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আমার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য, ভারতীয় সভ্যতার প্রধান নীতিগুলি সংক্ষেপে ও বিশুদ্ধভাবে বিবৃত করা, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সাধারণ ভ্রান্তি অপনোদন করতঃ ভারতের উপর সর্ব্বদা কেন আক্রমণ চলিতেছে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা। তৎপর, বরাবর যেমন বলি এতৎপ্রসঙ্গেও বলিব, প্রকৃত সাকার-সৌন্দর্য্যের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। কি গভীর আন্তরিকতার সহিতই ইউরোপে বলা হইত,—“অহো মধ্যযুগ!

তোমার অমানিশা কবে আমাদিগকে ত্যাগ করিবে ? মানুষ কবে বুঝিবে যে আকার গুরুত্বহীন দৈব ঘটনা নহে, অন্তরাত্মার বহিরভিব্যক্তিমাত্র। এই খানেই দুই জগতের অন্তর ও বাহির, দৃশ্য ও অদৃশ্যের মিলন।" যাঁহারা এই ভাবে উপলব্ধি করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট সাকারসৌন্দর্য্যেই প্রকটিত হন, তাহা জাতীয় ভাবেই হউক বা অন্য ভাবেই হউক।

ভারতীয় সাধনা সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া অধুনা যেসব বিষয়ে কলুষতা ও বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করিয়াছে আমি তাহার কথা বলি না, আমার লক্ষ্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি; তাহার ধর্ম্ম, তাহার দেবতা এবং গো-মাতা—সেই হিন্দু ভারতের সভ্যতা, যাহার অভ্যন্তর প্রশান্ত অতলস্পর্শী এবং উপরিভাগ মনোরম দৃশ্যপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন "তাহার অর্থ অধোদিকে যাওয়া।" ভারতের অবস্থা আরো শোচনীয় হইতে পারে। কিন্তু কোন মানুষ বা জাতি ঐ ভাবে চলিয়া অধোগামী হইতে পারে না। আমরা যদি সত্যই সুদৃঢ় বলসম্পন্ন থাকি তবে যেই জাতীয় শক্তিবলে অতীতে আমাদের মহৎ ব্যাপারসমূহ সাধিত হইয়াছে বর্ত্তমানেও সেই জাতীয় শক্তি আত্মগৌরব রক্ষার উপযোগী মহোচ্চ ব্যাপার সাধনে সমর্থ হইবে।

আমি এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বলিয়াছিলাম, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যেই যুগে স্বীয় মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছিল, যেই যুগে ধর্ম্মে দেবতায় ও গোমাতায় তাহার বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছিল, সেই যুগের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই একান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ তাহার ব্যাখা করিয়াছেন যে আমি এই দেশের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে চাই। এমন হীন অভিসন্ধি যে কেহ আরোপ করিবেন আমি তখন তাহা ভাবি নাই। যখন ইহাকে বৈদেশিক সভ্যতার কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি

তখন একভাবে ইহার সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করিতেছি বই কি। বৈদেশিক কিছু উৎকৃষ্ট এবং প্রয়োজনীয় হইলেও তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোন ভাব তাহাতে নাই। প্রাচ্য সভ্যতা হইতে প্রতীচ্য সভ্যতা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু তাহাও বিরাট, তাহা হইতেও অনেক কিছু শিখিবার আছে। অবশ্য পরকীয় কিছু গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গ্রহীতাকে আত্মস্থ ও শক্তিশালী হইতে হইবে। প্রাগুক্ত পাঠকেরা আমাকে যেভাবের প্রতিক্রিয়ার পক্ষপাতী মনে করেন আমি তেমন নহি। জীবন জীবনই, তাহা নিশ্চল নিষ্ক্রিয় নহে, গতিশীল প্রবাহ। অতীতকে কেহ ফিরাইতে পারে না। এই বিশ্বকে জগৎ (গতিশীল) বলা হয়; ইহার সকলই গতিশীল, কিছুই স্থির ও শান্ত নহে। একমাত্র স্থির ও শান্ত হইয়াছে চিৎ, তাহা হইতে গতির আরম্ভ। গতি দুই প্রকারের—তরঙ্গবৎ ও বর্ত্তুলবৎ। তরঙ্গিত গতি স্বল্পব্যাপক, বর্ত্তুলবৎ গতি বহুব্যাপক। আবার সমগ্র বিশ্বের গতি অন্য রকমের,—তাহা প্যাঁচের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে কোন অবস্থাতেই যে কোন স্থলে স্থিরভাবে থাকিবার উপায় নাই। অতীতের কোন একটা বাঁধাধরা আচারপ্রণালী এবং ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া চিরকাল বসিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আমি চাই আদর্শ ঠিক রাখিয়া উন্নতিসাধন। হিন্দু ভাবানুসারে ইহার অর্থ ভারতের চিরাগত সংস্কারকে অব্যাহতভাবে চলিতে দেওয়া। ভারতবাসী যখন আত্মস্থ হইবে, বিজাতীয় সাধনার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিবে, তখনই তাহা সম্ভব হইবে; যতক্ষণ উহা থাকিবে ততক্ষণ আত্মভাবের অভিব্যক্তি সম্ভব নহে। কারণ ঐ সমস্ত বিজাতীয় এবং পর হইতে গৃহীত। ফলে অস্বাভাবিক অনুকরণপ্রিয়তা ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় দোষ আসিয়া পড়িয়াছে; ঐ সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। পরকীয় প্রভাব যখন চলিয়া যাইবে ভারতের মুক্ত আত্মা

তখনই বিশুদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে। 'ভারতের ইচ্ছা' অর্থে ভারতের আত্মভাবানুসারে ইচ্ছা। আত্মস্থ ভারতের স্বরূপ তাহারই অতীত জীবনের উপাদানে নিজের আদর্শে প্রকটিত হইবে। ভারতীয় সংস্কার অনুসারেই তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে। সংস্কার বলিতে কোন একটা বিশেষ ভাব, কর্ম্ম বা ইচ্ছাকে বুঝায় না ; তাহা ব্যক্তির ও জাতির চরিত্রগত উপাদান—লাক্ষণিক প্রবৃত্তি। ভারতীয় সংস্কার অতীতে এক বিশেষ ফলোৎপাদন করিয়াছে। উহাই ভারতীয় সাধনার বীজ। আজও সে অন্য তেমন একটা কিছু প্রদান করিবে যদি তাহাকে আপনার ভাবানুসারে চলিতে দেওয়া হয়। অতীতে হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর হইবে না,—এমন বলা যায় কি ? যদি তাহাই হয় তবে ভারতের জীবন শেষ হইয়াছে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। তাহার অন্তিম নিঃশ্বাস অপরাপর সজীব জাতি-সমূহকে অনুপ্রাণিত করিবে। কিন্তু স্বয়ং ভারত-শক্তি—ভারতীয় আত্মার পার্থিব অভিব্যক্তি অন্তর্হিত হইবে। তখন এদেশের নরনারীর গতি কি হইবে ? কতকগুলি মানুষ অবশ্যই এদেশে বাস করিবে। তাহারা ভিন্নদেশীয় সভ্যতার সেবকের মতই চলিবে, বিজয়ীদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল শিল্পবাণিজ্যাদি পরিচালন করিবে। হয়ত জাতীয় শক্তির অপচয়-হেতু, এবং বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের ফলে বহু জাতির সংমিশ্রণে এক অভিনব সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইবে। রক্তাল্পতা ঘটিলে দেহের স্বাভাবিক পরিণতি এইরূপই ঘটে। যে পর্য্যন্ত জাতীয় শক্তি সতেজ থাকে, ধ্বংসকর ব্যভিচারসমূহে বাধা দিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত তেমন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ধ্বংসকর অত্যাচার কার্য্যতঃ আরম্ভ না হইলেও জাতির অনবধানতা, অকর্ম্মণ্যতা, ভীরুতা ও আত্মদ্রোহিতার দণ্ডস্বরূপ তাহা আসিবে। অতএব ভারতের মঙ্গলের জন্যই তাহার স্বীয় আদর্শ রক্ষা একান্ত আবশ্যক।

ভারতীয়দের গন্তব্য কোথায় তাঁহারাই তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। আমার কামনা, ভারত-প্রকৃতি আত্মস্থ থাকুন, সাধনায় স্বাধীন থাকুন। স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদের অতি প্রাচীনা মহতী ধারাকে স্বাধীন করিতে পারিলে এবং বিদেশীয় বিজাতীয় যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে অথচ নিজের মধ্যে অসমীকৃত রহিয়া গিয়াছে তাহা বর্জ্জন করিলে নিজের বিশুদ্ধ ইচ্ছামতই চলিতে পারিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলেই ভারত ঠিক ভাবে চলিবেন; কারণ উহাই ভারতের বিশুদ্ধ পথ। সহস্র সহস্র বৎসরের সংস্কার ও ভাবধারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেই। আমি ইহাও বিশ্বাস করি, ভারতীয় সাধনা মহত্ত্বপূর্ণ, সুতরাং তাহার ভাবসমূহ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইলে জগদ্বাসী সকলেরই কল্যাণ হইবে।

অবশেষে কয়েকটী নিন্দাবাদের উত্তর দিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার যে নিন্দা করা হইয়াছে আমি তাহার উত্তর দিব না; কারণ যাঁহারা আমার এই পুস্তক পাঠ করিবেন আমার ব্যক্তিগত নিন্দাবাদের সহিত তাঁহাদের কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ নাই। আমার প্রবন্ধসমূহের বিষয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে ভ্রমাত্মক ধারণা লইয়া সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা দূর করার চেষ্টাই আমার কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ এক ইংরেজ সমালোচকের কথাই বলি। তিনি আমার 'দার্শনিক চশমার' দোষ ধরিয়াছেন। আমার প্রবন্ধসমূহের ভিত্তিভূমি বেদান্ত। বেদান্তকে আমি একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র ত মনে করিই; পরন্তু ভারতীয় সাধনার ধারাকে সমর্থন করিতে হইলে যেসমস্ত ভারতীয় নীতিকে অবলম্বন করিতে হয় বেদান্তেই তৎসমস্ত সুবিন্যস্ত আছে। আমি বেদান্তের অদ্বৈত মত গ্রহণ করিয়াছি, কারণ প্রায় সকলেই এই মতাবলম্বী এবং আমি তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানি। আমি শাক্ত-মতানুযায়ী অদ্বৈতবাদেরই বিশ্লেষণ করিয়াছি। অন্যান্য মতও আছে।

আমি তৎসমস্তের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাহি না। এতদ্বিষয়ে আমার মত গ্রহণের জন্য অন্যকে প্ররোচিত করিতেও চাহি না। যাঁহার যেমন অধিকার তিনি তেমন ভাবেই গ্রহণ করিবেন। অদ্বৈতদর্শনের একটা বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রতি অনেকেই বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, অথচ ইহা স্বয়ং অন্য কোন পদ্ধতির বিরোধী বা তৎপ্রতি অসহিষ্ণু নহে। পাশ্চাত্য দেশে এমন কতিপয় লোক আছেন তাঁহাদের নিকট অদ্বৈতবাদ ষাঁড়ের চোখে লোহিতবস্ত্রের মতন ভয়াবহ। কেহ কেহ ত অদার্শনিকের ন্যায় ক্রোধপরবশ হইয়া ইহার প্রতি ঘৃণাবর্ষণ করেন এবং ইহাকে মিথ্যাবাদ বলেন। এই দোষদর্শী ইংরেজই বলিয়াছেন যে তিনি 'একেশ্বরবাদকে' ঘৃণা করেন। তাঁহার লক্ষ্য অদ্বৈত-বেদান্তের পূর্ণ ব্রহ্মকে অস্বীকার করা। উহার কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই বলিয়া 'একেশ্বর' (absolute) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় অদ্বৈতবাদ বুঝিবার শক্তি অপেক্ষা ঘৃণা করিবার ব্যগ্রতাই তাঁহার প্রবল। তাহারই তাড়নায় তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন, 'যে কোন ব্যক্তি ভারতীয় সাধনাকে বা তাহার কোন অংশকে এইরূপ মহত্ত্বপূর্ণ দেখাইতে চাহেন তিনি প্রকৃতপক্ষে ভারতের বন্ধু নহেন।' এতদ্দ্বারা তিনি আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে যদি আমি সত্যের দিক্ অবলম্বন না করিয়া থাকি তবে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইব। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্ত যে ভারতীয় সাধনার অঙ্গ—একটা বিশেষ অঙ্গ—সত্যই, একথা আমি না বলিয়া পারি না। বস্তুতঃ বেদান্তই ভারতীয় সাধনার মূল উপাদান। বেদান্তমতকে অভ্রান্ত প্রতিপাদন করার জন্য আমি কোন যুক্তি-তর্ক এস্থলে উপস্থিত করিব না। কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক,—বেদান্ত এত অপকৃষ্ট বা সাধনার হিসাবে অকিঞ্চিৎকর বিষয় নহে যে যিনি তাহার সমর্থন করেন তিনিই তাহার জন্মভূমির শত্রু বিবেচিত হইবেন। তেমন মত নিতান্তই

অশ্রদ্ধেয়। ইহাতে কেবল অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতাই প্রকাশ পায়। এই জন্যই অন্যান্য অশ্রদ্ধেয় ও হাস্যস্কর উক্তির সহিত ইহারও উল্লেখ করিলাম। কারণ, এইরূপ যাবতীয় নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য একই, তাহা খণ্ডনের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে ভারতের সাধনা সত্যমূলক নহে; সুতরাং যিনি যে কোনরূপে তাহার সমর্থন করুন, তিনি ভারতবাসীর বন্ধু হইতেই পারেন না। এইরূপ দোষদর্শী সমালোচকের উদ্দেশ্য, আমরা যেন এই সমস্ত অসত্যপূর্ণ সাধনার বিষয় ত্যাগ করতঃ অনাগত ভবিষ্যতের বিশ্বজনীন সত্যপূর্ণ সাধনতত্ত্বের দিকে যাই। তিনি বলেন,—মানবতার মূল প্রকৃতি প্রাচ্য কিম্বা প্রতীচ্যের আদর্শ অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও ব্যাপক। 'অংশ হইতে সমস্ত বৃহৎ'—বলা যেমন, ইহাও তেমন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েরই আদর্শ যে অতীত হইতে গৃহীত, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। তথাপি এক দিক্ হইতে ভারতীয় আদর্শের যথেচ্ছ কুৎসা করা হইলেও অপর দিক্ হইতে কেহ যেন তাহার সমর্থন না করে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। এইরূপ সমর্থনের অর্থ না কি তাঁহার নিকট তিলকে তাল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা; সুতরাং এইরূপ চেষ্টা তাঁহার অন্তরে ঘৃণা ও দুঃখদ ক্ষোভের উদ্রেক্ করিয়াছে! তাঁহার মতে 'মানবজাতি জীবনের নূতন আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে' —কিন্তু তাঁহার সেই আদর্শটা কিম্ভূত কিমাকার তাহা এখনও অজ্ঞাত। তিনি নিজকে 'নিবিড় চিন্তাশীল' বলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চিন্তারাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানসমূহের দ্বারা তেমন একটা কিছু খাড়া করুন তাহা হইলেই বুঝিতে পারি যে তাঁহার চিন্তার দৌড় কতদূর। আধুনিক চিন্তাশীলেরা সাধারণতঃ কল্পনারাজ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান। অতীতকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া ভবিষ্যৎটি সম্পূর্ণ নূতন কিছু হইবে এরূপ ধারণা কি ঠিক? এবং অনেকে কি সেই সত্যের আভাস পাইতেছেন? তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র

কথা। অধিকাংশেরই ধারণা এই যে মূল সত্যসমূহ পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। এমন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহারা অজ্ঞ ছিল এইক্ষণ তাহাদের অন্তরে তৎসমস্তের জ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও গভীরভাবে অঙ্কিত হইতেছে। অন্যান্য পরিবর্ত্তনও ঘটিতে পারে। হিন্দু ও খৃশ্চান উভয়েই অবগত আছেন যে মূল সত্যসমূহ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও তৎসমস্ত উত্তমরূপে আয়ত্ত ও ধারণা করার প্রয়োজন সর্ব্বদাই আছে। 'নিবিড় চিন্তাশীল' মহাশয় তাঁহার অজ্ঞাত যে তত্ত্বের অনুসন্ধানে রত আছেন তাহার আবিষ্কারের প্রয়োজন হিন্দু ও খৃশ্চানের নাই। খৃশ্চানের পক্ষে যাহা সত্য তাহা বাইবেল ও যীশুতে প্রকাশমান; হিন্দুর সত্য বেদেই স্বপ্রকাশ। অদ্বৈতমতে পূর্ণ সত্য হইতেছে স্বয়ং ভগবান্‌কে বিশুদ্ধরূপে অবগত হওয়া। বেদান্তের অন্য পদ্ধতি অনুসারে ভগবৎসান্নিধ্য লাভই সত্য।

এই সমস্তের অর্থ অচল হওয়া নহে, জীবন-প্রবাহকে অগ্রাহ্য করাও নহে। ঈশ্বর, আত্মা, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য কতিপয় সত্যমূলক জ্ঞান পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা তৎসমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সহিত আমাদের তত্ত্বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতরভাবে ঐক্য ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে—ইহা নির্দ্দেশ করাই উদ্দেশ্য। 'নিবিড় চিন্তাশীল' মহাশয়ের চিন্তা ও আশা যাহাই হউক, তাঁহার অব্যবস্থিত চিন্তাপ্রণালীর সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমার উদ্দেশ্য, ভারতকে বর্ব্বর আখ্যা দিয়া তদানুষঙ্গিক যেসমস্ত অভিযোগের আরোপ করা হয় তৎসমস্তের খণ্ডন করা।

ভবিষ্যতের স্বপ্নদর্শন অপেক্ষা বর্ত্তমানের প্রতি সুবিচার করাই সঙ্গত। এই সমালোচক মহাশয় মনে করেন যে ভারতের বিরুদ্ধে মিঃ আর্চ্চার ও অন্যান্য লেখকগণের আক্রমণ যেমন ঘৃণিত, ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সুবিচারবিধানের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র ও অসম্যক্ চেষ্টাও তেমনই দূষিত।

কেন না, তিনি মনে করেন যে ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধের ভাবই বর্দ্ধিত হইবে। আমার ইচ্ছা নহে যে তেমন ভাব বর্দ্ধিত হউক। বরং ভারতীয়দের অন্তরে সেই ভাব অতিমাত্রায় জ্বলিতেছে জানিয়া আমার মনে হইয়াছে, যেই জাতি হইতে এই অবিচারমূলক আক্রমণ আসিয়াছে সেই জাতি হইতে সুবিচারের চেষ্টা হইলেই ঐ বিষদিগ্ধ ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইবে এবং ভবিষ্যতে অযথা আক্রমণদ্বারা তেমন বিরোধের ভাব উদ্দীপিত করার পথে বাধা পড়িবে। রেষারেষি যাহাতে না জন্মে তেমন চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু যাহাদের বিরুদ্ধে অযথা দোষারোপ করা হয় তাহাদিগকে বা যাঁহারা তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদিগকে দোষ-ক্ষালনের অবকাশ দেওয়া অবশ্যই উচিত। যাহারা মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে, তাহাদের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সময়—"তুমি উত্তর দিও না, যদি দাও এবং আমার দোষপ্রদর্শন কর তবে রেষারেষি বৃদ্ধি হইবে"—এরূপ বলা কি সঙ্গত? ভবিষ্যতে হয়ত কোন বিশ্বজনীন সভ্যতার উদ্ভব হইতে পারে। তাহা হউক বা নাই-ই হউক, বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাকে যথাযথভাবে জানা এবং তৎসম্বন্ধে যদি অলীক দোষারোপ হইয়া থাকে তবে তাহার প্রতীকার করাই সুসঙ্গত। পরন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার স্তর যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর তাহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য।

জনৈক ভারতীয় সমালোচক মিঃ আর্চ্চারের প্রতিবাদ করিয়াছি বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুসমাজে যেসমস্ত পাপাচার প্রচলিত আছে তদ্বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করি নাই বলিয়া অনুযোগ দিয়াছেন যে 'ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকশূন্য স্থূলবুদ্ধি গোঁড়াদের হাতে ইহা মারাত্মক অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে, তাহারা যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনার বিরুদ্ধেও ইহার প্রয়োগ করিতেছে।' তেমন ভাবে যদি ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তজ্জন্য আমি

নিশ্চয়ই দুঃখিত। কিন্তু যুগপৎ সকল কাজই আমি করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটা বিশেষ অভিযোগ খণ্ডনের জন্য আমি ইহা লিখিয়াছি, হিন্দু-সমাজের পিঠে চাবুক লাগাইবার জন্য নহে। যেসমস্ত হিন্দুর পিঠ তজ্জন্য সুর্‌সুর্ করে তাঁহাদের সেই সুর্‌সুরি নিবারণের জন্য অনেকেই প্রস্তুত আছেন। ভারতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য লেখকেরা যেসব গ্রন্থ লিখিয়াছেন সেগুলি একবার দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। কেহ যেন আমাকে বুঝিতে ভুল না করেন, এই উদ্দেশ্যে আমি ইহাও বলিয়াছি যে আদর্শ এবং আচরণে যে পার্থক্য আছে তাহা আমি বেশ অবগত আছি। মন্দ যাহা তাহাও বহু স্থলে দেখাইয়া দিয়া সুবিবেচক সংস্কারকদের তৎসম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেও বলিয়াছি। আমি বলিয়াছি, মিথ্যা বর্ণনার পরিবর্ত্তে সত্য ঘটনার উল্লেখদ্বারা মিঃ আর্চ্চারের আক্রমণ অপেক্ষা অধিকতর তীব্রভাবে বর্ত্তমান হিন্দুদের দোষপ্রদর্শন করা যায়। আরো বলিয়াছি যে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি আধ্যাত্মিক হইলেও বর্ত্তমান হিন্দুরা যে সকলেই আধ্যাত্মিক তেমন বলা যায় না। বস্তুতঃ ইউরোপের নেতৃ-স্থানীয় লোকদের সহিত তুলনায় ভারতের সেই শ্রেণীর লোকেরা অধি-কাংশই হীন হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ স্তরের ইউরোপীয়দের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা আছে, ভারতীয়দের অনেকেরই নাই। অধিকন্তু ইহাদের অনেকেই ইউরোপীয় নিম্ন স্তরের লোকদের অনুকরণে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার উৎকট লালসায় আত্মহারা ; কোন ধর্ম্মজ্ঞান ইহাদের নাই। পক্ষান্তরে সাধারণ যাহাকে ধর্ম্ম কার্য্য বলে ইউরোপের কেহ কেহ তদনুরূপ আচরণ না করিলেও তাঁহারা স্বদেশের স্বজাতির ও সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলসাধনে রত আছেন। পাশ্চাত্য সকলেই বিষয়াসক্ত ও স্বার্থপর আর ভারতবাসী সকলেই নিঃস্বার্থ ও বিষয়নির্লিপ্ত আদর্শ লইয়া চলেন বলিলে ভুল হইবে। এইরূপ আতিশয্যতার কারণও পাশ্চাত্য সমালোচকদের হিতাহিত

বিবেকশূন্য একদেশদর্শী সমালোচনার কুফল। পাশ্চাত্যেরাই এই ভাবের আক্রমণ প্রথম আরম্ভ করিয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি যে প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার অন্য দিক্‌ও আছে। যাঁহারা ইউরোপীয়দিগকে শুধু অর্থোপাসক মনে করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বাঙ্গালার বিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ্ সার পি সি রায় লিখিয়াছেন,—"তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিষয়মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।"—ইহার জন্য পাশ্চাত্য প্রভাব যে কিয়ৎপরিমাণে দায়ী তাহা নিঃসন্দেহ। আমি যে অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছি তাহা এই ঃ—হিন্দু সভ্যতার প্রকৃতি ধর্ম্মহীন, কেবল যুক্তিকে বিভ্রান্ত করায় এবং ধর্ম্মকে কতকগুলি প্রথার মধ্যে ফেলিয়া অধঃপাতিত করায় হিন্দুর প্রতিভা বিকাশ পাইয়াছে।" মহাসমরে ইউরোপীয় সমাজ বিধ্বস্ত হওয়ার পর তাহা যখন পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং অর্থ নৈতিক অন্যান্য রকমের ঈর্ষাদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়াছে তখন কতিপয় ইউরোপীয় প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ লইয়া অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা এসিয়াবাসীকে একেবারে ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিতেন, একমাত্র তাঁহারাই প্রকৃত ধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া দম্ভ করিতেন, আর এইক্ষণ তাঁহারা এসিয়াবাসীর সহিত ঐ স্পৃহনীয় বস্তুর অংশভাগী হওয়ার জন্য অত্যুগ্র দাবী করিতেছেন। এই বিপরীত ভাব বড়ই বিসদৃশ। অন্যের মনোভাবের প্রতি যাহাদের অনুমাত্র শ্রদ্ধাও নাই তাহাদিগকে কেহ অবজ্ঞা করিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেই তাহারা ক্ষুব্ধ হয়। স্থূল কথা ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় জাতির মধ্যে ধার্ম্মিকও আছে, অধার্ম্মিকও আছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সাধারণ প্রকৃতি এবং ভারতের পুরাকালীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা।

উক্ত ভারতীয় সমালোচক মহাশয় আমার আর একটী ত্রুটি

ধরিয়াছেন। ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে 'অতিশয় মহত্ত্বপূর্ণ' বলায় তিনি স্পর্দ্ধাসহকারে আহ্বান করিয়াছেন,—'বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে চলিতেছেন এমন একটি পরিবার বা একটি মানুষও ভারতে যে আছেন তাহা কেহ দেখাইতে পারিবেন কি?'—না থাকিতে পারেন। * আমি বরাবর আদর্শের কথাই বলি, বর্ত্তমানে কোথায় কি আছে, না আছে, তাহা দেখি না। এতৎসম্পর্কে আমি আরো বলিতে চাহি, বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের যে অধঃপাত ঘটিয়াছে, তাহার বা তাহার কোন অনাচার অত্যাচারের সমর্থন করিতেছি বলিয়া যদি কেহ মনে করেন তবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। পক্ষান্তরে যাঁহারা হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছেন আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও উৎসাহ দান করি;—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতি, বাল্যবিবাহ রহিত, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু

---

* বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে চলিতেছেন এমন একটি লোকও ইদানীং ভারতে নাই বলিয়া যাঁহার ধারণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা বাল্যকাল হইতে সদাচারী থাকেন, গর্ভাষ্টমে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, ২১।২২ বৎসরে দারপরিগ্রহ করেন, চাকরী গ্রহণ করেন না, শিষ্যদের প্রদত্ত সাহায্য ও চতুষ্পাঠীর বৃত্তিই যাঁহাদের অবলম্বন, নিজে দরিদ্র হইলেও কতিপয় ছাত্রকে স্বগৃহে রাখিয়া অন্নদান করিতে কুণ্ঠিত হন না, শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধ কোন কাজ করেন না, মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির সংশ্রব রাখেন না, এবং যাঁহাদের নিত্য কার্য্যপ্রণালী এইরূপ:—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, স্নান সন্ধ্যাসমাপনপূর্ব্বক গো-সেবা, পুষ্পোদ্যানে কাজ, ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান, ১১টার সময় আবার স্নান সন্ধ্যা ও পূজা, ১টার সময় আহার, তৎপর আবার ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান, অপরাহ্নে আগন্তুক জ্ঞানার্থীদিগের জন্য পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা, সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনান্তে ছাত্রদের অধীত বিষয়ে আলোচনা রাত্রি ১০টার পর আহার ও তৎপর নিদ্রা'—তাঁহারা কি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন? এতদ্ব্যতীত কঠোর তপস্বী, অগ্নিহোত্রী, চিরকুমার ব্রতাবলম্বী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও কত আছেন। স্পর্দ্ধাকারী মহাশয়ের মতে ইঁহারা কি? [অনুবাদক]

এই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত তথ্য কি, ভারতীয় সভ্যতার নীতি কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যভিচার ঘটিতেছে সর্ব্বাগ্রে তাহাই বিশদরূপে আমাদের জানা আবশ্যক। তৎপর দেখিতে হইবে ভারতের সংস্কার কি ভারতের নীতি অনুসারে হইবে, না পাশ্চাত্য নীতি অনুসারে হইবে। অবশ্য ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যে অভাব আছে তদ্দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক কাহারো সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি সুস্পষ্ট দেখিতেছি, ভারতের উন্নতি খাঁটি ভারতীয় ধারানুসারেই হওয়া উচিত, অর্থাৎ যে বীজ হইতে ভারতীয় জাতির উদ্ভব হইয়াছে সেই বীজের ধর্ম্মানুসারেই চলিতে হইবে। বীজ ও অতীতে তদুৎপন্ন কোন ফলকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমানের প্রয়োজনমত ফলও সেই বীজ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়কে কোনরূপ ধর্ম্মমতের সহিত মিশ্রিত করাও উচিত হইবে না। ভারতে বহু ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইয়াছে, যথা—বহু শাখাপ্রশাখাসমন্বিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম, মুসলমান ও খৃশ্চান ধর্ম্ম। ভারতের আত্মা যদি অবিকৃত থাকে, তবে তাহা যে কোনরূপ ধর্ম্মকে আবরণস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে হানি নাই, এবং স্বীয় প্রকৃতিতে দৃঢ় থাকিয়া নিজের ভাবানুসারে ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মতের সৌন্দর্য্যও উপভোগ করিতে পারে। যেমন, অন্যত্র আমি বলিয়াছি, ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃতি অন্যান্য স্থানের মুসলমানের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। ভারতীয় খৃশ্চানদের সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যাইতে পারে যদি প্রতীচ্য খৃশ্চানেরা অজ্ঞতাবশতঃ খৃশ্চানধর্ম্মকে যে আকারে পরিণত করিয়াছেন তাহার দিকে না তাকাইয়া প্রাচ্য যীশুর প্রেরণানুসারে চলেন। এই কথায় ইহাও বুঝিতে হইবে না যে এই সমস্ত বিভিন্ন আকার মিথ্যা এবং অনুপযোগী। প্রথমতঃ জাতির বীজ ঐ সমস্ত ধর্ম্মমতের প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ করিবে, তৎপর সেই বীজ হইতেই

উন্নতি সাধিত হইবে, বহিরাবরণের মত গ্রহণ করিবে না। স্থূল কথা সমস্ত ব্যভিচার দূর করিতে হইবে, তারপর মানুষ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অধিকারানুসারে সত্যকে গ্রহণ করিবে। যাঁহারা মনে করেন যে আমি অতীতের কোন একটা মতকে ধরিয়া আছি, এবং তাহার ব্যভিচারের বিষয় অবগত নহি বা তৎপ্রতি লক্ষ্য করি না, তাঁহারা ভুল করেন। আমি স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী। যে কেহ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াও বহু প্রাচীন সত্য মত গ্রহণ করিতে পারেন।

অবশেষে এক ইংরেজ সমালোচক আমার উপর দোষারোপ করিয়াছেন যে আমি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, বিশেষতঃ খৃশ্চান সভ্যতাকে অনুচিতভাবে আক্রমণ করিয়াছি। ইহা সত্য নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি দুষ্ক্রিয়াকে মাত্র আমি আক্রমণ করিয়াছি, অন্যান্যেরাও তেমন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কেহ পাশ্চাত্য সভ্যতা সমালোচনার অতীত বা সর্ব্ববিষয়ে তাহা ভারতীয় সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভান করেন না। ভারতে তেমন সমালোচনা অপ্রীতিকর হওয়ার কারণ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইত তবে বিগত ইউরোপীয় মহাসমর ঘটিত না, এবং ইউরোপের বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণামও দেখিতাম না ; সমাজের পুনর্গঠনের কথাও উঠিত না। সেই সময় চলিয়া গিয়াছে যখন এদেশীয়েরা ইউরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, যখন খৃশ্চান ইউরোপকে কৃত্রিম মনোরম চিত্রে চিত্রিত করিয়া এদেশবাসীর সমক্ষে ধরা হইত, এবং তাহার তুলনায় এদেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সমস্তকে শয়তানের কাণ্ড ও ধর্ম্মকে পাষণ্ডের বুজরুকি বলিয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইত। এদেশের যে সবই ভাল তাহা আমি বলি না। যেমন পাশ্চাত্যে তেমনই প্রাচ্যেও মন্দ আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দোষদর্শীরা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ না হন, সমস্ত প্রকারের

কপটতা ও বৃথাভিমান বর্জ্জন না করেন সেই পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাদের উপদেশ শুনিবেও না, আপনার দোষ ত্রুটি সংশোধনের জন্য কেহ তাঁহাদের আনুকূল্যও গ্রহণ করিবে না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যাঁহারা নিজের সভ্যতার বিরুদ্ধে কোনরূপ সমালোচনা শুনিলে রুষ্ট হন তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যথেচ্ছ দোষারোপ করা হইতেছে দেখিয়াও তদ্বিরুদ্ধে শব্দটিও করেন না। এইরূপ স্বার্থান্ধতা কখনো ভাল নহে। পাশ্চাত্যবাসীরা সাধারণতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভয়ঙ্কর দোষসমূহের প্রতি যে লক্ষ্য করেন না, কেবল ভারতীয় সভ্যতার যুগযুগান্তব্যাপী সদ্‌গুণসমূহকেই তুচ্ছ করেন তাহার ফল কখনো মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না।

খৃশ্চান সভ্যতাসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই,—পাশ্চাত্য রাজ্য যতক্ষণ যথার্থ খৃশ্চান ধর্ম্মানুমোদিত পথে না চলে, বা তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন বিশুদ্ধ নীতি অবলম্বন না করে ততক্ষণ তাহার সমুচিত সমালোচনা করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা খৃশ্চান সভ্যতার নহে, তাহার নামে অন্য যাহা চলিতেছে তাহারই দোষপ্রদর্শন করা হইবে। যীশুর উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব মূলতঃ সন্ন্যাস। আমার বাসনা আছে তাহার সহিত হিন্দুত্বের তুলনা করিয়া দেখিব। এইক্ষণ আমি তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। ইহাতে খৃশ্চান নামে প্রখ্যাত কোন মত বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের প্রয়োজন নাই। জনৈক ইংরেজ লেখক সত্যই বলিয়াছেন,—"যীশুর লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাহার ভিতর হইতে পরপীড়ন, স্বার্থপরতা, পরবিদ্বেষ ও প্রতিবেশীর প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি কলুষতা বিদূরিত করা। যীশু মূলে বড় শক্ত। যদিও তিনি সরল এবং তাঁহাকে সহজে বুঝা যায়, তথাপি তাঁহার অনুসরণ করা বড় কঠিন। গোল বাধিয়াছে সেইখানে যেখানে সংসার তাঁহাকে অনুসরণ করিতে চাহে না।

সংসার নিজের মতে চলিয়াই বিনাশের পথে ছুটিয়াছে। তাঁহার সোজা কথা কাজে পরিণত করিবার জন্য যখন সমাজকে বলা হইল তখন সমাজ-নেতৃগণ তাহা করিলেন না, তাঁহারা শপথপূর্ব্বক অভিশাপ দিয়া বলিতে লাগিলেন যে 'তাহা সত্যের পথ নহে।" অধ্যাপক ডবলিউ রেমিংটন তাঁহার 'কন্‌সেন্স অব্‌ ইউরোপ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"ইউরোপে কিছুকাল যাবৎ খৃশ্চীয় জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতদের (পাদ্রীদের) আসন সর্ব্বোপরি থাকা উচিত তাঁহাদেরও দু'একজন ব্যতীত অপর সকলেই ভয়ঙ্কর জাতীয়তাবাদী (নেশনেলিষ্ট) দলবিশেষের পক্ষাবলম্বী হইয়াছেন।"

লক্ষ্য হইতেছে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিরাট ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। তাহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণ জাতিবুদ্ধির স্থান নাই, বিশুদ্ধ জাতীয়তার ভিতর দিয়াই তাহা পাওয়া আবশ্যক। সমগ্র জগৎকে একটি যন্ত্র, এবং প্রত্যেক লোকসমাজকে তাহার অংশ মনে করিতে হইবে। কিন্তু কোন মানবসমাজই এইক্ষণ সাকল্যে তাহা করিবে না। তেমন অবস্থা পাওয়ার জন্য সমস্ত মিথ্যা কপটাচার দৃঢ়তার সহিত দূর করিতে হইবে। তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াও যদি সাফল্য লাভ করা না যায় তথাপি সেই চেষ্টার মাহাত্ম্য বিনষ্ট হইবে না। তাই বলি, আসুন, সেই সুবাঞ্ছিত ফললাভের জন্য ভারত কি করিয়াছেন তাহা এবং তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য সকলে যত্ন করি। জাতীয় সাধনা বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র হইলেও এই ভ্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠার পথে তাহা কোনরূপ বাধা উপস্থিত করিবে না।

প্রথমোক্ত সমালোচক বলেন, "এমন লোক চাই যিনি শিক্ষিত ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য আদর্শসমূহের সুগভীর তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শকে ভারতে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।" আমি বলি,—মিঃ আর্চ্চারের বই-ই তাহার প্রমাণ।

আধুনিক পাশ্চাত্য মতসমূহ যখন পরস্পরবিরোধী তখন পাশ্চাত্যের স্থির সিদ্ধান্ত কি তাহা জানা আবশ্যক। সমালোচক যদি সত্যই মনে করেন যে তৎসমস্ত বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তবে ভারতীয় সভ্যতাসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের এবং তৎপ্রতি সুবিচারবিধানের চেষ্টাকে ঘৃণা বিদ্রূপ করিলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তজ্জন্য সর্ব্বাদৌ চাই নিজকে অযথা শ্রেষ্ঠ মনে করার ভাব ও মিথ্যাখ্যাপনের বৃত্তি উভয় পক্ষের অন্তর হইতে দূর করা। সমস্ত রকমের মিথ্যা ছলনা ও কপটতাকে ঘৃণা করা,—তাহা ইংরেজেরই হউক বা ভারতবাসীরই হউক। তৎপর উভয় সভ্যতার প্রকৃতি ও গুরুত্বসম্বন্ধে যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা।

ভারতীয় সভ্যতার নীতি বা তাহার বর্ত্তমান ব্যবহার কিম্বা অপব্যবহারকে সমালোচনার অতীত বলা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতাও নির্দ্দোষ নহে। আমার বক্তব্য, ভারতকে বুঝিতে বরাবর ভুল করা হইতেছে; ইহার সম্বন্ধে জগদ্বাসীর অন্তরে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে; ইহার গুরুত্ব যথোচিত উপলব্ধি করা হয় না এবং ইহার যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করা হয় তত্তুল্য এবং তদপেক্ষা অনেক অধিক মারাত্মক দোষ ইউরোপেও আছে। উভয়ের মধ্যে গুণ ও দোষ কি আছে তাহা আমি দেখি। মিঃ আর্চ্চারের বইতে কেবল দোষই প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য আমি তাহার উত্তরস্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার গুণেরই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক মিথ্যাপবাদ ক্ষালনও ইহার লক্ষ্য। কারণ, ভারতের মহদুক্তিমতে "সত্যাৎ নাস্তি পরমো ধর্ম্মঃ"। মিঃ আর্চ্চারপ্রমুখ যাঁহারা ভারতবাসীকে বর্ব্বর বলেন সেই বর্ব্বরদের বেদ বলিয়াছেন—"সত্যমেব জয়তে।"

কলিকাতা
৩১শে মে, ১৯১৯।

জন উড্রফ।

পরিশিষ্ট (২)

সার জন উড্রফ "Is India civilized ?" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ ঃ—

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পর যেসমস্ত সমালোচনা হইয়াছে তন্মধ্যে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার প্রবন্ধই প্রধান। ইহার লেখক বলিয়াছেন যে আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার, বিশেষতঃ খৃশ্চান ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যে তুলাদণ্ড সমানভাবে ধরি নাই। এই বিশেষ অভিযোগ সম্বন্ধে যেন পাঠকগণ স্বয়ং বিচার করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে উক্ত প্রবন্ধটি ইহার পরিশিষ্টরূপে উদ্ধৃত করিলাম। *

সমালোচক আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। ভারতের পক্ষ সমর্থন অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার উপর সকল দিক্ হইতে যে আক্রমণ হইতেছে তাহা খণ্ডনই আমার লক্ষ্য ; সুতরাং ঐরূপ আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় সভ্যতার অনুকূলে যাহা যাহা বলা আবশ্যক আমি তাহাই বলিয়াছি। আমি ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোক্তা নহি, তথাপি ভারতের যে কতকগুলি নিন্দনীয় বিষয় আছে আমি তাহা অস্বীকার করি নাই। বারম্বার বলিয়াছি, বর্ত্তমান ভারতের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে আমি অন্ধ নহি। প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জাতির বিরুদ্ধেই তেমন কিছু বলা যাইতে পারে। কতিপয় ভারতবাসী নানারূপে স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু বলিয়া গৌরব করেন তাঁহারাও অধঃপতিত হইয়াছেন। কতকগুলি স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করতঃ জনৈক

* আমরা ৩য় পরিশিষ্টে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ দিয়াছি। [অনুবাদক]

ইংলিশ মিশনারীর উক্তিমত ইংরেজের পালকপুত্র হইয়াছে; আর কতকগুলি সমাজ, সাধনা কিম্বা রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে যখন যে প্রভুত্ব লাভ করে তাহারই পাদ্য অর্ঘ্য যোগায়। এইরূপ নানা কারণে ধর্ম্মের উপর অধর্ম্মের পরগাছা জড়াইয়াছে। তৎসমস্তের আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয় নহে। মিঃ আর্চ্চার ভারতের ধর্ম্ম ও সাধনার সমস্ত বিষয়কে অবৈধভাবে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া তাহারই বিশেষভাবে প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য। দেখা যাইতেছে আমার বিরুদ্ধ-সমালোচকেরা কেহই মিঃ আর্চ্চারকে সমর্থন করেন না। ইহাই প্রমাণ যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। ইংরেজ সমালোচকেরা আমাকে সমর্থন করেন না, কারণ আমি খৃশ্চানধর্ম্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতার দোষ প্রদর্শন করিয়াছি। আমার উক্তিসমূহ যদি তাঁহারা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে আমার কোন উক্তিই প্রত্যাহার করিবার নহে, বরং অবসর থাকিলে আরো অনেক কিছু যোগ করিতাম।

"কলিকাতা রিভিউর" সমালোচক মনে করেন যে আমি খৃশ্চানধর্ম্মের যথোচিত গুণগ্রহণ করি নাই। খৃশ্চানধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন এই ক্ষুদ্র পুস্তকের লক্ষ্য নহে। তজ্জন্য অসংখ্য গ্রন্থাদি রহিয়াছে। খৃশ্চানধর্ম্মের প্রচারার্থ কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। তাহাতে প্রমাণ হয় যে 'বন্য' সভ্যতা বলিয়া যাহাকে তুচ্ছ করা হয়, তাহাও অর্থের মোহ হইতে দূরে আছে। পরন্তু ভারতের মহত্ত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া খৃশ্চানীর মহত্ত্ব অস্বীকার করাও আমার অভিপ্রেত নহে। সকল ধর্ম্মেরই কতকগুলি মূল বিষয় একইরূপ। এই সমালোচক লিখিয়াছেন, যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার প্রশংসা করেন তাঁহাদের মতে বৈদান্তিক ধর্ম্ম সম্যক্ স্বতন্ত্র-গুণবিশিষ্ট। এইরূপ মতকে উক্ত সমালোচক অশ্রদ্ধেয় বলিয়াছেন। আমিও তাহাই বলি। আমি কখনো তেমন মত পোষণ করি

না। আমি ভালরূপেই জানি যে সকল ধর্ম্মেই কতকগুলি মূল্যবান উপাদান আছে ; না থাকিলে ঐসমস্ত ধর্ম্ম টিকিতেই পারিত না। বেদান্ত কোন ধর্ম্মের কুৎসা করেন না, সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু অপর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় নিজের ধর্ম্মব্যতীত অন্য ধর্ম্মের প্রতি তেমন ব্যবহার করেন না। খৃশ্চানেরা ভারতের ধর্ম্মকে 'পুতুলপূজা' 'বর্ব্বরতা' ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করেন ; তাহাই আমার আলোচ্য বিষয়। আমার প্রশ্ন, যে মহোচ্চ নীতির দাবী পাশ্চাত্য ধর্ম্মসমূহও করেন তাহা এত নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে কিরূপে থাকিতে পারে ? তদুত্তরে বলিব, ভারতীয়দের প্রতি 'বর্ব্বর' 'বর্ব্বরের অজ্ঞতা', 'সভ্যতার অভাব' ইত্যাদি উক্তিই মূর্খতা ও ভ্রান্তিজনিত। ভগবান সকল সময়ে সকল লোকের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন যেন তাহারা তাহাদের শক্তি অনুসারে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ভগবান সর্ব্বদাই পূর্ণ ও নিষ্কল। যাঁহার নিকট তিনি প্রকাশিত হন, উহার মনের অবস্থানুসারেই তিনি আকারিত হইয়া থাকেন। কোন ধর্ম্মই কেবল মিথ্যায় পূর্ণ নহে। বেদান্তানুসারে আবার কোন ধর্ম্মই মিথ্যাচার ও দোষত্রুটি বর্জ্জিত নহে। শাক্তমত হইতে বেদান্তকে স্বতন্ত্র বলা ভ্রমাত্মক। ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা 'ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন' তাঁহারা প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন। শৈব, বৈষ্ণব ও অন্যান্য মতের ন্যায় শাক্তমতও শাস্ত্রীয়। শাক্তমতকে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় সাধনার নেতৃগণ অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন বলাও ঠিক নহে। যদি কোথাও তেমন ঘটিয়া থাকে তবে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুরা ও তাঁহাদের ইংরেজ গুরুরাই তাহার কারণ।

এই সমালোচক লিখিয়াছেন, 'বেদান্তের বিশুদ্ধ মতানুসারে এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া।'—আমি বলিব, এইরূপ অভিমতই মায়া। 'বাস্তবতা'

সম্বন্ধে আমি যে গ্রন্থ লিখিয়াছি তাহাতেই এই বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। উহার প্রচারের পর জনৈক ভারতীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—এইক্ষণ ভারতবাসীর কর্ত্তব্য মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব রাজ্যে যেসমস্ত গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে অভিনিবিষ্ট চিত্তে সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োগপূর্ব্বক সেই সমস্তের সমাধান করা। 'বেদান্তটি সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন ও তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য যত্ন করাই কর্ত্তব্য' বলিলেই ঠিক হইত। বুঝিবার অক্ষমতাবশতঃ যে অংশ পাঠে কাহারো মায়াবাদ বলিয়া সংশয় উপস্থিত হয় তাহার উহা পাঠ না করাই সঙ্গত। ইহার এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তৎসম্বন্ধে উক্ত সমালোচক লিখিয়াছেন 'কর্ম্মবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই থাকুক ভারতীয়দের আচরণ দেখিয়া মনে হয় তাহা বিষম ভ্রান্তিজনক।'—শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিবে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যাহারা মিথ্যাচারী হয় তাহাদের কথা শুনিবে না।

এক ব্যক্তি জীবনের যাহা কিছু সমস্তই দৈবায়ত্ত বলায় আমার এক বন্ধুর গুরুদেব বলিয়াছেন,—'সে কালী মায়ের সন্তান নহে।' কর্ম্মবাদের মূল তত্ত্ব হইতেছে, মানুষই মানুষের নিয়ামক! বিধাতা সকল সন্তানের কপালে তাঁহাদের অদৃষ্টলিপি লিখিয়া দেন বলিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরাই বিশ্বাস করে। পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা কথা আছে,— 'নির্ব্বোধেরা গ্রহনক্ষত্রাদির দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তিরা গ্রহ-নক্ষত্রাদিকেই নিয়ন্ত্রিত করেন।' পক্ষান্তরে বলা যায়, মানুষ কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সেই সমস্ত প্রবৃত্তির কোনটাকে কার্য্যকরী করা বা কোনটাকে না করা মানুষের নিজ কর্ম্মের উপরই নির্ভর করে। মানুষের ভিতরে যে পশুত্ব আছে তাহা লইয়া থাকা কাহারো উচিত নহে।

প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মূল নীতির সহিত পরে তাহাতে যাহা সংযোজিত হইয়াছে তাহাকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান খৃশ্চানধর্ম্ম যে যীশুখৃষ্টের উপদেশের অনুরূপ নহে, বর্ত্তমানে যাহা খৃশ্চানধর্ম্ম বলিয়া চলিতেছে তাহার প্রকৃতি এবং 'চার্চ্চ'সমূহের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। চার্চ্চসমূহের মধ্যে একের মতের সহিত অন্যের মত মিলে না। প্রত্যেকেই বলেন, অপরের ধর্ম্ম সত্য নহে। প্রচলিত খৃশ্চানধর্ম্মই ভারতীয় শাস্ত্রোপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না, এবং মূর্ত্তিপূজকদের মধ্যে যে কোন গুণ থাকিতে পারে তাহাও স্বীকার করেন না। বেদান্ত তাঁহার এইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞ নিন্দুকদের প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করেন। সমালোচক আমাকে খৃশ্চানধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞ মনে করেন, আমি তেমন নহি। খৃশ্চানধর্ম্মে যে ভগবানের মহত্ত্ব ও অণুত্ব উভয়েরই উপদেশ আছে তাহাও জানি। নানা কারণে, বিশেষতঃ স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে বলিতেছি যে খৃশ্চানধর্ম্ম ভগবানকে অনধিগম্য মহৎ বলিয়াই মনে করেন, অপর দিকে লক্ষ্য রাখেন না। এসম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাইয়াছি। দেশীয় একটা স্কুলে অনেকগুলি খৃশ্চান বালিকাও পড়ে। একটা ইংরেজী কবিতা পড়াইবার সময় তাহাদেরে জিজ্ঞাসা করা হয়, স্বর্গ কোথায় ? তাহারা উত্তরে বলে, 'আকাশের উপরে'। তারপর প্রশ্ন হইল, এরোপ্লেনে তথায় যাওয়া যায় কি না ? তদুত্তরে বলিল,—'বলিতে পারি না'। সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিতেছিল যে স্বর্গ এত উপরে যে এরোপ্লেন ততদূর উঠিতে উঠিতে তাহার পেট্রোল ফুরাইয়া যাইবে। একটি ছোট হিন্দু বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, 'স্বর্গ আমার হৃদয়ে'। এইখানেই হিন্দু-শিক্ষার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল কি ? খৃশ্চান বালিকারা সকলে হাসিয়া ফেলিল !

প্রাচ্য অধিক ধার্ম্মিক না পাশ্চাত্য, তাহা লইয়া আমি বাদানুবাদ

করিব না। ভারতবাসীর ধর্ম্মজ্ঞান নাই, এই হাস্যস্কর উক্তি খণ্ডন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—তৎসম্বন্ধেও আবার বলিব, আদর্শ এবং কার্য্যতঃ যাহা করা হয়, এই উভয়ের পার্থক্য দেখিতে হইবে। সমালোচক মহাশয়ের একটা উক্তিসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে তাঁহার দেশবাসী যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের ধার্ম্মিকতার পরিচায়ক বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞতার সহিত যুদ্ধের সম্পর্ক কি? কাহারো—(অনেকেরই বলা উচিত) দেশের প্রতি মমতা এবং এই সাধারণ জ্ঞান ছিল যে তাঁহারা যদি দেশ রক্ষার জন্য না দাঁড়ান তবে নিজেরাই পরাভূত হইবেন। অন্যেরা বাধ্য হইয়া তাহাতে যোগদান করে। ঐ প্রথমোক্ত শ্রেণীর ইংরেজ যদি উত্তম খৃশ্চান হন তবে তুরস্কের মুসলমানেরাও তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেমের জন্য উত্তম খৃশ্চান। বস্তুতঃ উহা ধর্ম্ম নহে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সভ্যতার হীন প্রভাব স্বত্তেও উহাতে অনেকের পুরুষকারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কোন সৈনিকের বীরত্বের প্রশংসা করিবার জন্য তাহাকে 'খৃশ্চান বীর' বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। মনে রাখা উচিত, স্বার্থপরতাকে আত্মোৎসর্গের মুখোস্ পরাইলে তাহা জগদ্বাসীর ঘৃণার উদ্রেক্ না করিলেও হাস্যোদ্দীপক হয়। জনৈক আমেরিকান বলিয়াছেন "আত্মরক্ষার জন্যই আমরা যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলাম।" এক গ্রন্থকার সেই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন,—'অন্যান্যের ন্যায় জগতের সভ্যতা রক্ষা, বা ধর্ম্ম ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমেরিকানেরা যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন না বলায় সন্তুষ্ট হইলাম।' ঐ ভাবে স্বজাতিকে ধার্ম্মিক সাজাইবার জন্য যেসমস্ত বর্ণনা করা হয় তাহা সত্য নহে। বস্তুতঃ 'চার্চ্চ এবং যুদ্ধ' অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্যই যুদ্ধ, এরূপ কথা না বলিলেই চার্চ্চের পক্ষে মঙ্গল। অবশ্য "সোসাইটী অব্ ফ্রেণ্ড্স্" ইহার

অন্তর্ভুক্ত নহেন, কারণ উঁহারা যীশুখৃষ্টের উপদেশানুযায়ী চলিবার চেষ্টা করেন। মাননীয় পোপও শান্তির কথা কহিয়াছিলেন, যুদ্ধের জন্য দুঃখ করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাকে জার্ম্মাণপক্ষপাতী বলা হইয়াছিল। সমালোচক ধর্ম্মের অর্থ বুঝিতে ভুল করিয়াই বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান ভারত-বাসীরা সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, শিল্পাদির উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, অতএব তাহারা বিষয়াসক্ত। সাংসারিক ব্যাপারে উন্নতির চেষ্টা পাপজনকও নহে, ধর্ম্মবিরুদ্ধও নহে। কর্ম্মের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং ভাবের উপরই সমস্ত ভালমন্দ নির্ভর করে। ইউরোপ ঘুরিবার ফলে হয়ত কেহ বিষয়ান্ধ হইতে পারে। পাপ ও পুণ্যের সহিত কারখানার অনিবার্য্য কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবানের চরণে কর্ম্মের ফলাফল দান এবং সেইভাব মনে রাখিয়া নিত্য যাহা করা হয় তাহাই শ্রেয়ঃ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা নিন্দার অতীত, এমন কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং ভারতের বহির্ভাগে কোথাও তেমন কথা শুনা যায় না। আমি নিজেই যখন পাশ্চাত্য সভ্য, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অবিচার করার ইচ্ছা আমার থাকিতে পারে না। কোন কোন ইংরেজ স্বদেশে থাকিয়া স্বজাতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তুলনায় আমার উক্তি বরং অনেক মৃদু। আমার অপরাধ আমি ভারতে থাকিয়াই বলিয়াছি, অন্যেরা স্বদেশে বলিয়াছেন। এদেশবাসীর নিকট ইংরেজদের আত্মমর্য্যাদার যে একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে আমার উক্তি তাহাতেই ঘা দিয়াছে। কিন্তু মর্য্যাদা নির্ভর করে যথার্থ গুণের উপর, গুণহীনতাকে ঢাকিয়া মর্য্যাদা লাভ করা যায় না। মন্দ যাহা নিজের পরিবারের মধ্যে থাকে তাহাও দূর করা আবশ্যক, তাহাতেই মর্য্যাদা লাভ করা যায়।

মিশনারীদের সমস্ত প্রয়াস রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য, এমন কোন কথাও আমি বলি নাই। আমার আকাঙ্ক্ষা, ভারতীয়েরা অতঃপর ধর্ম্মই

হউক, মনোবিজ্ঞানই হউক বা শিল্পাদিই হউক, সকল বিষয়ে নিজেরাই নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করিবে। বর্ত্তমান যুগের প্রথম শিক্ষার বিষয় হইতেছে, আত্মনির্ভর হওয়া। অন্তেরা আমাদিগকে উপদেশ দিতে পারেন, সাহায্যও করিতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত হইতে নিজকে স্বাধীন রাখাই নিরাপদ্। স্থূল কথা, নিজের স্বার্থ নিজে যেমন করিয়া দেখিব, অন্য যে কেহ তেমন দেখিতে পারেন না, বিশেষতঃ যেই যুগে অন্যান্য সমস্ত যুগ অপেক্ষা কপটতা ও কুটিলতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইঁহার কথা ছাড়িয়া এইক্ষণ অপরাপর সমালোচকদের সম্বন্ধে কিছু বলিব। একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা' উক্তির দ্বারা আমি কি বুঝাইতে চাহি। নিতান্ত মূর্খ ইউরোপীয়দের মধ্যেও এইরূপ অজ্ঞতা দেখা যায় না। যাহারা এইরূপ প্রশ্ন করে তাহারা এমনই এক আত্মা লাভ করিয়াছে যে যিনি উহাদিগকে স্বীয় বিদ্যমানতা অবগত হইতে দেন নাই। নিজের আত্মাকে যে জানে না, সে ত মানুষই নহে। হল্যাণ্ডের কবি ডি জেনেষ্টেট দুই পংক্তি কবিতায় সুন্দরভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—"আমি একজনকে বলিলাম, আত্মনিষ্ঠ হও, কিন্তু সে হইতে পারিল না, সে যে মানুষই নহে।" কোন সম্প্রদায় ও জাতির সম্বন্ধেও তাহাই। যে জাতির লোকেরা আত্মনিষ্ঠ নহে তাহারা মানুষই নহে। ভারতের সে অজ্ঞতা যে চলিয়া যাইতেছে, ভারতবাসীরা যে আত্মজ্ঞান ফিরিয়া পাইতেছে তাহা দেখে না এমন অন্ধ কেহ আছে কি? এই আত্মজ্ঞান দ্বারা ভারত কি করিবে, তাহা অন্য কথা। আত্মজ্ঞান, শ্রেণীগত জ্ঞান, সাম্প্রদায়িক জ্ঞান, জাতীয় জ্ঞান, মানবীয় জ্ঞান ও বিশ্বাত্মিক জ্ঞান—এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞান আছে। বেদান্ত শেষোক্ত দুই প্রকার জ্ঞানালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। পরের দ্বারা আক্রান্ত হইলে এবং সংঘর্ষ চলিতে থাকিলে শ্রেণীগত এবং সাম্প্রদায়িক জ্ঞান বিকাশলাভ করিতে থাকে। ভারতের

প্রাণ সাড়া দিয়াছে। প্রথমতঃ যখন তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গড়িবার আয়োজন হয় তখন তাহাতে সে সায় দিয়াছিল, এইক্ষণ বাধা দিতেছে, বাধা দেওয়াই আত্মার স্বভাব। বস্তুর পরামাণু যতক্ষণ সুদৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করে এবং বিরুদ্ধ শক্তিকে বাধা দেয় ততক্ষণ তাহা বস্তুরূপে বিদ্যমান থাকে, যখন বাধা দেয় না, তখন তাহার নিজত্ব বিলুপ্ত হয়, তখন তাহা ছিন্নভিন্ন ও ধ্বংস হইয়া যায়।

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'সাধনার বিজয়' কথার অর্থ কি? আমার মনে হয়, এইরূপ লোকের স্বাভাবিক জ্ঞানই অপহৃত হইয়াছে। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর বলিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ আধিপত্যের লক্ষ্য ভারতের উপর এমন একটা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করা যাহা ভারতের নহে; বস্তুতঃ এই নূতন সভ্যতা যদি প্রবল হয় তবে ভারতের সভ্যতা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।"—তিনি ভারতবাসীর প্রতি যথার্থ সহানুভূতির ভাব হইতেই এই কথাটা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মতে ইহা সহানুভূতির বিষয় নহে। যাহারা নিজকে রক্ষার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে না, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন বৃথা, বরং তাহারা ঘৃণারই যোগ্য।

জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থে যে যুগের বিরুদ্ধ সমালোচনার কথা বলা হইয়াছে সে যুগ অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ অতঃপর আর কেহ ভারতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবেন না। সে আশা নিষ্ফল। বিরুদ্ধভাব এখনও আছে, যতদিন সাধনার সংঘর্ষ চলিবে ততদিন থাকিবে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনায় সাধনার সংঘর্ষ দেখা যায়। সরলভাবে তাহা স্বীকার করাই ভাল। সংঘর্ষ নাই বলা কপটতা। যাহাই বলুন, প্রকৃত ব্যাপার এখন সকলেরই নিকট সুব্যক্ত। ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই, 'ভারতের অমুক ব্যক্তি, বা অমুক শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধী।'—ইহার তাৎপর্য্য কি এই নহে যে প্রাচ্যের উপর

পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার আছে, প্রাচ্যের তাহাতে বাধা দেওয়া অন্যায় ? পাশ্চাত্য সভ্যতা যে প্রাচ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ, এবং তদ্দ্বারা ভারতে ধর্ম্মবিভ্রাট ঘটিয়াছে। সম্প্রতি তাহার ফলে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাহারো পক্ষে ভীতিপ্রদ এবং কাহারো পক্ষে সুপ্রভাতের শিশিরবিন্দুর মতন আনন্দদায়ক। তাই বলিতেছি, বিভিন্ন সাধনার মধ্যে সংঘর্ষ নাই, বা ভারতীয় সাধনার উপর অন্যের আক্রমণের পালা ফুরাইয়াছে মনে করা ভ্রমাত্মক। আজও আছে, অবিরাম চলিবে। কারণ, জগদ্ব্যাপী এক বিপুল ঘাত প্রতিঘাত এবং জয় পরাজয়ের ব্যাপার চলিতেই আছে। সার ফিজ জেমস্ ষ্টীফেন বলিয়াছিলেন,—"ব্রিটিশ জাতি ধীশক্তিসম্পন্ন সভ্যতার প্রতিনিধি, প্রাচ্যকে বুদ্ধি কৌশলে পরাজিত করাই তাহার সহিত মীমাংসার একমাত্র উপায়।"—ঠিক কথা ; যাহাদের এইটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি নাই, তাহারা বুদ্ধিমানদের দ্বারা পরাজিত হওয়াই উচিত।

অতীতের ন্যায় ভারতের নিন্দাচর্চ্চা এখনও চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ণেল হল্‌ডিচ্ লিখিয়াছিলেন,—"জগতের ধর্ম্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত।" রেভারেণ্ড ই, বি, মেয়ার লিষ্টার নগরের এক বক্তৃতায় (১৯২০ ইং ১৬ই মার্চ্চ) আধুনিক পাশ্চাত্য নৈতিক চরিত্রহীনতার বিষয় বলিতে গিয়া বলেন,—"এমন যে ঘৃণিত হিন্দু তাহাদের অপেক্ষাও আমাদের অধিকাংশ লোকের ধর্ম্মভাব কম।"—ইহা পড়িয়া আর্জ্জেণ্টাইনে হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধতাসম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে তাহা মনে পড়িল। উহাতে হিন্দুদেরে অন্ধ বধির বাতব্যাধিগ্রস্ত সংক্রমাক রোগী ইত্যাদির পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবাসীর দেখিতে হইবে যে তাঁহাদের ভিতর প্রকৃত দোষ কিছু আছে কি না এবং যদি থাকে তাহা কি, যাহার জন্য জগৎ তাঁহাদিগকে এত অবজ্ঞা করে ; এবং অনতিবিলম্বে সেই দোষ ক্ষালন

করিয়া সকলের নিকট সম্মানভাজন হওয়ার জন্যই তাঁহাদের যত্নপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অপর সমস্ত লোক অপেক্ষা কর্ম্মবাদী হিন্দুরাই ভাল জানেন যে, যে যাহা পাওয়ার যোগ্য সে তাহাই পাইয়া থাকে। হিন্দুর প্রতি একটি অবজ্ঞার কারণ আমি দেখিতে পাই তাঁহাদের মধ্যে যে ভাবের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী বিভাগ আছে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে তেমন নাই। সেখানে সকলেই সমজাতীয়। হিন্দুদের জাতিভেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ইদানীং অনেকেই ভুল করেন। ভারতের উচ্চ শ্রেণীর শক্তিশালী লোকদেরই কর্ত্তব্য সেই ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া। তাঁহারা যে 'কুচপরোয়া নেহী' ভাবে চলিতেছেন তাহাই তাঁহাদের মারাত্মক দোষ হইতেছে। আরো যে যে কারণ আছে এস্থলে তৎসমস্ত বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্লিমাউথের ক্যাথলিক বিশপ 'প্রাচ্যের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহকে' অর্থহীন কিচিমিচি বলিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি কিছু না জানিয়াই যে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি ও তাঁহার ন্যায় প্রাচ্য ধর্ম্মসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেরা যেসমস্ত অনুবাদ পড়িয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই সব অনুবাদ বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য ও অর্থহীন। শুধু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নহে, ১৯১৯ ইংরেজী সনের ৭ই নবেম্বর লণ্ডনের "ডেইলি টেলিগ্রাফ" পত্র লিখেন, খৃশ্চানী ব্যতীত জগতে কোন সভ্যতা আছে বলিয়া জানা নাই। অর্থাৎ যাহারা খৃশ্চান নহে তাহারা সকলেই অসভ্য। ঐ সময়ে কার্ডিনেল বোরণ ওয়াটফোর্ডের বক্তৃতায় বলেন—'যেসব জাতির ভিতর খৃশ্চানী প্রবেশ করে নাই সেই সমস্ত জাতির মধ্যে সভ্যতাই ছিল না, কেবল খৃশ্চান সভ্যজাতিসমূহ হইতে কিছু কিছু পাইয়াছে মাত্র।" গত বৎসর (১৯২১) "ইণ্ডো-পর্টুগীজ রিভিউ" নামক পত্রিকার কয়েক সংখ্যা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ আমার ভ্রম দুরী-করণের উদ্দেশ্যে। তাহার মূল প্রবন্ধে 'মায়াবাদ' ও 'কর্ম্মবাদের' নিন্দা

করতঃ ভারতের জন্য বহু শোকাশ্রু বর্ষণ করা হইয়াছে। 'মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ'ই ভারতবাসীর স্বদেশ-প্রেমকে টিপিয়া মারিয়াছে, ভারতীয়দের জাতীয়তা বিনষ্ট করিয়াছে, উন্নতির চেষ্টা ছাড়িয়া ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার জন্য চেষ্টা করে,—ইত্যাদি ইত্যাদি।'—ভারতবাসীর ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও সৌভাগ্যের কথা! এই ভাবের কথা ত বরাবরই শুনা যায়, কিন্তু এই রিভিউ হইতে সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম যে 'মায়াবাদই' ভারতবাসীকে আধুনিক অসহযোগ নীতি শিক্ষা দিয়াছে!' হায় রে, মায়া বেচারী যে একেবারে ধোপার গাধা হইয়া গেল! ইণ্ডোপর্টুগীজ বা অন্যেরা যদি ভারতীয়দের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তবে তজ্জন্য কৃতজ্ঞ ভারতবাসীরা উঁহাদেরে ধন্যবাদ দিবে, কিন্তু এইরূপ অকারণ অশ্রুপাত করিলে উঁহাদের জন্য তাহাদের কৃপারই উদ্রেক্‌ হইবে। যাঁহারা ঐরূপ মতাবলম্বী তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতাকে দূর করিয়া তৎস্থলে নিজের সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিবেন। তজ্জন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। ভারতীয়েরা যদি পরকে অনুকরণ করিয়া পরের মত হইয়া যায়, অন্যকে দোষ দিব কেন? কিন্তু বিজেতা যখন বলেন যে বিজয়ের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই তবে তাহাকে কপটতা বই আর কি বলা যায়? যাঁহারা আমাদের মনে ঐরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে চাহেন তাঁহারাই বলেন যে কতিপয় ভারতবাসী ইউরোপীয় সভ্যতার বিরোধ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের উপর আক্রমণ না করিলে এবং ভারতের প্রাচীন রীতিনীতি বিনষ্ট না করিলে কেন তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাধা দিবে? ইউরোপীয়েরাই বা কেন ভারতীয়দের ঐরূপ বাধাদানে আপত্তি করেন যদি ভারতীয় সভ্যতার অপবাদ তাঁহাদের লক্ষ্য না হয়? যেমন অন্যান্য বিষয়ে তেমন ইহাতেও সততাই মুখ্য প্রয়োজন।

✓ কাহারো কার্য্যে দোষারোপ করা যায় না কখন ? যখন তাহা সরলতা ও যুক্তির সহিত করা হয়। ফিজি দ্বীপের ভুতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড ষ্ট্যান্‌মোর খৃশ্চানদের গোঁড়ামির অত্যাচার সম্বন্ধে এংলিকান মিশনারী কন্‌ফারেন্সের ১৮৯৪ ইংরেজী সনের অধিবেশনে যে "পাশ্চাত্য রীতির অবৈধ প্রবর্ত্তন" শীর্ষক (Undue Introduction of Western ways) যে বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"আমি পল্লীপরিদর্শনের জন্য গিয়া তাহাদের অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ দেখিয়াছিলাম। তাহারা তাহাদের জাতীয় পোষাক পরিলে, লম্বা চুল রাখিলে, ফুলের মালা গলায় দিলে, কুস্তি বা বল খেলিলে, দেশীয় ধরণে গৃহ তৈয়ার করিলে, সার্ট ও পেণ্টালুন না পরিলে তাহাদের জরিমানা ও কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। কোন কোন অঞ্চলে কোট এবং জুতা না পরিলেও দণ্ড হইত। রবিবারে স্নান দণ্ডনীয় ছিল। তজ্জন্য বেতমারা হইত। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি রবিবারে স্নান করার দরুণ স্ত্রীলোকদেরও বেতমারা হইয়াছিল।"—আর আমি মিশনারীরা কি ভাবে ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করেন তাহার একটা কল্পিত দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম বলিয়া সমালোচক মহাশয় তাহাই আপত্তিজনক মনে করিয়াছেন।

রোমান ক্যাথলিকেরা যে দেশের যেমন ভাব ও প্রথা তদনুসারে চলিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা এসিয়া ও আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের ভক্তি আকর্ষণের জন্য যীশু-জননীর মূর্ত্তি কালরঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিনপঞ্জীতে প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং তন্নিম্নে মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"তদ্দ্বারা যীশু-জননীর সেবকেরা নিগ্রোদের প্রাণে আশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন যে তাহাদেরও তিনি মাতৃস্বরূপিণী। তাঁহার কোলে আশ্রয় লইলে তাহারাও পরিত্রাণ পাইবে।" রোমান ক্যাথলিকেরা অনেক বিষয়ে হিন্দুদের ন্যায়

আচরণ করেন বলিয়া প্রোটেষ্টাণ্টেরা তাঁহাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা, ভণ্ডামি ও ব্যাভিচার বলেন। তবে ইদানীং এইভাব অনেকটা সংশোধিত হইয়াছে। ভারতের এংলিকান বিশপেরা তাঁহাদের এক উপদেশপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "খৃশ্চানদের এমন ভাবে চলা উচিত যাহাতে অখৃশ্চানেরা তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের ভিতর যীশুর প্রেম ও যুক্তিমূলক ভাব উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হয়।" ইহাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ সৎভাব তাঁহারা যদি অবস্থাগতিকে বাধ্য হওয়ার পূর্ব্বে অন্তরে স্থান দিতেন, অন্ততঃ বাক্যে প্রকাশ করিতেন তবে অধিক সন্তোষজনক হইত। মিশনারীরা সময়ে সময়ে যে ব্যবসায়ী ও শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি সমুচিত ব্যবহার আদায়ের চেষ্টা করেন তাহাও সত্য। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্যার্থ তেমন করিতে তাঁহারা যে বাধ্য। তাঁহাদের একজন সম্প্রতি বলিয়াছেন,—"ভগবানের রাজ্য আর ব্রিটিশ প্রভুত্ব যে এক বস্তু নহে তাহা স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়াই ভাল।" যেসমস্ত লোকের ব্যবহারের ফলে এই কঠোর সত্য প্রকাশিত হইয়াছে উঁহাদের কথা মনে হইলে অন্তরে ক্ষোভ জন্মে। অবশ্য স্বীকার করিব, ইদানীং পাশ্চাত্য বিজ্ঞ লোকদের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, বেলজিয়ামের গ্রন্থকার মেইটারলিঙ্ক তাঁহার সুবিখ্যাত "পার্ব্বত্যপথ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "প্রকৃতির বিভীষিকা দেখিয়া অবশেষে ভারতের পবিত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহেরই আশ্রয় লইতে হইল। সেই সমস্ত গ্রন্থে বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশদভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। অতি পুরাকালে যেই মহোচ্চ সত্যসমূহ প্রকাশিত হয় তৎসমস্ত উহাতেই আছে। ইউরোপের চিন্তা-শক্তি কখনো তাহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দুর কর্ম্মবাদেই জীবনের যাবতীয় অবিচারের সুমীমাংসা রহিয়াছে।" অধ্যাপক

মেকেঞ্জি ভারতীয় ধর্ম্ম এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মই দার্শনিক তত্ত্বানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে ব্যবস্থিত ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়।"

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞলোকদের শ্রদ্ধা যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা দেখাইতে পারিতেছি বলিয়াই আমি আনন্দিত। কারণ, অনেক অজ্ঞতাপূর্ণ অবিচারমূলক সমালোচনার ফলে যে ভারতবাসীর অন্তরে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে এতদ্দ্বারা তাহার উপশম হইবে। ঐ সমস্ত উক্তি ভাল বা মন্দ বলিয়া যে উদ্ধৃত করিয়াছি এমন নহে, দেখাইতে চাই, কোথায় কিরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কে কিরূপ মত পোষণ করিতেছেন। কোন বৈদেশিক ভারতে আসিয়া ভারতীয় সভ্যতার গুরুত্ব স্বীকার করিলেই যে তাহার গুরুত্ব প্রমাণিত হইবে এমন নহে, বুঝিতে হইবে তাহার গুরুত্ব আছে বলিয়াই তিনি তাহা স্বীকার করিতেছেন। বুঝা যাইবে, তাঁহারও তাহা উপলব্ধি করিবার উপযোগী বুদ্ধি বিচক্ষণতা আছে। আমি অন্যত্র যেমন বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি, ভারতের বিরুদ্ধে যেসমস্ত উক্তি করা হয় সেগুলির উত্তর না দেওয়া সঙ্গত নহে। 'ভারতের স্থান অতি উচ্চে, অতএব ঐরূপ নিন্দুকদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই',—এইরূপ অবজ্ঞা বা অবহেলা কোনটাই ভাল নহে।

সর্ব্বাগ্রে চাই সততা এবং সরল সত্যনিষ্ঠা। প্রকাশ্য শত্রুও ভাল। তেমন শত্রুকেও সম্মান করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যাহারা অন্তরে বিরুদ্ধ অথচ বাহিরে কপট সহানুভূতি দেখাইয়া বন্ধুত্বের ভান করে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। 'সহানুভূতি' শব্দ অতি মহৎ,—জগদাত্মার সহিত পরের জন্য অনুভূতি আরো মহৎ, কিন্তু যাঁহারা ঐ শব্দ প্রয়োগ করেন তাঁহাদের দুর্ব্ব্যবহারের ফলে উহার মাহাত্ম্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সহানুভূতি দেখাইবার ভান করিয়া উঁহারা নিজেদের আন্তরিক ভাব ও কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই মনোহর সহানুভূতি শব্দের কথা পড়িলে বা শুনিলে সতর্ক থাকিতে হয়। হিন্দুদের এতৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছেন,—"হিন্দুরা শান্তিপ্রিয় নিরীহলোক, তাহারা যেমন অন্যকে আঘাত দিতে জানে না, তেমনই নিজকেও রক্ষা করিতে জানে না।"— এমন কতকগুলি লোক আছে তাহাদের চোখের সাম্নে কি তাহাও দেখাইয়া দিতে হয়। যাহা হউক, ভারতীয় সাধনার উপর আক্রমণের ফলে ভারতবাসীরা বুঝিয়াছে, ভবিষ্যতে আরও বুঝিবে, যে তাহার সংরক্ষণ ও তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। কালিদাস বলিয়াছেন,—

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে
প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ।

আগুণকে নাড়াচাড়া দিলেই তাহার শিখা জ্বলিয়া উঠে, সর্পকে ঘা দিলেই ফণা তোলে, তেমনই মানুষ ক্ষুভিত হইয়া কর্ম্মরত হইলেই স্বীয় মহত্ত্বলাভ করে।

জীবন বরাবরই সংগ্রামময়। যাঁহারা জগৎ-শান্তির কথা বলেন তাঁহারা সুখে স্বপ্ন দেখেন। যেরূপেই হউক অদূর ভবিষ্যতে ভারতের উপর দুঃসময় আসিবে। ভারত জাঁতার মধ্যে নিষ্পেষিত হইবে। তাই, যাঁহারা স্পষ্টবাক্যে এবং ব্যবহারে আমাদিগকে আত্মরক্ষার্থ উদ্বোধিত করেন তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। জর্জ টাইরেল বলিয়াছেন,—"আমি ভাবিতেছি. আত্মস্থ না থাকাই একমাত্র পাপ।" বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতেই ঘোষিত হইয়াছে যে সংঘর্ষে সত্য বিনষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য দেশেও সত্যকে আলোক বলা হয়, তাহাকে যতই নাড়াচাড়া দিবে ততই

অধিকতর জ্বলিয়া উঠিবে। তাই বলি, ভারত-সভ্যতার মহান্ কল্পবৃক্ষকে নাড়াচাড়া দিতে দাও, তাহার শুষ্ক বল্কল বা তদুপরি উৎপন্ন পরগাছাগুলি ঝরিয়া গেলে কোন ক্ষতি নাই ; অবশ্য মূল বৃক্ষকে সুদৃঢ় রাখিতে হইবে। যে মূল বীজ ভারতসভ্যতার উৎপাদক এখনও যদি তাহা শক্তি-সম্পন্ন থাকে এবং তদ্রূপ নূতন বৃক্ষ জন্মাইতে পারে তবে তাহাই যথেষ্ট।

কার্য্যতঃ গুরুতর বাধা এই যে কোন সভ্যতার আত্মাকে বিনষ্ট না করিয়া তাহার দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধন দুষ্কর। কিন্তু এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন সমাধান করিবার জন্য চাই শক্তিসম্পন্ন লোকের চরিত্রবল ; অথবা বলা যায় তেমন লোকের জীবনই তাহা করিবে। সিগ্‌নোর ভিগলিওয়ান ইটালীর আল্‌গেরটী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'তিনি এমন যুগের লোক ছিলেন যখন আল্‌পস্ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ লোকের অনুকরণ করা কেবল ফ্যাসন ছিল না, প্রয়োজনও ছিল। কারণ তাঁহাদের চিন্তাধারা ও আচরণ শিক্ষা করিয়া আমাদের জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল লক্ষ্য। অবলম্বিত উপায় যাহাই হউক, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুন্দররূপেই ব্যক্ত করা হইয়াছে ; অর্থাৎ তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, যে কোনরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা।'

কেহ মনে করিবেন না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কেল এক দিকের প্রভাবই বিস্তৃত হইতেছে। অসওয়াল্ড স্পেন্‌গ্লার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"এইক্ষণ ইউরোপের বহু লোক এসিয়ার বহুলোক অপেক্ষা এসিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছেন। ভারতের বহুলোক পাশ্চাত্য প্রভাবে আত্মহারা হইয়াছে, অথচ ইউরোপের বুদ্ধিমান চিন্তাশীল লোকেরা ভারতের প্রভাবে নিজকে সংশোধিত করিতেছেন।" এই সন্ধিক্ষণে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত অন্যেরা ভারতের জ্ঞানগবেষণার বাণী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হন সেই পর্য্যন্ত নিজকে সুদৃঢ় করা ও আত্মনিষ্ঠ থাকা।

তাহা হইলে পাশ্চাত্য দেশ বর্ত্তমান উন্মার্গগামিতার পূর্ব্বে যেসমস্ত নীতি অনুসারে চলিত, যাহা প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয়েই মান্য করিত সেই সমস্ত নীতি অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু মূল কথা, যে বাণী স্বাধীন চিন্তাশীল সম্মানার্হ ব্যক্তি দিবেন না তাহা কে শুনিবে ?

কলিকাতা
১লা জুলাই, ১৯২২। } জন উড্রফ।

পরিশিষ্ট (৩)

১৯২০ সনে মালদহের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, জেমিসন আই সি এস সারজন উড্রফের "Is India Civilized" গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রচারিত হওয়ার পর যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সার জন উড্রফ ১৯১৮ সনের নবেম্বর মাসে ইহা প্রচার করেন। ইহার প্রবন্ধসমূহে তিনি ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ লক্ষণসমূহ আলোচনা করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অধিকার আছে বলিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। এজন্য অল্পদিন মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া যায় এবং ১৯১৯ সনের মে মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত হয়। অতএব ভারতবাসীর মধ্যে যে গ্রন্থের এত অধিক সমাদর তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের প্রকৃতিসম্বন্ধে আলোচনা করা অলাভজনক নহে। মিঃ উইলিয়ম আর্চ্চার "ভারত এবং ভবিষ্যৎ" ("India and the Future)" গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন তৎখণ্ডনের জন্য সার জন এই গ্রন্থ লিখিলেও ইহাতে আরো অনেক বিষয় আছে। গ্রন্থকার যাহাকে ভারতীয় বিশেষত্বের মূল উপাদন বলিয়া বিশ্বাস করেন তিনি তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা উচিত যে আমি মিঃ আর্চ্চারকে সমর্থন করিবার জন্য অগ্রসর হই নাই। কারণ, ভারত-সম্বন্ধে যেসমস্ত পাশ্চাত্য লেখক সামান্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া ইহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে লিখিতে যান তাঁহারা উৎকট দাম্ভিকতা ও রূঢ়তা প্রকাশ করেন ; মিঃ আর্চ্চারও সেই দোষে আক্রান্ত।

সার জনের গ্রন্থের উদ্দেশ্য, স্থূলভাবে ও বিশুদ্ধরূপে ভারতীয় সভ্যতার নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করা। বিশুদ্ধিতাই ইহার বিশেষত্ব বলা হইয়াছে। তিনি বলেন,—মিঃ আর্চ্চার ঐ সমস্ত নীতির মূল তত্ত্বসম্বন্ধে বিকৃত ধারণার উপরই তাঁহার আলোচনার ভিত্তি করিয়াছেন, সত্যের আলোকে ধরিলে তাহাদের আর কোন মূল্য থাকে না। এতদতিরিক্ত আরো একটা উদ্দেশ্য তাঁহার রহিয়াছে। তাহা এই—ভারতীয় সভ্যতার উপর পাশ্চাত্যবাসীর ক্রমাগত আক্রমণের সাধারণ কারণ ব্যক্ত করা। ইহাতেই তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা ত্রিবিধ—জাতি, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধীয় স্বার্থ। এই স্বার্থসংঘর্ষের কারণ প্রদর্শনের জন্য তিনি বিশ্বসৃষ্টির মূল-তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে পরমাত্মাই একমাত্র চরম সত্য, এই জগৎ তাঁহারই প্রচেষ্টার ফল। জগৎকে সুবিন্যস্ত করিতে গিয়া তিনি তাহার সহিত জড়িত হইয়াছেন, আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরের ভিতর দিয়া নিজকে সমস্ত বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত করিতেছেন। এই কার্য্যক্রমের নিম্ন স্তরে সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং তাহা মঙ্গলজনকও বটে; কারণ তাহাতেই পরমাত্মা অধিকতর পূর্ণরূপে প্রকটিত হইতে থাকেন; শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা নিকৃষ্টকে বিতাড়িত করে; পরস্পরের প্রতিযোগিতা অবশেষে সহযোগিতায় পরিণত হয়। স্থূল কথা,—ব্যক্তিগত ভাবেই হউক আর জাতিগত ভাবেই হউক এই সংঘর্ষ আত্মবিকাশেরই জন্য। অনেকেই জানে না কেন তাহারা তেমন করিতেছে। তাহারা যে ক্রমবিকাশশীল পরমাত্মার বাহকরূপেই তেমন করিতেছে তাহাও অবগত নহে, তথাপি তাহার মঙ্গলজনক প্রকৃতির ব্যত্যয় ঘটে না; কারণ পরমাত্মা তাঁহার অজ্ঞ ও পরস্পরবিরোধী প্রতিনিধিদের দ্বারাও স্বকীয় মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। মানুষের ক্রমোন্নতির ফলে এই উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিলে সহযোগিতার চরম আদর্শানুসারে চলিতে পারে। কিন্তু

এখনও সেরূপ উচ্চ স্তরে উঠে নাই, এজন্য সে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ-পরতাকে নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার আবরণে আবৃত করিয়া দেখায়। যখন শক্তিশালী জাতি দুর্ব্বল জাতির সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করে তখন সে ভান করে যে শাসক জাতির উচ্চ সভ্যতার স্তরে শাসিত জাতিকে উত্তোলিত করার একান্ত কর্ত্তব্যবোধে বাধ্য হইয়াই তেমন করিতেছে। সার জন ইহাকে ঘৃণিত কপটতা বলেন, এবং মিঃ আর্চ্চার ও অন্যান্য যাঁহারা তেমনভাবে ভারতীয় সভ্যতাকে আক্রমণ করেন তাঁহাদের উপরও ঐরূপ কপটাচরণের অভিযোগ করেন। ঐরূপ কপটতাই ভারতীয় সভ্যতাকে হেয় প্রতিপন্ন করতঃ তাহার নিন্দাচর্চ্চা করিতে তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করে, কারণ ভারতের সভ্যতা একেবারে অকর্ম্মণ্য এবং মূলতঃ তাহা এত কদর্য্য যে উন্নতিশীল জগতে তাহার স্থান হইতে পারে না,—এইরূপ দেখাইতে পারিলেই তাহাকে নির্মূল করিবার প্রচেষ্টা সমর্থন করা যায়। সার জন উড্রফের মতে এই সমস্ত সমালোচকদের এইরূপ কপটাচরণের প্রকৃত কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা, পাছে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে এবং তাহার ভিত্তিমূল দৃঢ় করিবার ও তাহার গুরুত্ব প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে তাঁহাদের নিজ সভ্যতা ডুবিয়া যাইবে বা নগণ্য হইবে। ইহা শুধু মানসী-শক্তি, কলাশিল্প বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি মিঃ আর্চ্চারকে সমর্থন করি না, কিন্তু ইউরোপীয় মিশনারীদের সম্বন্ধে 'গ্রন্থকার যেসমস্ত উক্তি করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে নীরব থাকা কর্ত্তব্য নহে। সার জন বলিতে চাহেন যে মিশনারীরা ইউরোপের বৈষয়িক ব্যবস্থার সহিত খৃশ্চানধর্ম্মকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিবার জন্য যে সংগ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছে মিশনারীরা উহারই অংশবিশেষ। মিশনারীরা নিজেদের ধর্ম্মের প্রকৃত

মর্ম্ম কি সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া ইউরোপায় সভ্যতার যাহা কিছু তাহাই ভারতের উপর চাপাইবার জন্য ব্যাকুল। তিনি বলেন,—তাহার কারণ, উঁহাদের ভয়, শুধু খৃশ্চানধর্ম্মের মূল নীতিসমূহ যদি ভারতবাসীর সম্মুখে ধরা হয় এবং ভারতীয়েরা তাহাদের ভাবানুসারে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করে তবে উহা ভারতে ইউরোপায় প্রাধান্য রক্ষার সহায় হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় মিঃ আর্চ্চার যেরূপ ভ্রান্তি জন্মাইয়াছেন বলিয়া সার জন বলেন, তিনিও সেই দোষে আক্রান্ত হইয়াছেন।

এইরূপে ভূমিকা করিয়া মিঃ জেমিসন সার জন উড্রফের দোষ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমতঃ—লিখিয়াছেন, সার জন কলাবিদ্যা সম্বন্ধে মিঃ আর্চ্চারের মত খণ্ডনের চেষ্টা করিলে ভাল হইত; তাহা হইলে দেখা যাইত তিনি কিরূপ নীতি অবলম্বন করেন।

'দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের কথা। সার জন লিখিয়াছেন, 'ধর্ম্মই সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাদান।' আমরাও তাহাই যথার্থ মনে করি। ধর্ম্ম বলিতে কেবল মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় বিষয় নহে, কার্য্যতঃ তৎসমস্তের ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাও দেখিতে হইবে। মানুষ বিশ্বরাজ্যে তাহার অবস্থিতি ও উদ্দেশ্য যেভাবে গ্রহণ করে তাহার উপরই সভ্যতার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ভর করে, কারণ তদনুসারেই তাহার কর্ম্মপদ্ধতি রচিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ অপেক্ষা যেই যুগে মানব-জীবনের বাহিক্ দৃশ্যে মানুষের অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সেই যুগে সার জন উড্রফ যে তাঁহার মূল নীতির বিষয় দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি বা না করি তিনি যে বিশদভাবে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

ইহার পর সভ্যতার যে সংজ্ঞা সার জন নির্দ্দেশ করিয়াছেন মিঃ

জেমিসন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—সভ্যতা কি সার জন তাহা বেশ সুন্দরভাবেই দেখাইয়াছেন। তৎপর লিখিয়াছেন,—ধর্ম্মের সত্যতার উপরই সমস্ত নির্ভর করে, অর্থাৎ সত্য ধর্ম্মই যখন পরমাত্মাকে বিকাশ করিতে সমর্থ তখন যাহা সত্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে আত্মার বিকাশের জন্য ব্যবস্থিত নহে তাহা প্রকৃত সভ্যতা হইতে পারে না। ধর্ম্মের সংজ্ঞা সার জন যাহা দিয়াছেন তাহা এই :—"ধর্ম্মের মূল তত্ত্বানুসারে এই জগৎ বিধি-নির্দ্দিষ্ট সংসার, প্রত্যেক মানুষ তাহার অংশবিশেষ এবং প্রত্যেক মানুষের সহিত তাহার নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে,—এই স্বীকৃতি এবং সমগ্র বিশ্বের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কর্ম্ম করার নামই ধর্ম্ম।" অতি সংক্ষেপে বলিতে গিয়া তিনি ইহাকে সংশয়াত্মক করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে এই সংজ্ঞার দ্বারা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকদিগকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের মতকেও এক প্রকার ধর্ম্মমত বলা যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নিজেদের আবিষ্কৃত তত্ত্বকে ধর্ম্ম বলেন না, দার্শনিক তত্ত্ব বলেন, তাঁহাদিগকে অধ্যাত্মবাদীদের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লাভ কি ?

সার জন উড্রফ ভারতীয় ধর্ম্মের কথা বলেন। 'ভারতীয় ধর্ম্ম' কথাটা অমূলক। কারণ ভারতে অসংখ্য প্রকারের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠান আছে, তাহাতেই ভারতীয়দের ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃতি অবগত হওয়া যায়। আচার্য্যদের মধ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর অদ্বৈতমতাবলম্বী, অপর সকলেই ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন। বাহ্যিক আচারানুষ্ঠানের বিভিন্নতার মূল ঐক্য এবং তৎসমস্তের অভ্যন্তরে একত্ব রহিয়াছে বলিলেও তাঁহার স্বীকার করিতে হইবে, ঐ সমস্ত মূল ধারণাতেও পার্থক্য আছে,—যেমন পরমাত্মা ও জীবাত্মা কি এক না ভিন্ন, এতৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি এই সমস্ত পার্থক্যকে খুব নগণ্য মনে করেন। শাক্তমতই তাঁহার ভিত্তি।

তাঁহার বিশ্বাস জগৎ এবং পরমাত্মার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী ভাব আছে শাক্তমতই তাহার আশ্চর্য্যরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছে।

৩। সার্ জন উড্রফের অভিমত বেদান্তের শাস্ত্রীয় মতের অনুবর্ত্তিগণ গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ আছে।

৪। তান্ত্রিকধর্ম্মের প্রতি লোক শ্রদ্ধাবান নহে; শুধু ইউরোপীয় নহে, ভারতীয় হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখাকারগণের গ্রন্থাদি পড়িয়াও জানিতে পারা যায় যে তান্ত্রিক প্রথার প্রতি লোক শ্রদ্ধাবান নহে এবং তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদবিহিত বলিয়া বলা হয় তাহাও সন্দেহজনক। সার জনের তন্ত্রতত্ত্ব পড়িয়াও সে ধারণার ব্যত্যয় হয় না। এইমাত্র একটা ভাব মনে স্থান পাইতে পারে যে হিন্দুধর্ম্মের যাবদীয় সুবিজ্ঞ ও সুবিখ্যাত ব্যাখাকারগণ যেই মতাবলম্বীই হউন তাঁহারা সকলেই এযাবৎ ধারাবাহিকরূপে তন্ত্রশাস্ত্রকে বুঝিতে ভুল করিয়াছেন ও অবজ্ঞা করিয়াছেন, সার জন উড্রফই তাহাকে তাচ্ছীল্যের কবল হইতে উদ্ধার করত তাহাই বিশুদ্ধ বেদান্তমতের পথপ্রদর্শক বলিয়া তাহার গুরুত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উত্তর এই হইবে যে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত না হইয়া ভ্রান্তধারণাবশতঃ কতিপয় তন্ত্রমতাবলম্বী বিকৃত প্রথা অবলম্বন করায় তাহার দুর্ণাম রটিয়াছে; নিরপেক্ষভাবে তন্ত্র-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিধিপূর্ব্বক তৎপ্রদর্শিত বিধিবিধান পালন করিলে তৎসম্বন্ধীয় কুসংস্কার দূরীভূত হইবে। তাঁহার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেও সন্দেহের বিষয় এই যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার সমস্ত নেতৃগণ যেই প্রথার এত কদর্থ করিয়া আসিতেছেন সেই প্রথাকে ভারতের বিশিষ্ট ধর্ম্মমত বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না।

৫। তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত:—এই বিশ্ব মহাশক্তিরই অভিব্যক্তি; পরম শিবেরই প্রকাশমান অবস্থা। শিব ও শক্তি এক, বিভিন্নরূপে অবস্থিত। একটা সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছেন্ত, অন্যটি তদন্তরস্থ। আত্মা বিষয়ের

সহিত জড়াইয়া পড়েন, আবার তাহা হইতে স্বয়ংই ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া যান ; যদিও নিজে আনন্দময়, তথাপি মনুষ্যরূপে সুখদুঃখ ভোগ করেন। মানুষই আত্মা, মন ও দেহরূপে ভগবৎশক্তিবিশিষ্ট। কারণ, এই সমস্ত মহাশক্তির বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঈশ্বর বা শিবের অনুসন্ধান করিবার জন্য আকাশের দিকে চাহিবার প্রয়োজন নাই। আত্মারূপী মানুষই ভগবান, দেহ ও মন ভগবানের শক্তিস্বরূপ। মানুষই ভগবান ও তাঁহার শক্তি। জীবনকে যিনি এই ভাবে দেখেন তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যই ধর্ম্ম। মন্দ চিন্তা ও মন্দ কার্য্য মন্দফল আনয়ন করে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই ত্যাগ করিবার নাই। প্রত্যেক বস্তু এবং জীব যখন মাতৃরূপেই প্রতিভাত হয় তখন মানুষ পরিত্যাগ করিবে কি ? বেদান্তমতে দৃশ্যমান সমস্তই মায়া, তাহার সহিত মন এবং দেহপর্য্যন্ত সমস্তই ভগবান এইরূপ মতের সামঞ্জস্য করা অত্যন্ত কষ্টকর।

৬। বিভিন্ন মতবাদের পার্থক্য মীমাংসা আমাদের লক্ষ্য নহে। ভারতীয় ধর্ম্মের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সার জন উড্রফ যেসমস্ত যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করাই আমাদের লক্ষ্য। তজ্জন্য কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যুক্তিতর্ক যথাযথ শাস্ত্রানুযায়ী কি না তাহা দেখার প্রয়োজনও আমাদের নাই। সার জন যেভাবে সমর্থন করিয়াছেন তাহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যাহাই হউক, অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসী তাহা সারবান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্দচিন্তা ও মন্দকর্ম্ম ত্যাগসম্বন্ধে প্রাগুক্ত উপদেশে যে আশঙ্কা আছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়, কারণ তাহা অনায়াসে বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত হইতে পারে ; বিশেষতঃ তাহাতে নৈতিক বাধ্যতা বা উপাস্য শক্তিরও কোনরূপ বাধ্যতা নাই, কেবল অপালনে দুর্ভাগ্য ঘটিতে পারে মাত্র। কার্য্যকালে উপদেশ অবজ্ঞাত হয় বলিয়াই বোধ হয় তান্ত্রিক প্রথা এত আঁধারে পড়িয়া আছে।

৭। সার জন স্বীকার করিয়াছেন যে আদর্শ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের পার্থক্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও আছে; পরন্ত ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক, তৎপর যথার্থ নীতিসমূহ অনুধাবন করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে তাহা কি পরিমাণ বিফল হইয়াছে। তাহা হইলেই তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করত কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই গ্রন্থে তেমন চেষ্টা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আছে, বা আদর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া কি পরিমাণ সফলতালাভ করা গিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তেমন একটি শব্দও নাই। অথচ বিচারার্থ ইহা একান্ত আবশ্যক।

৮। তিনি সভ্যতার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তদনুসারে আত্মার বিকাশের জন্য বিশুদ্ধ কর্ম্মব্যবস্থাই তাহার মূল উপাদান। শুধু ভাবের জন্য নহে। মানবসমাজের অভ্যুন্নতির জন্য কোন্ সভ্যতা কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহার বিচারকালে দোষদুর্ব্বলতাময় মানুষরূপ যন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহা যে ফলপ্রদান করিতেছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দ্রষ্টব্য বিষয়। ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যে প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ বলিয়া মানুষ ধারণা করিতে পারে এবং যাহা সূক্ষ্ম চিন্তার ফল বলিয়া প্রশংসার যোগ্য, তাহা যাহারা গ্রহণ করে তাহাদের জীবনে এবং আচরণে আত্মার বিকাশলাভের যে পরিমাণ উপায় করা হইয়াছে সেই পরিমাণেই তাহার গুরুত্ব। এই মত যদি যথার্থ হয় তবে তান্ত্রিকদের এমন কি সুব্যবস্থা আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তাহা প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য ছিল। অন্ততঃ তন্ত্রের কোন্ গ্রন্থে তেমন ব্যবস্থা আছে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন।

৯। তিনি আর্থার আ্যাভেলন নাম দিয়া তন্ত্রসম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু নব্য হিন্দুনেতৃগণের বিশেষ সম্মানভাজন আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী তন্ত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ কি না তাঁহার কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করেন নাই।

১০। সার জনের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, নিগূঢ় অনুধাবন ব্যতীত তান্ত্রিক প্রথার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কারণ তাহার আচারানুষ্ঠানের বাহ্যিক্ এবং নিগূঢ় অর্থে পার্থক্য অনেক, গূঢ় অর্থ জানিতে না পারিলে তন্ত্রাচারীর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা। যেসমস্ত সাধারণ স্তরের লোকের তেমন নিগূঢ় ভাবে অনুধাবন করার সময় নাই, শক্তিও নাই তাহা-দিগকে উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উত্তোলন করার পক্ষে ইহার উপযোগিতা আছে কি না সন্দেহ। যিনি বলেন,—"সকল মানুষ প্রকৃত মানুষ নহে কেহ মানুষ হইয়াছেন, অবশিষ্ট মনুষ্যত্বলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন" তিনি হয়ত মনে করিতে পারেন যে কয়েকজন বিজ্ঞ লোকের মধ্যে একটা প্রথার উপকারিতা নিবদ্ধ থাকিলে কোন দোষ হইতে পারে না।

১১। যদিও তিনি বলেন যে ভারতীয় ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য দেখিয়া তিনি তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করেন, বস্তুতঃ তিনি ভারতবাসীর কার্য্যপ্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট হন নাই। কর্ম্মবাদের দার্শনিক তত্ত্ব যাহাই হউক ভারতীয়-দের মধ্যে কর্ম্মবাদ তদ্বিপরীত পরিণামই উপস্থিত করিয়াছে। অধিকাংশ ভারতবাসী অদৃষ্টবাদী। শুধু মিঃ আর্চ্চার নহেন, ভারতবাসীর কার্য্য-প্রণালী যাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন তেমন সমস্ত ইউরোপীয়ের ইহাই অভিমত। তাঁহাদের সকলকে অন্ধ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে না।

১২। সার জন বলেন, এইক্ষণ ভারতে প্রধান জাতি মাত্র দুইটি—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র; শূদ্রদের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি

হইয়াছে। তিনি যেন দেখাইতে চাহেন যে বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে বেশী কিছু স্বাতন্ত্র্য নাই। পারিয়ারা অপরিষ্কার বলিয়াই অস্পৃশ্য হইয়াছে বলাও ঠিক নহে। জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তই ভুল। তিনি বলিয়াছেন, আর্য্যশোণিত বিশুদ্ধ রাখিবার জন্যই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি। এই দিনেও যে তিনি বলিতে চাহেন, বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্য সভ্যতা বিশুদ্ধ ছিল, আদিম জাতিদের সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়াছিল না, তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে জাতি-ভেদ প্রথা তত কঠোর ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের পর খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভেই জাতিভেদ প্রথার নিয়মপ্রণালী কঠোর হইতে কঠোরতম হইয়াছে। কিন্তু তিনি যখন বলেন যে আধুনিক দূষিত ও বিমিশ্রিত ভাব নহে, কেবল প্রাচীন হিন্দু ভারতের নীতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য তখন তাঁহার কাছে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ, মুসলমান আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াও যথাযথ বিবরণ জানিবার উপায় নাই। তেমন অবস্থায় বাস্তব ব্যাপারের সহিত সম্পর্কহীন অবিকৃত হিন্দু আদর্শে শাসিত ভারতের চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শন করিতে তেমন কিছু বেগ পাইতে হয় না।

১৩। সার জন নিরপেক্ষ সমালোচক নহেন। তিনি বলিয়াছেন, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। অথচ মিঃ আর্চ্চার ইউরোপীয় সভ্যতাকে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তাহার উত্তর দিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে তুলনা করা তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়াছে। কিন্তু রীতিমত তুলনা না করিবার ফল দাঁড়াইয়াছে যে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি সুবিচার করেন নাই।

১৪। গ্রন্থকার বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্ত আধ্যাত্মিকতাই ভারতের বিশেষ দান। আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা বিশদভাবে বলিলেই ভাল হইত। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এমন বিশ্বাস আছে যে তাহাদের জীবনের ভালমন্দ যাহা কিছু সমস্তই অপার্থিব কোন দৈবশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে; অতএব তাহাদিগকেও অত্যন্ত আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। ভারতকে শুধু আধ্যাত্মিক বলিলে তাহার স্থান কোথায় তাহা বুঝা যায় না। স্বীকারই করিলাম যে তাহার আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বোচ্চ; এখন প্রশ্ন,—তাহাই কি তাহার সভ্যতার প্রধান লক্ষণ? তদ্দ্বারা কি এমন পার্থক্য দেখান যাইতে পারে যে প্রাচ্য আধ্যাত্মিক এবং প্রতীচ্য বৈষয়িক? ইহাও নহে যে ভারতবাসী প্রত্যেকেই বিষয়বাসনা বর্জ্জন করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই নিমগ্ন, বা ইউরোপবাসী সকলেই তদ্বিপরীত। উদ্দেশ্য এবং যে শক্তির দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার প্রাধান্যই দ্রষ্টব্য। এই ভাবে গ্রহণ করিলেও ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক বলার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

১৫। জাতির মনোভাব তাহার নেতৃগণের লেখা ও বক্তৃতাদি দেখিয়াই বিচার করা যায়। এই দিকে ভারতের বর্ত্তমান নেতৃগণ সকলই স্বাস্থ্যোন্নতি, শিল্পোন্নতি, জাতির কার্য্যকরী শক্তিবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাবিস্তার, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ইত্যাদির জন্য দেশের সকলকে যে ভাবে কর্ম্মব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন তাহার সহিত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গতি করা কষ্টকর। সার জন হয় ত বলিবেন ইহা ইউরোপীয় কলুষিত প্রভাবের ফল, ইহা ভারতের আত্মভাবের বিকাশ নহে, অস্থায়ী দুষ্ট ব্রণের মত। ভারত যখন তাহার প্রাচীন জ্ঞান ফিরিয়া পাইবে তখনই ইহা চলিয়া যাইবে। কোন্ মত অধিকতর শুদ্ধ তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমাদের বক্তব্য এই, যে নীতি হিন্দুত্ব এবং ভারতীয় সভ্যতাসম্বন্ধে অবলম্বিত হইয়াছে

খৃশ্চান সভ্যতা সম্বন্ধেও সেই নীতি অবলম্বিত হইলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই দেখা যাইত।

১৬। তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গী এবং 'একমাত্র ভারতবর্ষই ভগবানের অর্চ্চনাত্যাগ করিয়া যুক্তিবাদ ও ব্যবসায়ীর দেবতার নিকট জানু নত করিতে অস্বীকৃত' উক্তির দ্বারা স্বতঃই মনে হয় খৃশ্চানধর্ম্ম ঘোরতর বিষয়াসক্তির প্রশ্রয় দান করে। যে কোন ভাবেই হউক ইহাতে খৃশ্চানধর্ম্মের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।

১৭। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বর্ত্তমান ইউরোপের কেবল বৈষয়িক উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার কি তাহা সমর্থন করে? বিগত ছয় বৎসরের (১৯১৪ হইতে ১৯২০) ঘটনাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট উত্তর। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে ন্যায়ানুগত সুবিচারমূলক আধ্যাত্মিক নীতির সুমর্থন এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন জন্যই ব্রিটনের সহিত সম্মিলিত শক্তিবর্গ স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। জার্ম্মণরাজ্যেও যে খৃশ্চানধর্ম্ম বিফল হইয়াছে এমন নহে, তাহার শাসকেরা বিপথগামী হইয়াছিলেন মাত্র। মিলিত শক্তিবর্গের বিজয়লাভ যে নৈতিক বলেরই পরিচায়ক তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তাহাতে জার্ম্মেণির ভ্রম প্রমাণিত হইয়াছে, এবং পার্থিব শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, খৃশ্চানধর্ম্ম যে তদপেক্ষা অনেক অধিক আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা জন্মাইতে পারে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধাবসানে যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহার দোষ যাহাই থাকুক, তাহাতে শক্তিবর্গের যে অধিকাংশেরই উচ্চ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল তাহা সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ উচ্চ আদর্শ সমর্থনের জন্যই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। খৃশ্চান ইউরোপের জাতীয় আত্মা ইহার বিরুদ্ধশক্তির দ্বারা

কিছুকালের জন্য অন্ধকারাবৃত হইতে পারে, কিন্তু উহা সেই আবরণ দূর করিয়াছে।"

সার জন উড্রফ এবং অন্যান্য যাঁহারা পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্যের উচ্চ অধিকার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা এমনভাবে শাস্ত্রমত উদ্ধৃত করেন যে যেন তৎসমস্ত একমাত্র প্রাচ্যেরই সম্পদ্, খৃশ্চানীতে যেন তাহার স্থান নাই। অথচ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে হিন্দুশাস্ত্রে যেসব উপদেশ আছে, খৃশ্চানশাস্ত্রেও সেই সব আছে। গীতায় যেসব উপদেশ আছে, সেই সব গীতার একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। পরোপকারই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম,—ইহার সহিত খৃশ্চানধর্ম্মীরাও একমত হইবেন, কিন্তু উহা একমাত্র ভারতেরই বিশিষ্ট গৌরব বলিলে যে ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ,—'প্রতিবেশীকে নিজের মত ভাল বাসিবে', সেই ধর্ম্মের প্রতি সুবিচার করা হয় না! আত্মা এবং তাহার ভৌতিক আবরণের মধ্যে আত্মাই মূল এবং প্রধান,—ইহা কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই তত্ত্ব, ইহা বলাও সঙ্গত নহে। ভারতীয় ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব বলিয়া সার জন উড্রফ যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, খৃশ্চানী ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ ত নহেই, সাধারণ একটা অংশের বিশ্লেষণ করিলেও তাহাই পাওয়া যায়।

১৯। সার জন উড্রফ তন্ত্রশাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত থাকার দরুণ সম্ভবতঃ আধুনিক খৃশ্চান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। এগুলি দেখিলে তিনি কখনো বলিতেন না যে খৃশ্চানীমতে ঈশ্বর বিশ্বাতীত কিছু বা ঈশ্বর ইচ্ছামাত্র বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন বা পরিচালন করিতেছেন, পরন্তু তিনি আরো শিক্ষা করিতে পারিতেন যে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অণুত্ব কেবল তন্ত্রের কথা নহে। দৃঢ়তার সহিত বলিব তিনি খৃশ্চানধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্তিজনক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"Is India Civilized ?" সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত।

ডাক্তার সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখিয়াছেন ঃ—অতি চমৎকার গ্রন্থ। সরলভাবে বহু বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। হিন্দুর দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সার জন উড্রফ অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার বিপুল তত্ত্বজ্ঞতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে মানবের উদ্বর্ত্তবাদ সম্বন্ধে হিন্দু দর্শনই সত্য ও বিশুদ্ধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রবুদ্ধ ভারত' ঃ—ভারতীয় সভ্যতার মূল তত্ত্বসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। ভারতের ভাবধারার প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করা উচিত। অপূর্ব্ব গ্রন্থ; ইহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অকাট্য যুক্তির দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদিগকে নিরস্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার যে ভারতের যাবদীয় নিগূঢ় তত্ত্বসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রাদিতে তাঁহার যে অসাধারণ অধিকার তাঁহার প্রত্যেক কথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি ইহা পাঠ করিবেন তিনিই ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানসমূহের সহিত সুপরিচিত হইবেন।

'হিন্দু মেছেজ' ঃ—এই সুমহৎ গ্রন্থ ভারতীয়দিগকে তূর্য্যনিনাদে উদ্বোধিত করিতেছে—"তোমাদের মহত্ত্ব ও তোমাদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি কর, ভারতের বিরাট ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য প্রস্তুত হও।

"মারাট্টা" ঃ—এই সন্ধিক্ষণে এই মহৎ গ্রন্থ প্রচারের জন্য সার জন উড্রফের নিকট ভারতবর্ষ গভীর কৃতজ্ঞতারূপ ঋণে আবদ্ধ। ভারতের নব্য

সংস্কারকগণ যদি এই গ্রন্থ পাঠ করেন এবং ইহার আলোচ্য বিষয়সমূহ লইয়া চিন্তা করেন তবে বুঝিতে পারিবেন যে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতি অনেক বিষয়ে তাঁহারা অযথা আক্রমণ করিয়া থাকেন। ভারতের মহোচ্চ সভ্যতার স্বরূপ বুঝিতে অনেক বৈদেশিক ও ভারতবাসী শিক্ষিত লোকেরা ভুল করিয়া থাকেন। সার জনের ন্যায় একজন বৈদেশিক ও বিজাতীয় মনীষী ভারতের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ এমন বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন দেখিয়া আমাদের অন্তরে অশেষ আনন্দের উদ্রেক্ হইতেছে।

'কমন উইল' ঃ—বৈদেশিক শাসন ভারতের ধর্ম্ম, জ্ঞানগবেষণা ও সামাজিক রীতিনীতির উপর যেভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহা রাষ্ট্রীয় শাসনাধিকার হইতেও অধিকতর মারাত্মক। ইহা সংগোপনে ছদ্মভাবে প্রবেশ করিয়া স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, ভারতের আত্মাকে টিপিয়া মারিবার এবং ভারতীয় সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই সময় সার জন উড্রফের এই গ্রন্থের প্রচার পরম শুভ যোগের আবির্ভাব বলিতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতার মূলতত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি অসাধারণ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভারতীয় যুবকগণের মন যেন পাশ্চাত্যপ্রভাবে কলুষিত না হয়, এবং ভারতের নিজ আদর্শানুসারেই তাহাদের কর্ম্মনিষ্ঠা স্ফুরিত হয়। ভারতবর্ষ এই জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

'লিডার' ঃ—প্রবল শক্তিমত্তা ও তেজস্বিতার সহিত ভারতীয় সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বহু গভীর তত্ত্ব কথায় সমুজ্জ্বল। যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদের প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বলি।

থিওজফিক্যাল সোসাইটীর মুখপত্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' ঃ—ভারতীয় সভ্যতার

মধ্যে যাহা খাঁটি এবং যাহা প্রকৃত কার্য্যকরী বিষয় তাহাতে নিগূঢ় ভাবে অভিনিবেশের অসাধারণ শক্তি সার উড্রফ দেখাইয়াছেন। তাঁহার উক্তি-গুলি যেমন সুস্পষ্ট ও উদ্দীপনাপূর্ণ তেমনই বিশেষভাবে কার্য্যকরী। মানব-জীবনের সার সত্য ভারতবর্ষ যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন সার উড্রফ সেই ভাবেরই সাধক। তাঁহার এই গ্রন্থখানিও তেমনই মহোচ্চ আদর্শের দ্যোতক। ভারতের নিন্দুকদের উপর যে কষাঘাত করিয়াছেন, ভারতের জীবনাদর্শ ও সভ্যতার সম্বন্ধে যে মনোরম বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ ভাবে আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের মূল লক্ষ্যকে তিনি যেমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল,—পুরাকালে কোন মহর্ষি যেন শিষ্যদেরে জ্ঞানোপদেশ দিতেছেন। এইরূপ সদ্‌গ্রন্থ ভারতের প্রত্যেক গৃহে সমাদৃত হওয়া আবশ্যক। নির্য্যাতীত ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী সমর্থনের জন্য দাঁড়াইয়া সার জন উড্রফ যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কি ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা খুঁজিয়া পাই না।

'ক্যাপিটাল' :—সার জন উড্রফ হিন্দুর ধর্ম্ম ও সভ্যতার যেমন একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমর্থক তেমনই নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ। তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই তিনি যথেষ্ট ভূয়োদর্শন ও তত্ত্বজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তজ্জন্য তিনি অতি সহজেই মিঃ আর্চ্চারের ন্যায় যুক্তিবাদীকেও নিরস্ত করিতে পারিয়াছেন। সত্য বটে অনেক খৃশ্চান ও ইংরেজ ইহা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধে পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসুগণের এই গ্রন্থ না পড়িলে চলিবে না। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে হিন্দুর প্রকৃতি ও মনোভাব যথাযথ জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাদের নিকট এতদিন তাহা নানা আবরণে আচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য ছিল। সার উড্রফের প্রতীতি,—বহু যুগযুগান্ত ধরিয়া হিন্দুর প্রাচীন যে সভ্যতা ও ভাবধারা

চলিয়া আসিতেছে ভারতের পক্ষে তাহাই সর্ব্বোত্তম। পাছে রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার আশঙ্কা।

"বোম্বে ক্রণিক্যাল" ঃ—রাষ্ট্রীয় পরাধীন জাতির কোন ব্যবস্থা তাহার শাসকদের চক্ষে কখনো ভাল লাগিবে না, তাহার যাহা কিছু তৎসমস্তকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ইহাদের লক্ষ্য, কারণ তেমন করিয়াই ইহারা স্বার্থ-সিদ্ধি করে। গ্রন্থকার বিশুদ্ধ সত্যসন্ধ, প্রকৃত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই তাঁহার কাম্য। তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দের মধ্যেও যাহা ঘৃণার্হ, স্বার্থপূর্ণ ও মনুষত্ব-বর্জ্জিত দেখিতে পাইয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই মনোরম গ্রন্থ মহোচ্চ ভাবের প্রেরণায় লিখিত। বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত জটিল বিষয়সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রম দূর করিবে।

মাননীয় জষ্টিস্ শেষগিরি আয়ার—অকৃত্রিম ন্যায়পরতার সহিত সার জন উড্রফ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়াই আমি আনন্দিত। যাঁহারা স্বদেশবাসীকে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর করিতে প্রয়াসী তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই গ্রন্থ ঐকান্তিক অভিনিবেশের সহিত পাঠ করা উচিত।